অনুপম আদর্শ

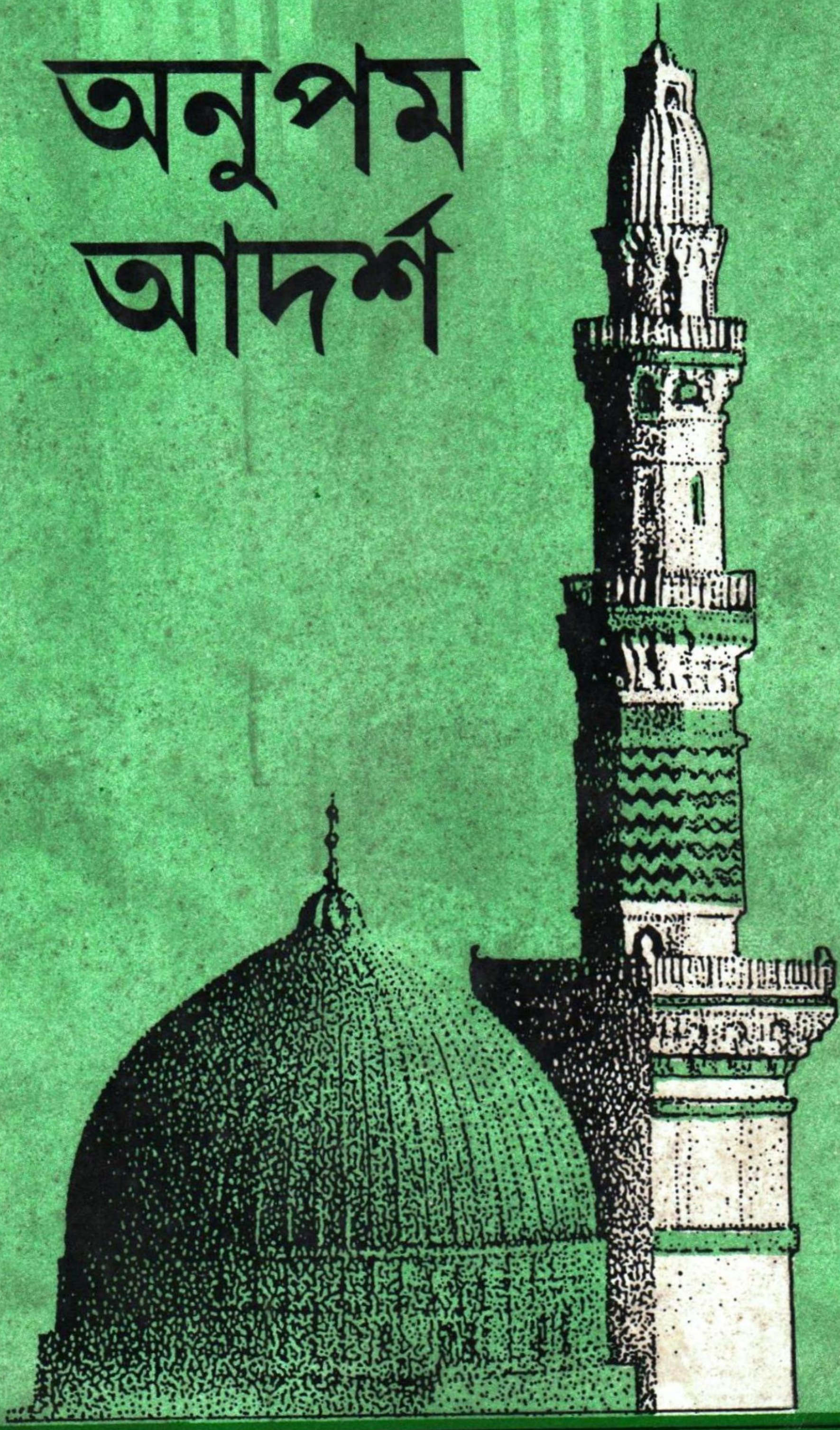

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
সম্পাদিত

অগ্রপথিক সংকলন

অনুপম আদর্শ

সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অনুপম আদর্শ

অগ্রপথিক সংকলন

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭২৪
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৪
ISBN--984-06-0080-0

প্রথম প্রকাশ ঃ

জুন ১৯৯২

আষাঢ় ১৩৯৯

যিলহজ্জ ১৪১৪

প্রকাশনায় ঃ

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদে ঃ
আজিজুর রহমান

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

ANUPAM ADARSHA : The Excellent Model, edited by Prof. Hasan Abdul Quayyum in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. June 1992

Price : Tk 100·00 ; $ (US) : 5·00

www.pathagar.com

আমার আব্বা হুজুর কিবলা
কুতবুল আলম
হযরত মওলানা শাহ্ সূফী
আলহাজ্ব তোয়াজউদ্দীন আহ্মদ
রহ্মাতুল্লাহি আলায়হির স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুপম আদর্শ বের হলো। এজন্য রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে অজস্র শোকরিয়া পেশ করছি। কালাম মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের ভেতর রয়েছে অনুপম আদর্শ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত মুবারকের উপর বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। সেই সীরাত গ্রন্থ সম্ভারের সংগে বর্তমান গ্রন্থখানি এক নবতর বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংযোজিত হতে যাচ্ছে। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের লেখা নিয়ে সংকলিত এই গ্রন্থখানি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত মুবারকের নানা দিক তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। এটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম। আমি তাঁকে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মুবারকবাদ জানাই।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে তশরীফ এনেছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য। তিনি শুনিয়েছেন তওহীদের বাণী ও দেখিয়েছেন সিরাতুল মুস্তাকিম। তাঁর সীরাত মুবারকে সকল গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। আমরা যতো বেশি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত পড়বো, ততই আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে অনুপম আদর্শের মহা নিদর্শন। আল্লাহ্ আমাদের তাঁর প্রিয় হাবিব সারওয়ারে কায়েনাত তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পুরাপুরি অনুকরণ ও অনুসরণ করবার তওফীক দিন। আমীন।

মোঃ মনসুরুল হক খান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

কালাম মজীদে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ ইরশাদ করেন : "তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে রয়েছে অনুপম আদর্শ।"

সেই অনুপম আদর্শ, সেই উস্ওয়াতুন হাসানার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই কেবল আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের রিযামন্দী ও কুরবত তথা সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল করতে পারি, আমরা সত্যিকার মানুষ হতে পারি।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে তশরীফ আনেন এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে, যখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে, অধর্ম ও ধর্মহীনতার অন্ধকারে, শির্‌ক ও কুফরের অন্ধকারে, কুসংস্কার ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে, পশুত্ব ও লোলুপতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। মানুষ তখন এক আল্লাহ্কে ভুলে যেয়ে কল্পিত দেবদেবীর পূজো করে, গাছ-পাথর আর মূর্তির পূজো করে। ত্রিত্ববাদ ও বহুত্ববাদের আবর্তে পতিত হয়ে মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। কোথাও সত্য নেই, সততা নেই, কোথাও মনুষ্যত্ব নেই, মানবিক মূল্যবোধ নেই, কোথাও ন্যায়-নীতি নেই, ন্যায়বিচার নেই। পৃথিবীর সবখানে তখন বিরাজ করছে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য। সামন্তবাদ, প্রভুত্ববাদ, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের কঠিন শিকলে আবদ্ধ পৃথিবীটা তখন বন্দীদশায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সে এক দারুণ অন্ধকার যুগ। কোথাও মানুষের অধিকার নেই, নাগরিকের অধিকার নেই, দাস-দাসীদের অধিকার নেই। সারা পৃথিবী একজন দরদী নেতা চায়, একজন সত্য পথের দিশারী চায়, সত্যের পথে আহবানকারী চায়, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী চায়। একদিন তিনি এলেন। তিনি এলেন এক মরণাপন্ন পৃথিবীতে আল্লাহ্র রহমত স্বরূপ। তিনি এলেন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ্র রহমতরূপে। তিনি এলেন সিরাজুম মুনীরারূপে। তাঁর আগমনে পৃথিবী আলোর

www.pathagar.com

দিশা পেলো, সত্যের দিশা পেলো, ঘোষিত হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" –আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী হিসাবে পৃথিবীতে তশরীফ আনেন। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না। তিনি খাতামুন নাবীয়ীন। তাঁর আগেও পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু নবী–রসূল এসেছেন। তাঁরা এসেছেন নিজ নিজ কওম বা সম্প্রদায়ের মাঝে তাদের হিদায়ত করার জন্য। তাঁরা এসেছেন নির্দিষ্ট কোনো জনপদের জন্য। কিন্তু প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এলেন গোটা বিশ্বজগতের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য। তিনি বিশ্বনবী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হে নবী, আপনি বলুন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার নিকট আল্লাহ্র রসূল (সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৫৮)। তিনি পৃথিবীতে এলেন ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ সাদিকের সময়। তাঁর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বে আলোর উত্তরণ ঘটলো। ঐতিহাসিক টমাস কারলাইলের ভাষায় বলা যায় ঃ এই আরব জাতি, মানুষ মুহাম্মদ (সা) আর একটি শতাব্দী। এটা কি তাই নয় যেনো একটি স্ফুলিংগ– শুধুমাত্র একটি স্ফুলিঙ্গ যা পতিত হলো দুনিয়ার এমন একটি অংশে, যা দেখে মনে হচ্ছিলো কালো তুচ্ছ বালুকাবিন্দু। কিন্তু দেখো, সেই বালুকা বারুদ হয়ে বিস্ফোরিত হলো আকাশ সমান আর সেই আলোয় আলোকিত হলো দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত।

চল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম ওহী লাভ করলেন। নবুয়ত ও রিসালত প্রাপ্ত হলেন। সত্য প্রতিষ্ঠায় কতো কষ্ট, কতো লাঞ্ছনা সইতে হলো তাঁকে। জন্মভূমি মক্কা মুয়াজ্জমা ছেড়ে একদিন তাঁকে হিজরত করতে হলো মদীনা মুনাওয়ারায়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন একটি মসজিদ–মসজিদুন নববী। আর এই মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেন এক অনন্য কল্যাণ রাষ্ট্র। রচনা করলেন পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র–মদীনার সনদ।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তাঁর সেনাপতিত্বে অভিযান ও যুদ্ধ হলো প্রায় ২৯টা এবং তাঁর নিযুক্ত সেনাপতিদের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে যুদ্ধ ও অভিযান হলো প্রায় ৬০টি। একদিন সত্যের জয় হলো, মিথ্যা দূরীভূত হলো, ঘোষিত হলো : সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত। নিশ্চয়ই মিথ্যা দূর হবার।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদদাতারূপে, সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হলেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন :

হে নবী, নিশ্চয়ই আপনাকে পাঠানো হয়েছে সাক্ষ্যদাতারূপে, সুসংবাদদাতারূপে, সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র দিকে তাঁরই নির্দেশক্রমে আহবানকারীরূপে এবং প্রদীপ্ত চেরাগরূপে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু যে মহাদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা যথাযথভাবে পালন করে, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা আল-ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল তিনি চলে গেলেন রফীকুল 'আলা--শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে। রেখে গেলেন আল্লাহ্র কালাম আল-কুরআন এবং তাঁর সুন্নাহ্ আল-হাদীস। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বললেন : আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি--তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর তা হলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না-আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ্।

২

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত মুবারক বাংলা ভাষায় রচিত হবার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। আমরা আশা করি বর্তমান সংকলনটি বাংলা ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থের তালিকায় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার হিসাবে সংযোজিত হতে সমর্থ হবে। এতে যে সমস্ত রচনা সংকলিত হয়েছে এর প্রায় সবগুলোই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রপথিকের সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে। সংখ্যাগুলো হচ্ছে : সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪০৭, সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল

www.pathagar.com

গফুর, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪০৮, সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪০৯, সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর, সীরাতুন্নবী (সা) সংখ্যা ১৪১০, সম্পাদক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, ঈদে মিলাদুন্নবী ১৯৯০, সীরাতুন্নবী (সা) ১৪১১ হি. বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম এবং ১২ রবিউল আউয়াল ১৪১১ হি. সংখ্যা, সম্পাদক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম। সাপ্তাহিক অগ্রপথিকের সাধারণ সংখ্যা থেকেও প্রবন্ধ সংকলন করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকা ১৪০৪ থেকে নেয়া হয়েছে মদীনার সনদ ও বিদায় হজ্জের ভাষণ, সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৬ থেকে নেয়া হয়েছে 'সশস্ত্র সংগ্রামে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)' শীর্ষক প্রবন্ধটি, সীরাতুন্নবী (সা) স্মরণিকা ১৪০৭ থেকে নেয়া হয়েছে 'বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী (সা)' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এতে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই গবেষণাধর্মী এবং পাঠক মহল কর্তৃক সমাদৃত। আমরা আশা করি পুস্তকাকারে প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

এই সংকলনটি গ্রন্থনায় আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার স্ত্রী মিসেস মাহমুদা কাইয়ূম মায়া। আমি তাঁকে মুবারকবাদ জানাই। এছাড়া যাঁরা এটি সংকলনে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রেরণা যুগিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাই। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে দীনের উপর কায়েম থাকার এবং প্রিয়নবী (সা)-র সুন্নাহ্কে যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করবার তওফিক দিন। আমীন।।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

www.pathagar.com

সূচিপত্র

নবুয়তের তাৎপর্য/১
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
কুরআনুল করীমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/১৬
মওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
মহানবী (সা)-র নবুয়তের সার্বজনীনতা/২৫
প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবদুর রউফ
হযরত রসূল-ই-আকরাম-এর বৈশিষ্ট্য/৩৯
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মানবতাবাদ/৪৬
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
মানব জীবনের সমস্যা সমাধানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/৫২
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
প্রিয়নবী (সা) সম্পর্কে আল-কুরআন এবং নিজের সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা)/৬৪
আহমদ আবুল কালাম
রহমাতুল্লিল 'আলামীন/৯৪
মওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার
অনুপম আদর্শ/১০০
ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান
সর্বোত্তম আখলাক যাঁর/১০৩
মওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার

www.pathagar.com

সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)-র অবদান/১১১
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
বিশ্বনবী (সা)-র চরিত্র শোভা/১১৫
মওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র/১২৯
সৈয়দ আবদুস সুলতান
মানবতার কল্যাণে প্রিয়নবী (সা)-র মহান অবদান/১৩৯
মোঃ মাহমুদুল হাসান
অন্তরঙ্গদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা)/১৪৫
মুহিউদ্দীন খান
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা)/১৫৪
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
উসওয়াতুন হাসানা/১৬৬
অধ্যাপক এম. এ. রকিব
য়াতীম মিসকীনের বন্ধু হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/১৭৪
মুস্তাফীজ বিন শিহাব
প্রিয়নবী (সা)-র প্রশাসনিক কাঠামো/১৮১
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
সমাজ সংস্কারক মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/১৯৪
হাসিনা আখতার
সমাজ সংস্কারের শাশ্বত ধারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/২০৪
শেখ ফজলুর রহমান
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পররাষ্ট্র নীতি/২১৩
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সশস্ত্র সংগ্রামে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/২২১
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

www.pathagar.com

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন রণাঙ্গনে/২৩৬
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
জংগে বদর, জংগে ওহুদ/২৫৩
ডাক্তার (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত
গাযওয়ায়ে আহযাব বা জংগে খন্দক/২৬৬
ডাক্তার (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত
প্রিয়নবী (সা)-র দেশপ্রেম/২৭৫
আহমদ আবুল কালাম
মহানবী (সা)-র পারিবারিক জীবন/২৮২
নূরজাহান বেগম
রসূল করীম (সা)-র বৈবাহিক জীবন/২৯৩
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন
শোকের বছর/৩০৫
নূরজাহান বেগম
স্বাস্থ্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা)/৩১১
ডাক্তার (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত
রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাব্যপ্রীতি/৩২০
আবদুস সাত্তার
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা/৩৩০
মওলানা মুহম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য/৩৫০
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
বিশ্বনবী (সা)-র জীবনে মি'রাজ/৩৬৩
উবায়দুর রহমান নদভী

www.pathagar.com

অনন্য অর্থনৈতিক বিপ্লবের স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/৩৭০
আহমদ আবুল কালাম
বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/৩৮৫
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
আরবী, ফার্সী ও উর্দূ কাব্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম/৩৯৮
মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
মহানবী (সা)-র যুগে উপমহাদেশ/৪৩৬
অধ্যাপক আবদুল গফুর
বিশ্বনবী (সা)-র প্রশাসনিক পদ্ধতি/৪২৩
মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ
মহানবী (সা)-র যুগে উপমহাদেশ/৪৩৬
অধ্যাপক আবদুল গফুর
অমুসলিমের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)/৪৫০
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

www.pathagar.com

অনুপম আদর্শ

www.pathagar.com

নবুয়তের তাৎপর্য

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

নবুয়তের তাৎপর্য এবং মর্মার্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নবুয়ত এমনি একটি বিষয়, যা মানুষের চিন্তা-গবেষণা এবং বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির অনেক ঊর্ধ্বে। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির সীমা শেষ হয়, সেখান থেকে নবুয়তের সীমা শুরু হয়। তাই নবুয়তের তাৎপর্য এবং এর সত্যিকার মর্মার্থ একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূই জানেন। তিনি বিশ্বমানবের হিদায়তের জন্যে তথা সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু তবু ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানিগণ বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান ও অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের এবং তাঁর পূত-পবিত্র জীবনধারার ব্যাপারে গবেষণা করে নবুয়তের তাৎপর্য সম্পর্কে যা কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পর্যায়ে ইমাম আবুল হাসান আশ্আরী, ইবনে হজম জাহেরী, আবূ ইসহাক, আবূ ইয়ালা, আবুল মায়ালী, ইমামুল হারামাইন, আবদুল করীম সেহ্ রুস্তানী, ইমাম গাযযালী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইবনে খল্দুন, ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস্ সালাম প্রমুখ মনীষী তৃতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টম হিজরী পর্যন্ত এই বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

পরবর্তীকালে যাঁরা এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী রহমাতুল্লাহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র প্রথম খন্ডে নবুয়তের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, আর নবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল্‌মোন্‌কেজ্‌ মিনাদ্‌দলাল' এবং 'মায়ারিজুল কুদ্‌স' গ্রন্থে অত্যন্ত উত্তমভাবে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন।

এমনিভাবে ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'তফসীরে কবীরে' এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুন্নবুয়াতে' এই বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান দরবারে যে দু'আ করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন-'হে আল্লাহ্‌ ! আমার বংশধরদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তাঁদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাঁদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং তাঁদের মনকে পবিত্র করবেন, তাঁদের কল্‌বের সংশোধন করবেন।'

এতে নবীর তিনটি দায়িত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্‌র বাণীসমূহকে মানুষের কাছে পৌছে দেয়া; দ্বিতীয়ত, তাদেরকে শিক্ষা দেয়া ; তৃতীয়ত, তাদের অন্তরের সংশোধন এবং পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

অতএব, নবীর দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে শুধু মানুষের এ জীবনই নয় বরং মানুষের রূহ্‌ বা আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে-তথা নবুয়তের তাৎপর্য বর্ণনার পূর্বে রূহ্‌ বা আত্মার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে-যা একটা স্বতন্ত্র এবং অত্যন্ত কঠিন বিষয়।

এ বিষয়ে আবুল আব্বাস আহ্‌মদ সরখসি (মৃত্যু ৩৮৬ হিজরী), সাদাকা ইবনে মন্‌জা আদ্দামাশকি (মৃত্যু ২৬০ হিজরী), বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসউদী (মৃত্যু ৩৪৬ হিঃ), ইমাম গায্‌যালী (মৃত্যু ৫০৫ হিঃ), ইমাম রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ), ইবনুল কাইয়ুম (মৃত্যু ৭৫২ হিঃ) প্রমুখ মনীষী রূহ্‌ বা আত্মার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষত, ইমাম গায্‌যালী (রহ.) তাঁর 'মায়ারিজুল কুদ্‌স' গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম তাঁর 'কিতাবুররূহ্‌' গ্রন্থে এবং বকায়ী তাঁর 'সিররুর্‌ রূহ্‌' গ্রন্থে এবং হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'আলতাফুল কুদ্‌স' গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজন করেছেন। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে সে-সব বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, নবী কাকে বলে? নবীর প্রতি আমাদের কি দায়িত্ব? নবীর আগমনের উদ্দেশ্য কি?

'নবী' শব্দটি 'নাবাউন' থেকে নিষ্পন্ন আর 'নাবাউন'-এর আভিধানিক অর্থ হলো এমনি খবর, যাতে মানুষের উপকার হয়। আর সেই উপকারও সাধারণ নয়, বরং বিরাট এবং অসাধারণ ; আর খবরের শ্রোতা সেই খবরের মাধ্যমে জ্ঞান এবং শান্তি লাভ করতে সক্ষম হন।

অতএব, কুরআন মজীদে 'নবী' শব্দটি এমন এক ব্যক্তির জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ খবর দেন, যাতে মানুষের বিরাট উপকার হয়। মানুষের বুদ্ধির দীপ্তি যেখানে কার্যকরী নয় আর এই খবরের ভিত্তিতে মানুষ লাভ করে অন্তরে অনাবিল শান্তি, নিবারণ করে তাদের জ্ঞান পিপাসা, চির-শান্তি, চিরমুক্তির জন্যে নির্দিষ্ট পথের সন্ধান পায় এবং জীবনকে গড়ে তুলতে পারে তার আলোকে। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন মানব-গোষ্ঠীর হিদায়ত করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর মনোনীত নবীকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। যেমন হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে ফেরাউনের নিকট এবং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে নমরুদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

এমনিভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণার্থে লক্ষাধিক নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, যাঁরা সে যুগের মানুষকে সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

''এবং আমি ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর জাতির নিকট (স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার জন্যে) এই দলীল প্রদান করলাম ! আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকি, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞানময় ও মহাজ্ঞানী। আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করেছি। তাদের আমি হিদায়ত দান করেছি। আর তাঁর (ইবরাহীমের) পূর্বে আমি নূহকে হিদায়ত দান করেছি এবং তাঁর (ইবরাহীমের) বংশ থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, মূসা ও হারুনকে হিদায়ত দান করেছি। নেক্কার লোকদেরকে আমি এভাবেই বিনিময় দান করে থাকি। আর আমি যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইল্‌ইয়াসকেও হিদায়ত দান করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিল নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত। আমি

www.pathagar.com

ইসমাইল, ইয়াসায়া, ইউনুস এবং লূতকে হিদায়ত দান করেছি এবং তাঁদের প্রত্যেককে পৃথিবীতে (সমকালীনদের উপর) বিশেষ মর্যাদা দান করেছি। তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে এবং তাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমি তাঁদেরকে নির্বাচন করেছি এবং তাঁদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি, এটিই আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়ত। স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়ত করেন। যদি তারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় সৎকাজ বিনষ্ট হয়ে যেতো। এ-সব লোককেই আমি দান করেছি আমার কিতাব, সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা এবং নবুয়ত। অতঃপর এ সব লোক (বর্তমানে যারা তাদের অনুসারী হবার দাবীদার) ঐ নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণে ঐগুলো আমি এমন লোকদের (মুসলমানদের) নিকট সোপর্দ করেছি-যারা সেই নিয়ামতসমূহের অমর্যাদা করে না। এদেরকেই আল্লাহ্ হিদায়ত দান করেছেন। অতএব, তুমিও এদের হিদায়তের অনুসরণ করো। —সূরা আন'আম ঃ ৯০

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন নবীর উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ দান করেছেন। নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ও নবীদের দায়িত্ব সম্পর্কেও ইরশাদ করেছেন।

উপরোল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং অপরাপর আম্বিয়ায়ে কিরামকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ সময়ের জন্যে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এরপর আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র বিশ্বমানবের হিদায়তের জন্যে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে আল্লাহ্র প্রিয় নবী রসূল (সা.)। আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা.)-কে ঘোষণা করার জন্যে ইরশাদ করেছেন ঃ

'ইতিপূর্বে নবীগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র বিশ্বমানবের নিকট। —দ্র. বুখারী শরীফ

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা আরও সুস্পষ্ট। ইরশাদ হয়েছে ঃ

হে রসূল ! আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি। আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্র রসূল।

বস্তুত অন্যান্য নবী হলেন নবুয়তের আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়, আর প্রিয়নবী (সা.) হলেন সূর্যের ন্যায়। সূর্য উদিত হলে যেমন নক্ষত্রের প্রয়োজন

www.pathagar.com

থাকে না, তেমনিভাবে প্রিয়নবী (সা.)-র আগমনের সংগে সংগে অন্যান্য নবীর প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যদি কেউ সূর্যের আলো থেকে দূরে থাকতে এবং দিবাকালে নক্ষত্রের আলো পেতে ইচ্ছুক হয়, তবে যেমন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আবির্তাবের পরে আর কোন নবীর নিকট হিদায়ত ও নাযাতের পথও পাওয়া যাবে না। বরং সকলকেই নবুয়তের আকাশের সূর্য হযরত মুহম্মদ (সা.)-এরই অনুকরণ করতে হবে। তাঁরই সমীপে হাযির হতে হবে হিদায়তের জন্যে। এমনকি যদি আল্লাহ্‌র কোন নবীও ফিরে আসেন, তবে তাঁর একান্ত কর্তব্য হবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

'যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, আমার অনুকরণ ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর থাকতো না।'

আর এ জন্যেই ঈসা আলায়হিস সালাম পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবেন।

বস্তুত সমগ্র বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হয়েই আগমন করেছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

তাই কল্যাণকামী, মুক্তি-পিয়াসী মানুষ মাত্রকেই তাঁর প্রতি পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস রাখতে হবে, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে এবং প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, উম্মতের প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তিনটি হক বা অধিকার রয়েছে। প্রথমত, তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য নবী। যেহেতু তিনিই আমাদের পথ-প্রদর্শক, তিনিই আমাদের রাহ্‌বার। তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করতে হবে আর যেহেতু আমাদের প্রতি তাঁর ইহ্‌সান অগণিত, তিনি আমাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান ও রহমত। তাঁকে ভালবাসতে হবে প্রাণ দিয়ে, প্রাণের চেয়েও বেশি করে। আর শুধু এভাবেই মানব-জীবন সফলকাম হবে।এ ভাবেই মানুষ আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ্ মাফ করবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই লাভ হয় আল্লাহ্‌র রহমত, আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং মাগফিরাত। আর মানব জীবনের চরম চাওয়া ও পাওয়া এই বস্তুসমূহ থেকে বড়ো আর কিছুই নয়।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানব জাতির সত্যিকার উপকার করেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। তাঁরাই মানুষকে সৎকার্যে উদ্বুদ্ধ করেন। উন্নতি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করেন। মনের পবিত্রতা, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেন। মানুষের মাঝে সুপ্ত শক্তি বা প্রতিভার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটান। হযরত খালিদের বীরত্ব ও সৎসাহস, হযরত উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর রাষ্ট্র পরিচালনা, হযরত আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহ্ তা'আলা আনহু ও হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর দানশীলতা, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বীরত্ব ও সরলতা এবং হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর দৃঢ়তার যে খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তার পশ্চাতে আছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণের ফল। যদি তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম না হতেন, অথবা তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণে সচেষ্ট না হতেন তবে হয়তো বিশ্ববাসী তাঁদের নামও জানতো না।

অতএব আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, অনুরক্তি, তাঁর অনুকরণ, অনুসরণই মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের চাবিকাঠি। এ জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কার্য-বিবরণী আজও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, যাতে করে দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তাঁর অনুসরণে সক্ষম হয়। আর

www.pathagar.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নিয়ামত। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র রহমত যা মানবজাতিকে আল্লাহ্ হাদিয়া স্বরূপ দান করেছেন।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র মহান দান। তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির উপকার সাধন করেছেন।

কালামে মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের বিরাট উপকার সাধন করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য হতেই তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদের সংশোধন করেন, আর তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করেন, অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতায় পতিত ছিল।'

অতএব সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, হিদায়ত এবং গোমরাহীর একটি মাত্র মানদন্ড হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ অনুকরণ অনুসরণ। অর্থাৎ যে কাজ এবং কথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করা হবে, তাই সত্য, ন্যায়, সুন্দর, আলো এবং হিদায়ত। পক্ষান্তরে যে কথায় ও কাজে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শের অনুকরণ করা হবে না তা নিঃসন্দেহে অসত্য, অন্যায়, অসুন্দর, গোমরাহী এবং অন্ধকার; কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলোক-দিশারী, পথপ্রদর্শক।

সারা বিশ্ব যখন গোমরাহীর আঁধারে আচ্ছন্ন, মানবতা যখন বিলুপ্ত আর মনুষ্যত্ব যখন দলিত-মথিত, অন্যায়-অবিচার যখন সর্বত্র বিদ্যমান, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানী যখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, জুলুম, অত্যাচার, মদ্যপান ও ব্যভিচার এবং নারী হরণের ন্যায় ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় পাপ কার্যসমূহকে যখন পাপ মনে করা হতো না, মানুষ যখন আত্মবিস্মৃত, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত, নারীজাতি যখন গৃহপালিত পশুর পর্যায়ে অবনমিত,

www.pathagar.com

মানবতার কলঙ্ক পৌত্তলিকতা যখন মানুষের মনে স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে, এমনকি এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে নির্মিত কা'বা শরীফেও যখন ৩৬০টি মূর্তি স্থান পেয়েছে।

ভ্রান্ত পথে, ভ্রান্ত মতে, মানুষ যেন সেদিন চেতনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পতনোন্মুখ বিশ্বমানব গ্রহণ করেছে অশান্তি, অকল্যাণের পথ, দোযখের পথ।

মানুষ যখন নিজেই তার লোভ-লালসা ও ক্ষমতা-লিপ্সার কারণে উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার মাধ্যমে নিখিল-বিশ্বকে মানুষের বাসের অযোগ্য করে তুলেছিল, যখন বিপন্ন মানবতার সকরুণ আর্তনাদ আহাজারী শ্রবণের জন্যে দুর্গত জর্জরিত নিরুপায় মানবতাকে রক্ষা করার যখন কেউ ছিলো না, বিশ্ব-মানবতার এমনি চরম দুর্দিনেই আগমন করলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা 'রাহমাতুল্ লিল আলামীন' বা সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে রহমত বলে ঘোষণা করলেন। আর তাঁর প্রতি যে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে 'যিকরুল-লিল-আলামীন।'

অতএব বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বিশ্ব সভ্যতার বিকাশের জন্যে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন-যাতে করে বিশ্ব-মানব তার কল্যাণের শান্তি ও মুক্তির পথ তথা সরল সঠিক পূণ্য-পন্থা বা সিরাতুল মুস্তাকীম লাভ করতে সক্ষম হয়।

অন্য কথায় রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আগমন করেছেন রহমাতুল্লিল্ আলামীন। তিনি সঙ্গে এনেছেন 'যিকরুল-লিল-আলামীন'।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব এবং বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাযিল হবার পর গোমরাহীর অন্ধকার কেটে গিয়েছিল। তাই, পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল, বিশ্বমানব ফিরে পেয়েছিল তার কল্যাণের পথ, চিরশান্তি ও চির সুখের পথ।

মহানবী (সা)-র আগমনের পূর্বে তথা পবিত্র কুরআন নাযিল হবার পূর্বের যুগকে 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' বা বর্বরতার যুগ বলা হয়। আর আরবের এই মূর্খ দুর্ধর্ষ পৌত্তলিকরা যখন প্রিয়নবী (সা)-র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলো, পবিত্র

www.pathagar.com

কুরআনের আলোকে নিজেকে আলোকিত করলো, তখন তাঁদের নাম হলো 'সাহাবায়ে কিরাম' (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমায়ীন)। তাঁদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

'আমার সাহাবারা নক্ষত্রের ন্যায়, তুমি যারই অনুসরণ কর না কেন হিদায়ত লাভ করবে।' আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

'সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর তার নিকটবর্তী যুগ, এরপর তার নিকটতম পরবর্তী যুগ।'

বস্তুত পাহাড়-পর্বতকে তার স্থান পরিবর্তনে বাধ্য করা, লৌহকে গলিত পদার্থে পরিণত করা সহজ ; কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্তন করা এবং মানুষের মনো-জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন।

এই কঠিন কাজই সম্ভব হয়েছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহান আদর্শের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে, বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

মাত্র ২৩ বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে বিশ্বমানবতার কল্যাণের যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। মানব জাতির ইতিহাস নতুন করে রচিত হয়, পৃথিবীর মানচিত্রের পরিবর্তন হয়। সমগ্র বিশ্ববাসী পরিত্রাণ লাভ করে। কালাম মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

'আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের জীবন-বিধানকে, সম্পূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতসমূহকে এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন-বিধানরূপে মনোনীত করেছি।' –সূরা মায়িদা ঃ ৩

গতকাল যে ছিলো মরু বেদুঈন, ছন্নছাড়া যাযাবর আজ সে রাষ্ট্র পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। গতকাল যে ছিলো দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, আজ সে বিরাট ঐশ্বর্য ভান্ডারের মালিক। গতকাল যে ছিলো মজলুম অত্যাচারিত, ভীত-সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত, আতঙ্কিত, আজ সে শুধু যে নির্ভীক তাই নয়, বরং এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। গতকাল যে ছিলো জালিম, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, আজ সে বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, বিনয়ের প্রতীক, ক্ষমা ও ঔদার্যের প্রতীক। গতকাল যে ছিলো লোভগ্রস্ত মোহে অন্ধ এবং ঘৃণ্য, অর্থ-লিপ্সা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত, আজ সে ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কুরবানীর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির মহান আদর্শের ধারক বাহক। গতকাল যে ছিলো অশিক্ষিত, মূর্খ,

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিবর্জিত, আজ সে শুধু সুশিক্ষিতই নয়, শুধু সুরুচিসম্পন্নই নয়, বরং অন্যদের জন্যে অদ্বিতীয় শিক্ষক, জ্ঞানের ফল্গুধারা তারই নিকট থেকে প্রবাহিত।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই বিস্ময়কর পরিবর্তন কিসের বদৌলতে। কোন্ চাবি কাঠির বরকতে ? এই অভাবিত পরিবর্তন কল্পনাতীত বিপ্লব কোন্ সোনালী হস্তের স্পর্শে সম্ভব হলো ? এ সব প্রশ্নের একই জবাব। পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদর্শের বাস্তবায়নেই এই অসম্ভব সম্ভব হলো, ইতিহাসের এই কল্যাণমূলক বিপ্লবের পথ সুগম হলো। বিশ্ব-সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলো।

খাতেমুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী

'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি হলেন আল্লাহ্র রসূল ও সর্বশেষ নবী।'

–সূরা আহযাব ঃ ৪০

তারপর আর কোন নবী আসবে না । 'খাতেমুন নাবিয়্যীন' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

'খতম' শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে শেষ করা, তার যবনিকাপাত করা। অতএব 'খাতেমুন নাবিয়্যীন' অর্থ হলো, নবুয়তের পরিসমাপ্তি করা। কোন জিনিসের পরিসমাপ্তি অর্থ হলো তাকে তার সর্বশেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়া, যেন এরপর আর কোন স্তর অবশিষ্ট না থাকে। অতএব খতমে নবুয়তের অর্থ হচ্ছে এই যে, নবুয়ত তার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে–এরপর আর কোন স্তর অবশিষ্ট নেই, যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'খাতেমুন নাবিয়্যীন', তাই দুনিয়ার সকল নবীর সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি একা। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই পর্যায়ে যত গুণের প্রয়োজন হবে, সেগুলোর বিপুল সমাবেশও হয়েছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত বা জীবনবিধান পরিপূর্ণ , পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল। এতে রয়েছে সকল যুগের সকল জিজ্ঞাসার জবাব, আর এ জন্যে সর্বশেষে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। একটি নিয়ম রয়েছে ঃ যদি কোন গুণ কারো মধ্যে শেষ হয়

www.pathagar.com

তবে অতি স্বাভাবিকভাবেই তার নিকট থেকেই সেই গুণটি আরম্ভ হয়। যেমন হযরত আদম আলায়হিস সাল্লাম সর্বশেষ পিতা বা 'খাতেমুন আবা' অর্থাৎ তারপর আর কোন পিতা নেই, পিতৃত্ব তার নিকট শেষ হয়েছে। তেমনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, পিতৃত্ব শুধু যে শেষ হয়েছে হযরত আদম আলায়হিস সাল্লাম-এর নিকট তাই নয়। বরং পিতৃত্ব শুরুও হয়েছে হযরত আদম আলায়হিস সাল্লাম থেকেই।

ঠিক তেমনিভাবে আমরা সূর্যের দৃষ্টান্তের দিকেও লক্ষ্য করতে পারি। সূর্যের মধ্যে আলো বিতরণের গুণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেননা সূর্যের জৌলুস তার নিজস্ব। তাই সূর্যের মধ্যে আলোদানের যেমন পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তেমনি সূর্য থেকেই এই ক্ষমতা আরম্ভ হয়েছে। কেননা চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের আলো সূর্যের থেকে ধার করা। ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যে নবুয়ত যেমন পূর্ণতা লাভ করেছে, এর পরিসমাপ্তিও ঘটেছে। অর্থাৎ তাঁর পর আর কোন নবীর প্রয়োজনও নেই এবং কোন নবীর আবির্ভাবও হবে না। কেননা, নবুয়তের গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁর মধ্যে হয়েছে, তিনি এর সকল স্তর সমাপ্ত করেছেন তথা তাঁর মধ্যে নবুয়তের সকল স্তর সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে নবুয়তের শুরুও হয়েছে তাঁর মাধ্যমে। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

আমি নবী ছিলাম, যখন আদমের সৃষ্টিও হয় নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রথম ও শেষ নবী করেছেন।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আর একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যাও রয়েছেঃ 'সৃষ্টির ব্যাপারে নবীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম আর আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি সবার শেষে।' এতে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর নবুয়তের বদৌলতেই অন্য নবীরা নবুয়ত লাভ করেছেন। কেননা, হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

'ওগো মুহাম্মদ (সা)! যদি তুমি না হতে তবে আমি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করতাম না।'

মূলত সমস্ত নবীর মধ্যে যত গুণ ছিলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তা সম্পূর্ণ দান করেছেন। শুধু তাই নয়,

www.pathagar.com

বরং নবুয়তের সকল গুণের মূল উৎসই তিনি। সূর্য যেমন আলোর মূল উৎস, তেমনিভাবে নূরে নবুয়তের মূল উৎসও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কুরআনে করীমে নবুয়তের আকাশের সূর্য বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে, সুসংবাদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে এবং আল্লাহ্র আদেশে তাঁর দিকে আহ্বায়ক ও দীপ্তিময় সূর্য হিসেবে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্র রহমতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। যেমন কুরআনে হাকিমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

হে রসূল! আপনার প্রিয় বান্দাদেরকে অবগত করুন যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াময় এবং নিশ্চয় আমার শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আদেশে তাঁরই বন্দেগীর জন্যে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন যখন সারা বিশ্ব গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-অনাচার, ব্যভিচার তথা যাবতীয় কুকর্মই ছিল মানুষের দৈনন্দিন কাজ। তারা তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে শুধু যে বিস্মৃত হয়েছিল তাই নয়, বরং তারা বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিল। তখনই আবির্ভাব হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের। তিনি বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করতে আহ্বান জানালেন। তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনই দীনের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। এমনকি তাঁকে আরবের সবচেয়ে বড় ধনী বা রাজা হবার এবং সবচেয়ে সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণের লোভ দেখানো হলো। কিন্তু এই সকল পার্থিব লোভনীয় বস্তুর কোন আবেদনই তাঁর কাছে ছিল না। তাই তিনি তাদের সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে আরববাসী তাঁর উপর জুলুম-অত্যাচার আরম্ভ করলো। সুদীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত তাঁর সংগে সামাজিক বয়কট করা হলো। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাঁর গোত্রের অন্যান্য লোকসহ 'শোয়াবে আবূ তালিব' নামক স্থানে পাহাড়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে হয়। এমন কি মক্কাবাসী কর্তৃক নির্যাতিত

www.pathagar.com

হয়ে একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা শরীফ ত্যাগ করে মদীনা মনোয়ারায় হিজরত করতে হয়।

মদীনা শরীফে পৌছার পরও মক্কাবাসী তাঁকে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের তবলীগের সুযোগ দেয় নি। তারা মক্কা শরীফ থেকে ২৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত মদীনা শরীফ আক্রমণ করেছে কয়েকবারই। কিন্তু তবুও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দিকের আহ্বায়করূপে তাঁর ইসলামী সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন। দুর্বার গতি নিয়ে পরিচালিত হয় এই সংগ্রাম। অবশেষে এই সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। সার্থক হয় তাঁর জীবন সাধনা। বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক মুসলিম নর-নারী সমবেত হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে, ঐতিহাসিক আরাফাতের প্রশস্ত মরু প্রান্তরে। এমনিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি'। সূরা ফাত্‌হ্ ঃ ১

কুরআনে করীমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 'সিরাজাম মুনীরা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'সিরাজ' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। উভয় অর্থই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এখানে সমভাবে প্রযোজ্য। 'সিরাজ' অর্থ প্রদীপ। অতএব 'সিরাজাম মুনীরা' হলো উজ্জ্বল প্রদীপ। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উজ্জ্বল প্রদীপ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমরা দেখি একটি প্রদীপ থেকে আরও অগণিত প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরও একটি চন্দ্র প্রস্তুত হওয়া অচিন্ত্যনীয়, অকল্পনীয়, অসম্ভব। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিদায়তের যে আলো বহন করে এসেছেন তা এত ব্যাপক যে, কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়তের এই আলো বিতরণ করা হবে এবং অগণিত আলোর প্রদীপ এই প্রদীপ থেকে আলো আহরণ করবে।

বস্তুত বিগত দেড় হাজার বছর যাবত এই বিশ্বের বুকে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে সাধনা অব্যাহত রয়েছে তার অধিকাংশই ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করে। তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ

'আদি ও অন্তের জ্ঞান আমিই প্রাপ্ত হয়েছি।'

www.pathagar.com

তাঁরই নামের বরকতে তাঁরই মহান বাণীর শিক্ষা এবং তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শের প্রচার করা হচ্ছে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কালামে তাঁকে 'সিরাজাম মুনীরা' বলা অত্যন্ত সার্থক এবং সুন্দর হয়েছে। মূলত যেভাবে বিশ্বসৃষ্টির মাঝে দীপ্তিমান সূর্যের অবদান অগণিত, সমগ্র পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলিমায় ভরপুর তথা পৃথিবীকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে রাখার ব্যাপারে সূর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক এমনিভাবে বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবদানও অপরিসীম। কেননা হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছেঃ 'যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার অভিপ্রায় না হতো তবে আমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।'

এতদ্ব্যতীত বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

বস্তুত যেভাবে সূর্য ভুবন উজ্জ্বলকারী এবং সারা বিশ্বে আলো বিকিরণের দায়িত্ব তার প্রতি অর্পিত, ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট হিদায়তের বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বও তাঁর প্রতি অর্পিত । পবিত্র কুরআনেই রয়েছে এর ঘোষণা। ইরশাদ হয়েছে ঃ

(হে রসূল!) 'এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে সুখবরদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।'

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

'হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন-হে বিশ্ববাসী! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রসূল।'

আর যেভাবে সূর্য সারা পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর তার আলোকরশ্মি বিকিরণ করে ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার কালামে প্রিয়নবী (সা)-র আলোচনা কতভাবে এসেছে তা বর্ণনা করার সাধ্য আমাদের নেই, কোন্ দিক আলোচনা করব? আর

www.pathagar.com

কোন্ দিক ছেড়ে দেব? প্রিয় পাঠক! দেখুন, প্রিয়নবী (সা)-র প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশও রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার কালামে।

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এই নির্দেশের পূর্বে ইরশাদ করেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণও সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। পবিত্র কুরআনে কোনো আদেশের পূর্বে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যে, এ কাজ আল্লাহ্ তা'আলা করেন, অতএব তোমরাও কর।

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ তা'আলার কালাম লক্ষ্য করুন ঃ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সালাম পেশ করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর।'

www.pathagar.com

কুরআনুল করীমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

০ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

–সূরা আহ্‌যাব ঃ ২১

০ আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

–সূরা সাবা ঃ ২৮

০ এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং ওদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। বস্তুত, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। –সূরা আনকাবুত ঃ ৪৭–৪৮–৪৯

০ তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এ তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সহায় হয়ো না। সূরা কাসাস ঃ ৮৬

০ হে নবী! আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। –সূরা আহ্‌যাব ঃ –৪৫–৪৬

www.pathagar.com

০ অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করবার জন্যে তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন।

–সূরা তাওবা ঃ ৩৩

০ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এক রসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। –সূরা তাওবা ঃ ১২৮

০ পৌছিয়ে দেওয়াই কেবল রসূলের কর্তব্য। তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তা জানেন। –সূরা মায়িদা ঃ ৯৯

০ হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। –সূরা মায়িদা ঃ ৬৭

০ আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রসূলকে সাহায্য কর ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, সকাল–সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেন। ––সূরা ফাত্হ ঃ ৮ –১০

০ হে কিতাবীগণ! রসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের কাছে আসেনি,' এখন তো তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী এসেছে। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। –সূরা মায়িদা ঃ ১৯

০ হে কিতাবীগণ! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক তোমাদের কাছে প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ দ্বারা, তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে

www.pathagar.com

বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। —সূরা মায়িদা ঃ ১৫-১৬

তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করে আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন; সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৬৪

আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে, যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এরপর তুমি কোন সংকল্প করলে তবে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে। যারা নির্ভর করে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন। —সূরা আল ইমরান ঃ ১৫৯

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে প্রেরণ করেছেন রসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদের পরিশোধন করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত, ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

সূরা জুমু'আ ঃ ২

যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়। —সূরা বাকারা ঃ ১৫১

বল, 'হে মানুষ, আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী, সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা এবং যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিকারী। —সূরা হাজ্জ ঃ ৪৯-৫০-৫১

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছি 'ইবাদত পদ্ধতি' যা তারা অনুসরণ করে, সুতরাং তারা যেন তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে। তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। —সূরা হাজ্জ ঃ ৬৭

www.pathagar.com

এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর, সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না।

সূরা জাসিয়া : ১৮

'বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, যে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। —সূরা আন'আম : ১৬১

বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশে ।' তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি 'এই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।'

—সূরা আন'আম : ১৬২-১৬৩

এ ভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা হও মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ। আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর ।

—সূরা বাকারা : ১৪৩-১৪৪

'বল, 'হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছো? তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তুমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'

—সূরা যুমার : ৬৪-৬৫-৬৬

বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্যে, যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

—সূরা হামীম আস্-সাজদা : ৬-৭

০ তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো আমি এদের রক্ষক করে পাঠাই। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া। —সূরা শুরা : ৪৮

০ এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি

www.pathagar.com

আলো, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি, তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ। —সূরা শুরা ঃ ৫২

০ নূন–শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে–তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। ––সূরা কালাম ঃ ১–৬

০ হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধরাত্রি কিম্বা তদপেক্ষা অল্প, অথবা তদপেক্ষা বেশি আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করে চল। ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আর কিছু কালের জন্যে তাদেরকে অবকাশ দাও। আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি। ––সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১–৫, ১০–১২

০ আমি তোমাকে অবশ্যই কাওসার দান করেছি, সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ। –সূরা কাওসার ঃ ১–৩

০ বল, 'আল্লাহ্র শাস্তি হতে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাবো না, কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৌছান এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ্, তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

–সূরা জিন্ন ঃ ২২–২৪

০ আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দেই নি? আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্যে অতিশয় কষ্টদায়ক এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। অতএব, যখনই অবসর পাবে সাধনা করবে এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবে। –সূরা ইনশিরাহ ঃ ১–৮

www.pathagar.com

০ শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি। তোমার জন্যে পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন। তিনি কি তোমাকে য়াতীম অবস্থায় পান নি আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, এর পর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, এরপর অভাবমুক্ত করলেন। সুতরাং তুমি য়াতীমের প্রতি কঠোর যেন না হও, প্রার্থীকে যেন ভর্ৎসনা না কর। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও। ——সূরা দুহা ঃ ১-১১

০ আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ, যেমন রসূল পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের নিকট।

——সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৫

০ আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। বল, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হয়ে যাও সমর্পণকারী। ——সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭-১০৮

০ হে মু'মিনগণ। যদি তোমরাও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী! কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

——সূরা নিসা ঃ ৫৯

০ রসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা তোমার কাছে এলে ও আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইলে তারা আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, এরপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে না নেয়। ——সূরা নিসা ঃ ৬৪-৬৫

www.pathagar.com

০ আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে। ——সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪

০ বল, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া। —সূরা নূর ঃ ৫৪

০ তিনি তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সব দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্যে। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, তাঁর সহচররা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবে, তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। —সূরা ফাত্‌হ্‌ ঃ ২৮–২৯

০ রসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর। — সূরা হাশর ঃ ৭

০ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। —সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪০

০ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। —সূরা মায়িদা ঃ ৩

০ হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শুনছো তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা বলে, 'আমরা শুনলাম' বস্তুত তারা শুনে না। —সূরা আনফাল ঃ ২০–২১

০ হে যারা ঈমান এনেছ! রসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ মানুষ ও তাঁর অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

—সূরা আন্‌ফাল ঃ ২৪

www.pathagar.com

০ নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার সহধর্মিণীরা তাদের মাতা। —সূরা আহ্যাব ঃ ৬

০ তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাস করে এবং রসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তারা অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না, যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। —সূরা নূর ঃ ৬২

০ রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না, তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। —সূরা নূর ঃ ৬৩

০ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হবে না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ সব শুনেন, সব জানেন। হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বর উঁচু করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সঙ্গে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যারা আল্লাহ্র রসূলের সামনে নিজেদের কন্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। —সূরা হুজুরাত ঃ ১-৩

০ আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। —সূরা আহ্যাব ঃ ৫৬

www.pathagar.com

মহানবী (সা)–র নবুয়তের সার্বজনীনতা

প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবদুর রউফ

অনুবাদ ঃ সৈ.না. মো. আয়াতউল্যাহ

[এ নিবন্ধের লেখক মালয়েশীয়। নিবন্ধটি ১৯৮৫ সনে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সীরাত সম্মেলনে পঠিত হয়।]

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)–এর আগে আল্লাহ্ যেসব নবী (আ)–কে নবুয়ত দান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কুরআন শরীফে তাঁদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবীকে পাঠানো হয়েছে তাঁর নিজ নিজ কওমের হিদায়তের জন্যে। পাক কালামে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

'আমি নূহকে তাঁর কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম.... সূরা নূহ ঃ ১

এবং 'আমি আদম জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম...।'

সূরা আ'রাফ ঃ ৬৫

'এবং আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি...।'

সূরা আ'রাফ ঃ ৭৩

'আর মাদয়ানবাসীদের কাছে পাঠিয়েছি তাদের ভাই শোয়াইবকে...।'

সূরা আ'রাফ ঃ ৮৫

'নিশ্চয়ই আমি তোমার আগে (হে মুহম্মদ), তাদের নিজ নিজ কওমের কাছে পয়গম্বরদিগকে পাঠিয়েছিলাম, অনন্তর তারা প্রমাণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন... সূরা রূম ঃ ৪৭

কিন্তু মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)–কে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে। কুরআন শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ 'আর আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এই কুরআন, যাতে তুমি তাদেরকে (মানবজাতিকে) খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও যা পাঠানো হয়েছে তাদের জন্যে...।' সূরা নহল ঃ ৪৪

www.pathagar.com

'এবং (হে মুহম্মদ) তোমাকে আমি মানবমন্ডলীর জন্যে পর্যাপ্ত (বেহেশতের) সুসংবাদদাতা ও (দোযখের) ভয়-প্রদর্শকরূপে ভিন্ন প্রেরণ করিনি...। –সূরা সাবা ঃ ২৭

'আমি তোমাকে (হে মুহম্মদ) জগতের প্রতি দয়া অনুসারে এতদ্ভিন্ন পাঠাইনি... সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭

'তুমি বল (হে মুহম্মদ) আমি তোমাদের (মানবমন্ডলীর) কাছে এর (কুরআন প্রচারের) জন্যে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কপটাচারীদের অন্তর্ভুক্ত নই, নিশ্চয়ই তা (আল-কুরআন) বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ ভিন্ন নয়।

–সূরা সাদ ঃ ৮৬-৮৭

তাই মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নবুয়ত সকল মানুষ ও সকল জাতির জন্যে, যেমন তাঁর জন্মভূমি আরবের জন্যে তেমন অনারবের জন্যে; যেমন শ্বেতাঙ্গের জন্যে, তেমনি অশ্বেতাঙ্গের জন্যে এবং সমানভাবে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের সকলের জন্যে। মহানবী (সা) তাঁর বাণী স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রথমে তাঁর স্বদেশবাসী আরবদের কাছে প্রচার করবেন বলে পবিত্র কুরআন তাঁকে আরবী ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাঁর নবুয়তের শিক্ষা সম্বলিত এই মহাগ্রন্থও নাযিল করতে হয় তাদের ভাষায়। এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের ভাষা, ধরন ও রচনাশৈলী যে আরবদের ক্ষমতার বাইরে এবং তা যে সকল মানুষ ও সকল জাতির সর্বশক্তিমান প্রভুর পবিত্র বাণী তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং কোন জাতিই অপরাপর জাতির চেয়ে এই মহাগ্রন্থের সাথে নিজেকে অধিকতর সংশ্লিষ্ট মনে করতে পারে না।

তাই ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম বিশ্বাস। এর আহ্বান সকল মানুষের প্রতি, সকল বর্ণের প্রতি, সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর প্রতি। গোড়ার দিকে ইসলাম আকৃষ্ট করেছিলো সকল ধরনের মানুষকে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সর্বপ্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন একজন রমণী, হযরত খাদীজা (রা)। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলী (রা)। এরপর দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত বালক জায়েদ ইবনে হারেস, হযরত আবু বকর (রা) ও কৃষ্ণকায় আবিসিনীয় হযরত বিলাল ইবনে রাবা গ্রহণ করেন ইসলাম। ইসলামের শান্তির ললিত বাণীতে আকৃষ্ট হন রোমের অধিবাসী শোয়েব, পারস্য দেশীয় সালমান এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও খাব্বাব ইবনে আল আরাতের মতো সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গ। প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা) ছাড়া হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আল জুবায়ের ইবনে আল আওয়ামের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিলালের ইসলাম গ্রহণের কাহিনীর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের এই সার্বজনীন আবেদনকে আমরা তুলে ধরবো। বিলালের জন্ম হয় দাসত্বের শৃংখল নিয়ে। ইসালেম আবির্ভাবের সময় তাঁর মালিক ছিলেন মক্কার কুরায়শ বংশের শক্তিশালী জুমাহ গোত্রপ্রধান উমাইয়া ইবনে খালাফ। বিলালের কতিপয় আকর্ষণীয় দৈহিক ও নৈতিক গুণাবলী ছিলো। দীর্ঘদেহী বিলালের মুখ ছিল উজ্জ্বল গাঢ় বাদামী বর্ণের, চোখ দুটি দীপ্তিময় ও গভীর কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য ও অনুনাদী। প্রভুর প্রতি তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তারকাখচিত কিংবা জ্যোৎস্নালোকিত রাতে মক্কাবাসীদের আসর বিমোহিত হতো তাঁর সুন্দর সুরেলা কণ্ঠের ঝংকারে। মালিকের পণ্য সামগ্রী নিয়ে তিনি মক্কায় কাফেলার সংগে যখন সিরিয়া বা ইয়েমেন যেতেন তখন গানে-গানে সহযাত্রীদের ক্লান্তিকর পথশ্রমের বোঝা হাল্কা করে দিতেন।

ইসলামের আবির্ভাবের অল্প কিছুদিন আগে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সংগে বিলালের বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে ওঠে।সে সময় তাঁরা মক্কার কাফেলায় এক সংগে সিরিয়া গিয়েছিলেন। আবূ বকর গিয়েছিলেন নিজের বাণিজ্যে আর বিলাল গিয়েছিলেন তাঁর মালিকের বাণিজ্যে। সিরিয়ায় অবস্থানকালে বিলাল একদিন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সংগে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্যে এক পাদ্রীর কাছে যান। স্বপ্ন দেখে হযরত আবূ বকর (রা) বিহবল হয়ে পড়েন। আবূ বকরের স্বপ্ন শুনে পাদ্রী তাঁর পরিচয় ও তিনি কোথেকে এসেছেন জেনে নিয়ে বললেন :

'যদি আপনার স্বপ্ন সত্য হয়, তাহলে আপনি হবেন একজন নবীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সেই নবীর আবির্ভাব হবে আপনাদের মধ্য থেকেই। আল্লাহ্ তাঁকে পাঠাবেন সকল মানুষের আলোর দিশারীরূপে।' বিলাল হতভম্বের মতো শুধালেনঃ

www.pathagar.com

'তাঁকে কি হুবাল পাঠাবেন? নাকি পাঠাবেন আল্লাহ্, না আল ওজ্জা, না ইসাফ, না নায়লা? (কুরায়শদের প্রধান প্রধান দেব-দেবী)

পাদ্রী বললেন, 'না, তাঁকে পাঠাবেন স্বর্গ ও মর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যার কোন শরীক নেই। একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা করার এবং স্বজাতির প্রতি সদয় হবার জন্যে মানুষকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তাঁকে পাঠাবেন। তিনি সকল দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংসে করে ফেলবেন।'

বিলাল যা শুনলেন তাতে তাঁর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেলো। দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংসে করার কথায় তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে বিলাল তাঁর মালিককে বাণিজ্যের আয়ের হিসাবসহ ধন-রত্নাদি বুঝিয়ে দিয়ে বরাবরের মতোই দেব-দেবীকে ভক্তি জানাতে মন্দিরে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল দেবমূর্তি হুবাল। হুবালের ভাঙ্গা হাত বদল করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে একখানি সোনার হাত। সিরীয় পাদ্রীর কথাগুলো বিলালের মনে পড়ে গেলো। তিনি অতিশয় অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, সবচেয়ে শক্তিশালী ঈশ্বর বলে মক্কার লোকেরা কি করে এই দুর্বল অসহায়ের পূজা করতে পারে, যার আত্মরক্ষার কোন শক্তি নেই এবং একখানি বাহু বদলে দেয়ার জন্যে যাকে মানুষের দিকে চেয়ে থাকতে হয়।

যা হোক, বিলাল তখন তাঁর মালিকের দাস-কুঠিরে ঘুমোচ্ছিলেন। গভীর রাতের অন্ধকারে ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে কে যেন তাঁকে ডাকছেন ঃ বিলাল। বিলাল। মনে হলো হযরত আবূ বকর (রা)-এর কণ্ঠ। এমন গভীর রাতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর গোপন আহ্বানে বিস্মিত হলেন বিলাল। শয্যা ছেড়ে তিনি বাইরে গেলেন।

বিলাল অবাক, 'আবূ বকর? আপনি? কি ব্যাপার?'

হযরত আবূ বকর বললেন, 'বিলাল, তোমার জন্যে আমি অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ চমৎকার সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

ঃ সুখবর? সকালে বললে হয় না?

ঃ না বিলাল। তোমার মালিকের চোখের সামনে তাঁকে শুনিয়ে এই সুসংবাদটা তোমাকে দেয়া যায় না, অন্ততঃ এ পর্যায়ে তো নয়ই।

ঃ কি সে খবর আবূ বকর?

www.pathagar.com

আবূ বকর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'বিলাল, মহানবী (সা)–র আবির্ভাব হয়েছে।'

ঃ মহানবী (সা)?

ঃ হ্যাঁ, বিলাল।

বিলালের কণ্ঠে বিস্ময়, 'কে তিনি?'

আবূ বকর বললেন, 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।'

ঃ ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন তো আবূ বকর।

আবূ বকর বললেন, 'মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি একমাত্র প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ পেয়েছেন।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমার মহিমান্বিত প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন (বিশ্বাসীগণকে) সুখবর জানাতে ও (অবিশ্বাসীগণকে) সতর্ক করে দিতে এবং আমাকে তিনি করেছেন ইব্রাহীমের পূর্ণতা ও আমাকে প্রেরণ করেছেন সকল মানুষের রসূলরূপে।' আবূ বকর বললেন, 'আমি তাঁকে বললাম, আপনি সত্যবাদী, কখনো মিথ্যে বলেন না এবং আল্লাহ্‌র অর্পিত এই দায়িত্ব পালনের জন্যে এ ধরনের বিশেষ সম্মান লাভের নিশ্চয়ই আপনি উপযুক্ত। আপনি সৎ, আপনি মহান বংশধারার উত্তরাধিকারী এবং আপনি স্বজনদের প্রতি দানশীল। আপনি আপনার হস্ত প্রসারিত করুন, আমাকে অঙ্গীকার করতে দিন। মুহাম্মদ (সা) তাঁর হস্ত মুবারক প্রসারিত করলেন এবং তাঁর নবুয়তের উদ্দেশ্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করলাম।'

ঃ এতো তাড়াতাড়ি! আবূ বকর, মুহাম্মদের দাবি আপনি বিশ্বাস করলেন?

ঃ হ্যাঁ বিলাল। আমি জানি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে কারুর চেয়ে উত্তম।

ঃ তাঁর আহ্বান কিসের?

তাঁর আহ্বান হলো এইসব বাকশক্তিহীন পুতুলের প্রতি বশ্যতার শৃংখল মোচন করে এই সুন্দর আকাশ, মিটি মিটি তারকাপুঞ্জ, প্রদীপ্ত সূর্য, উজ্জ্বল চন্দ্র, ভাসমান মেঘমালা, বিস্তৃত মরু, অথৈ পানি, বাগিচা, সাগর, নদী ও হাওয়ার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র আরাধনা করা। প্রিয় বিলাল, তাঁর আহ্বান হলো প্রভু ও দাসের মধ্যে কোন প্রভেদ না রাখা। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবাই সমান, কেবলমাত্র উত্তম কাজের জন্যেই মানুষ উত্তম হয়। তাঁর ধর্মে কোন ব্যক্তি ও

www.pathagar.com

তাঁর প্রভুর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। নেই কোন মধ্যস্থতাকারী। তাঁর আহ্বান হলো সকলের প্রতি বিশেষ করে স্বজন ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও পারস্পরিক প্রেম, দয়া ও মমতার। তিনি ভালো কাজ ও ন্যায়পরায়ণতার আহ্বান জানান। তিনি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও শিশু হত্যার বিরোধী। প্রিয় বিলাল, তাঁর আহ্বান হলো, এই পৃথিবীতে সুখ এবং পরকালে মুক্তির। এখন বিলাল, তোমার কি মনে হয়?' বিলাল বললেন, 'কি যে বলবো, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ঃ বুঝতে পারছ না! প্রিয় বিলাল, আমি মনে করি তুমি এ কথা শুনে আমার চেয়েও আনন্দিত হবে যে, এই ধর্ম সাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আল্লাহ্‌র চোখে দাস ও প্রভুকে করেছে সমান। বিলাল, তুমি কিভাবে বললে যে, কিছু বুঝতে পারছ না? তুমি কি কুরায়শদের অচেতন কুসংস্কার কিংবা তাদের অসংখ্য মিথ্যে দেব-দেবী সম্পর্কে জ্ঞাত নও? তুমি কি সেই আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এসব পাথরের বোবা মূর্তিগুলোর উপাসনা করবে যিনি সর্বচেতন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং যিনি জীবন দান করেন, আবার জীবন নিয়ে যান?'

বিলাল বললেন, 'না আবূ বকর, কুরায়শদের এই মিথ্যার সংগে আমি মুহাম্মদের আহ্বানের তুলনা করছি না। সিরিয়া থেকে ফেরার পর তাদের দেব-দেবীর প্রতি আমার আর কোন শ্রদ্ধা নেই। তথাপি, আপনি তো জানেন, আবূ বকর, রাতারাতি ধর্ম পরিবর্তন করা শক্ত, তা সে যতোই ভালো হোক না কেন।'

ঃ বিলাল, তুমি যা বললে তা যদি কোন কুরায়শ নেতা বলতেন তাহলে মেনে নেয়া যেতো। কারণ কুরায়শ নেতা তাঁর ঐতিহ্যের গর্ব ক্ষুণ্ণ করতে হয়তো দ্বিধান্বিত হতেন। কিন্তু তোমার দ্বিধা কোথায়? এসব মূর্তি তো তোমার পূর্বপুরুষের নয়, তোমার কাছে কি এগুলোর কোন মূল্য আছে!'

বিলাল বললেন, 'এ মূর্তির সবগুলো চুরমার করে ফেললে আমার কিছু যায় আসে না। আমি এগুলোকে পরোয়া করি না।'

ঃ তাহলে তোমার দ্বিধা কোথায়। নিঃশংকচিত্তে ঘোষণা করো ঃ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াশ হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

www.pathagar.com

মুহূর্তখানেক নীরবতার পর বিলালের আর দ্বিধা-সংকোচ রইলো না, দৃঢ় কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ে তিনি উচ্চারণ করলেনঃ 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াশ হাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ্।'

আনন্দে অভিভূত আবূ বকর (রা) বিলাল (রা)-এর মস্তকে চুম্বন করলেন। তাঁকে বিদায় জানিয়ে বললেন, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদায়। আমি তোমার জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করবো, তোমাকে নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি তাঁর কাছে অঙ্গীকার করবে।

হযরত আবূ বকর (রা) যেসব কথা বলে বিলাল (রা)-কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি যুক্তি দেখতে পাই।

প্রথমত, আল্লাহ্র একত্ব। আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই উপাস্য। কাঠ বা অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মানুষের তৈরি মূল্যহীন মূর্তিগুলোর উপাসনা ছাড়তে হবে। মূর্তির উপাসনা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং প্রতিটি নরনারীর যে মর্যাদা প্রাপ্য তার সাথে মূর্তি উপাসনার কোন সংগতি নেই।

দ্বিতীয়ত, ইসলামে রয়েছে মানুষে মানুষে সাম্যের গুরুত্ব। বিলালকে তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা)-এর আহবানে দাস-প্রভুতে কোন ব্যবধান নেই এবং আল্লাহ্র চোখে সবাই সমান। [পরের রাতে বিলাল (রা) মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে যখন এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে বসে তাঁর ডান হাত ধরে ইসলামের প্রতি স্বীয় জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার করেন তখন তাঁর প্রতি দাস বা অবহেলিতের মতো আচরণ করা হয়নি। সহসা বিলাল (রা) একজন মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজের মূল্য উপলব্ধি করলেন এবং এই উপলব্ধি তাঁর দেহের প্রতিটি কোষ, প্রতি বিন্দু রক্তে একাকার হয়ে গেলো।]

তৃতীয়ত, মন্দ কাজ পরিহার করে ন্যায়পরায়ণ ও সদাচারী হবার আহ্বান।

ইসলামের ইতিহাসের এই উষালগ্নে যখন মহানবী (সা) ছাড়া আর মাত্র চারজন মানুষকে নিয়ে গঠিত ছিলো উম্মাহ, তখন হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যুক্তি দিয়ে বিলাল (রা)-কে আকৃষ্ট করেছিলেন। ইসলামের এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হলো ঃ আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস, মানুষের মর্যাদা ও মানুষে মানুষে সমতা এবং ন্যায়পরায়ণতা। আল্লাহ্ তাঁর সকল সৃষ্টির সত্যিকার মাবুদ। তাঁর কাছে সবাই সমান এবং মর্যাদা নির্ণীত হবে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে। সিরিয়ায় পাদ্রীর কথাগুলো শোনার পর থেকে

www.pathagar.com

কুরায়শদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে তাঁর ইতিমধ্যেই সন্দেহ জাগ্রত হলেও মুহূর্তের জন্যে বিলাল (রা) ছিলেন দ্বিধান্বিত। তিনি ভেবে বিস্মিত হন যে, আবূ বকর (রা) কিভাবে মুহাম্মদ (সা)–কে এতো তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে পারলেন। আবূ বকর (রা) ছাড়া সবাই এমনি দ্বিধা–দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। ওহী লাভের আগে মহানবী (সা)–র মতোই আবূ বকরও মূর্তির কাছে মাথা নত করতেন না, মদ্যপান করতেন না এবং একজন সদাশয় দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। অধিকন্তু হযরত খাদীজা (রা)–র মতো তিনিও দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা)–কে চিনতেন ও জানতেন। সেই জন্যেই তিনি বিলাল (রা)–কে বলেছিলেন, আর যে কারুর চেয়ে তাঁকে আমি অধিক জানি। তিনি জানতেন যে, মুহাম্মদ (সা) কতো নিখুঁত, কতো সত্যবাদী ও সৎ ছিলেন। আর তাই তিনি যা বলেছিলেন, নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করেন হযরত আবূ বকর (রা)।

কুরআন শরীফের এই আয়াতে ইসলামের এই সার্বজনীনতার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

'হে লোক সকল। আমি তোমাদের একই পুরুষ ও একই নারী থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ।' –সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতি অটল আনুগত্য ও রসূল (সা)–এর প্রতি অশেষ প্রেম ও ইসলামের প্রতি নিবিড় অঙ্গীকারাবদ্ধ কিছু সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ বিশ্বাসী ইসলামের পতাকাতলে শামিল হওয়ার পর যখন প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া হয়, তখন কেবলমাত্র মক্কার মূর্তিগুলোকে বাতিল ঘোষণা করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহবানের জন্যেই কুরায়শরা ইসলামের ঘোরতর বিরোধিতা করেন নি, তাঁদের বিরোধিতার কারণ ছিলো বদান্যতার এবং মানুষের মর্যাদা ও সাম্যের ওপর ইসলামের গুরুত্ব আরোপ। আরবের কুরায়শরা মুহাম্মদ (সা)–কে তিরস্কার করে বলতেন ঃ আপনি বলতে চান যে, আমাদের দাস–দাসী ও মেয়েদেরও আমাদের সমান মর্যাদা দিতে হবে!

নারী–পুরুষের সমতা প্রশ্নে কুরআন পাকে যেমন সন্দেহের কোন অবকাশ রাখা হয়নি (৩ ঃ ১৯৫ ; ১৬ ঃ ৯৭ ও ৩৩ ঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য), তেমনি মুহাম্মদ (সা)–

www.pathagar.com

ও সকল মানুষের মর্যাদা ও সম-অধিকারের উপর বরাবরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আরাফাত ময়দানে বিদায় হজ্জের বিখ্যাত ভাষণে বলেছেন ঃ

'হে লোক সকল, মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন এবং অনুধাবন করো। মনে রেখো, প্রত্যেক মুসলমান অপর সকল মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমানকে নিয়ে একটি একক (বৃহৎ) ভ্রাতৃত্ব গঠিত।'

–সিরাত ইবনে হিশাম, (কায়রো, ১৯৫৫) ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫১–১৫২

পাক কালামে এই ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে ঃ

'বিশ্বাসীগণ একে অপরের ভাই।' সূরা হুজুরাত ঃ ১০

ভ্রাতৃত্বের অর্থ সাম্য। মহানবী (সা) এ বিষয়টি তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে তুলে ধরেছেন ঃ

'হে লোক সকল। নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক। তোমাদের (মূল) পূর্বপুরুষ এক। নিশ্চয়ই কোন আরবের উপর অনারবের, কোন অনারবের উপর আরবের কিংবা কোন লোহিত ব্যক্তির উপর কৃষ্ণাঙ্গের অথবা কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন লোহিতের শ্রেষ্ঠত্ব দাবির কোন অর্থ নেই। কেবল ন্যায়পরায়ণতাই আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। এরপর রসূল (সা) বললেন, 'তোমরা কি জানো, আজকের দিনটি কোন্ দিন?' তারা বললেন, 'একটি হারাম (পবিত্র) দিন।' এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ তোমরা কি জানো, এ মাসটি কোন্ মাস?' তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হারাম (পবিত্র) মাস।' তিনি পুনরায় শুধালেন, 'তোমরা কি জানো, এ শহরটি কোন্ শহর?' তাঁরা বললেন, 'হারাম (পবিত্র) শহর।' এরপর মহানবী (সা) বললেন, সুতরাং (মনে রেখো,) আল্লাহ্ যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহরকে হারাম করেছেন তেমনি তিনি তোমাদের রক্ত ও সম্পদকে (এবং সম্ভবত তিনি বলেছিলেন তোমাদের ইজ্জতকে) করেছেন অলংঘনীয় ও হারাম। আমি কি (আমার বার্তা) পৌঁছে দিতে পেরেছি?' শ্রোতৃমন্ডলী প্রত্যুত্তরে বললেন, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহ্‌র রসূল।' রসূল (সা) বললেন, 'তাই যারা উপস্থিত আছো তারা (এই বার্তা) যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে পৌঁছে দিও।' (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), আল–মুসনাদ, কায়রো, ১৩১২ হিঃ, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৫১১)।

বিদায় হজ্জের ভাষণের আরেক অংশে হযরত নারীর অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'হে পুরুষগণ, নারীদের প্রতি তোমাদের যেমন

www.pathagar.com

অধিকার রয়েছে, তদ্রূপ তোমাদের প্রতিও নারীগণের অধিকার রয়েছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হলো তোমরা পছন্দ করো না এমন কাউকে (তোমাদের বাসগৃহে) প্রবেশ করতে দেবে না এবং তারা সুস্পষ্ট কোন ঘৃণ্য কাজ করবে না। যদি তারা তা করে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন তাদের (শাস্তিদানের) শয্যায় গ্রহণ না করা এমনকি প্রহার করার মাধ্যমে, তবে নির্দয়ভাবে নয়। তা না হলে, তাদের যুক্তিসঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদানে তুমি বাধ্য। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে বলবো।'

তারা তোমাদের দুর্বলতার অংশীদার এবং তারা তোমাদের কর্তৃত্বাধীনে (সুতরাং তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিও না)। যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের গ্রহণ করো, তাহলে আল্লাহ্র রহমতে তারা তোমাদের জন্যে হালাল। অতএব আমি যা বলি তা মেনে চলো এবং তার প্রতি দৃঢ় থাকো।'

এ সকল উত্তম উপদেশবাণী ছাড়াও বিদায় হজ্জের ভাষণে আমানতের খেয়ানত না করা, সুদ না খাওয়া, শয়তানের ধোঁকাবাজিতে না পড়া ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য শিক্ষাও রয়েছে। গভীরভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থেই এসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে দুর্বলের ওপর সবলের কিংবা দরিদ্রের উপর ধনীর শোষণের বিরোধিতা করা হয়েছে।

সুতরাং, মাত্র চল্লিশ বছর আগে জাতিসংঘের ঘোষিত আজকের সার্বজনীন মানবাধিকারই চৌদ্দশ' বছর আগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও কার্যকরভাবে ঘোষণা করেছে এবং মুসলিম আমলের অধিকাংশ সময়ে বাস্তবে রূপায়িত ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, জনৈক বেদুঈন সিরিয়ার সাবেক রাজার ঝুলে পড়া পোশাক অনিচ্ছাকৃতভাবে পায়ে মাড়িয়ে দেয়ায় তার মুখে চাবুকের আঘাত হানা হয়েছিলো। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, 'বেদুঈনকে এর বদলা নিতে হবে। মিসরের প্রাদেশিক শাসক আমর ইবনে আল-আব্বাস (রা)-এর ছেলে একজন প্রজাকে প্রহার করায় খলীফা উমর (রা) তার ঐ প্রাদেশিক শাসককে বলেছিলেন, 'তুমি মানুষের প্রতি এমন আচরণ করে থাকো,

www.pathagar.com

যেন তারা তোমার ক্রীতদাস। তারা স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।'

প্রসঙ্গত চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)–এর জীবনে যা ঘটেছিলো তাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে (কিতাব আল–আগানী, কায়রো, ১৯৫৬, দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ১৮৬২–৬৩ দ্রষ্টব্য)। হযরত আলী (রা) তাঁর বর্ম হারিয়ে ফেলেছিলেন। একদিন তিনি জনৈক য়াহূদীর কাছে বর্মটি দেখতে পেলেন। তাই য়াহূদীকে তিনি ডেকে বললেন, 'এই বর্ম আমার, আমি অমুক দিন তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।' খলীফার এই দাবি অগ্রাহ্য করে য়াহূদী বললো, 'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। এটা আমার বর্ম এবং তা এখন আমার কাছেই রয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে আমরা মুসলিম বিচারকের কাছে যেতে পারি, তিনি এ বিরোধের মীমাংসা করে দেবেন।' খলীফা আলী (রা) এতে সম্মত হলেন এবং উভয়ে কাযীর দরবারে গেলেন।

খলীফাকে আসতে দেখে তাঁর সম্মানে কাযী আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু খলীফা তাঁকে বসতে বললেন। হযরত আলী (রা) কাযীকে বললেন, 'য়াহূদীর হাতে এই বর্মটি আমার। আমি অমুক দিন তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু য়াহূদীটি তা এখন তার হাতে আছে, তাই নিজের বলে দাবি করছে।'

কাযী বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার কথাই সত্যি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এই বর্ম আপনারই। কিন্তু আপনাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে।'

খলীফা তাঁর অনুচর কানবার (রা) ও তাঁর পুত্র হযরত আল হাসান (রা)–কে আনলেন। উভয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, বর্মটি হযরত আলী (রা)–র।

তথাপি কাযী বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, আপনার অনুচরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলেও হযরত হাসান (রা)–এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী আদালতে পিতামাতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'

হযরত আলী (রা) কাযীকে বললেন, 'বেহেশ্‌তে যিনি যুবকদের সর্দার হবেন আপনি কি তাঁর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করছেন? নবী করীম (সা) বলেছেন, হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসাইন (রা) বেহেশতে যুবকদের সর্দার হবেন।'

www.pathagar.com

কাযী বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, আমি অবশ্যই এই হাদীস বিশ্বাস করি। কিন্তু আইন আইনই। সুতরাং য়াহূদী, তুমি বর্মটি হাতে নাও, এটি তোমার এবং তোমার বর্ম নিয়ে তুমি চলে যাও।'

য়াহূদী বর্মটি নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। যেতে যেতে তার মনে হলো, ইনি হলেন খলীফা, বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি। বর্মটি তো আসলে তাঁরই। কিন্তু আমার কথায় তিনি বিচারকের কাছে যেতে সম্মত হন। তাঁরই বিচারক তাঁর দাবির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন এবং তিনি তা মেনেও নিয়েছেন। য়াহূদী কাযীর দরবারে ফিরে গেলো। খলীফা সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন।

য়াহূদী বললো, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনিই সত্যি কথা বলেছেন। এ বর্ম আপনার। অমুক দিন বর্মটি আপনার উটের উপর থেকে পড়ে যায়। আমি তা কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে যাই। আর এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত পুরুষ।'

হযরত আলী (রা) বললেন, 'বর্মটি নিয়ে নাও, এটি এখন তোমার। এবং এই ঘোড়াটিও তোমার। আর বায়তুল মাল থেকে তুমি সাহায্য হিসাবে সাতশ' মুদ্রা পাবে।'

আর এই হলো ইসলামের শিক্ষা, যা মুসলমান–অমুসলমান সবার প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

মহানবী (সা)-র রিসালতের শিক্ষার সার্বজনীনতার আরেকটি দিক হলো তাতে পার্থিব ও অপার্থিব, বাস্তব ও অবাস্তব, ব্যক্তি ও সামাজিক এবং ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধ্যাত্মিকতা কিংবা পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বা রাষ্ট্র ও উপাসনালয়কে আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। একজন মুসলমান কি বাড়িতে, কি মসজিদে, কি বাজারে, কি কর্মস্থলে, যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর বিশ্বাসের নির্দেশনায়। ইসলামের শরীয়ত সর্বব্যাপী। শরীয়ত নিয়ন্ত্রণ করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, কর্ম জীবন, রাজনৈতিক জীবন, এমনকি বিনোদমূলক কর্মকান্ডও নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যাপকতার জন্যেই মাইকেল হার্ট তাঁর 'দি হানড্রেড, 'এ র‍্যাংকিং অব দি মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পারসন্স ইন হিস্ট্রি' (হার্ট পাবলিশিং কোম্পানী, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮) পুস্তকে

www.pathagar.com

মহানবী মুহাম্মদ (সা)–কে স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। অধিকন্তু মহানবী (সা)–র শিক্ষার আবেদন সার্বজনীন। এ শিক্ষা আকৃষ্ট করে সকল ধরনের মানুষকে। মহানবী (সা)–র শিক্ষা সঠিকভাবে উপস্থাপিত হলে তা ইসলামের শত্রুরও অন্তর কেড়ে নেয়। এই আকর্ষণ কেবল তখনই অন্তর কেড়ে নেবে যখন আচরণের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হিসেবে তা উপস্থাপিত হবে। এ কারণেই ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রচার নয় বরং প্রতিপালনের মাধ্যমেই ধর্মের দ্রুত ও ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিলো। যে কেউই অনেক দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন। কিন্তু সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন মুহাম্মদ (সা) স্বয়ং। তাঁর সংস্পর্শে যারা আসতেন তিনি তাদের সবাইকে গভীর মমতায় এতোই আপন করে নিতেন যে, মহানবী (সা)–র সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি নিয়ে কুরায়শ পক্ষের আলোচনাকারী আরওয়া ইবনে মাসউদ কুরায়শদের বলেছিলেন যে, 'আমি পারস্যের সম্রাট, রোমের হারকিউলিস ও আবিসিনিয়ার নেপাসকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে দেখেছি। দেখেছি তাদের প্রতি তাদের প্রজাদের আচরণ। কিন্তু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর অনুগামীরা যে ভালোবাসা, আনুগত্য ও মর্যাদার সাথে আচরণ করেন, তেমন আচরণ কোন নেতা বা রাজার ক্ষেত্রে আমি দেখিনি। আমি মনে করি, তারা তাঁকে কোন অবস্থায়ই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে চলে যাবেন না।' (আবুল ফজল আয়াজ ইবনে মুসা আল ইয়াশুবি, আল শিফা ফি হাকুক আম মোস্তফা, হালাবি প্রেস, কায়রো ১৯৫০, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩১)।

ইসলামের চমৎকার গুণাবলী যে শত্রুকেও কেমন শান্তিপূর্ণভাবে বশীভূত করে ফেলে য়াহূদী রাবি জায়েদ ইবনে সানার কাহিনী থেকে তা বোঝা যাবে। নবী করীম (সা) উমর ইবনে খাত্তাব (রা) সহ মদীনায় তাঁর কয়েকজন সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থায় জায়েদ উপস্থিত হয়ে তার কাছ থেকে মহানবী (সা)–র ধার নেয়া অর্থ অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় দাবি করেন। তিনি নবী করীম (সা)–এর জামা টেনে ধরায় তার স্কন্ধ মোবারক অনাবৃত হয়ে যায়। য়াহূদী বললেন, 'আপনারা আবদুল মোত্তালেবের ছেলে পুলেরা কারো কাছে ধার–দেনা থাকলে তা পরিশোধের ব্যাপারে কোন তাকীদই বোধ করেন না।'

মহানবী (সা)–র চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা গেলো না, মুখে তাঁর বরাবরই লেগেছিলো হাসি। কিন্তু হযরত উমর (রা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধমক দিলেন জায়েদকে। নবী করীম (সা) জায়েদকে তড়কে যেতে দেখে হযরত উমর

www.pathagar.com

(রা)–কে বললেন, 'তুমি আমাকে ঋণ পরিশোধের উপদেশ দান, তাকে তার দাবির প্রশ্নে সহানুভূতিশীল হবার পরামর্শ দান করলেই আমাদের জন্যে ভালো কাজ করতে । যা হোক, এই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে আরো তিন দিন বাকী আছে। তথাপি উমর, তুমি তাকে পাওনা অর্থ মিটিয়ে দাও এবং তাকে অসংগতভাবে আঘাত দেয়ার জন্যে কুড়িটি মুদ্রা বেশি দিও।'

বিরূপ ধারণাগ্রস্ত জায়েদ মহানবী (সা)–র দয়ার্দ্রতা ও ক্ষমাশীলতায় গলে গেলেন। ফলে ইসলামের ঘোরতর শত্রু জায়েদ সংগে সংগে গ্রহণ করলেন ইসলাম। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন এবং তাবুকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণের পূর্ব পর্যন্ত নবী (সা)–র পাশাপাশি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (প্রাগুক্ত, খন্ড ১, পৃঃ ৬৩–৬৪ এবং ইবনে হাজার আল–আসকালানি, আল–ইসাবা ফি তামিজ আস–সাহাবা, বৈরুত, ১৯৮৩, খন্ড ১, পৃঃ ৫৪৮–৯)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর নবুয়তের সার্বজনীন প্রকৃতি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

১. তাঁর নবুয়ত সকল মানুষকে সার্বজনীনভাবে আহবান জানিয়েছে। রসূলে পাক (সা) বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের জন্যে, প্রেরিত হয়েছি লোহিতকায়দের জন্যে এবং কৃষ্ণকায়দের জন্যে।' (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল–মসনদ, কায়রো, ১৩১৩ হিঃ, খন্ড ১. পৃঃ ৩০১, অধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২৫০, খন্ড ৪ ঃ ৪১৬ খন্ড ৫ ঃ ১৪৮; তৎসহ সহি মুসলিম, বৈরুত, ১৯৭৮, খন্ড, ৫ ঃ ৩৪; এবং আল–জারিমি, সুনাশ, ইস্তাম্বুল, ১৯৮১ পৃঃ ৬২০)।

২. তাঁর নবুয়ত অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করেছে এবং বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে সেগুলো কার্যকর, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। সুতরাং আধুনিক মানবাধিকার বা কোন কোন দেশের দ্বিমুখী নীতি থেকে মুসলমানদের তেমন কিছু শিখার প্রয়োজন নেই। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়া অনাবশ্যক যে, এসব পশ্চিমা দেশ সর্বান্তকরণে য়াহূদীদের নৃশংসতাকে সমর্থন করছে এবং জাতিসংঘ ও তার সংস্থাগুলোর চোখের সামনেই দক্ষিণ আফ্রিকা চালাচ্ছে বর্ণবাদী তৎপরতা।

www.pathagar.com

৩. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ব্যাপক ও সর্বতোমুখী। মানুষের কর্মকান্ডের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে ইসলাম অনুপ্রাণিত করেনি বা পথ দেখায়নি।

৪. নবুয়তের শিক্ষার আবেদন সার্বজনীন এবং সকল শিক্ষাই যুক্তিসংগত। ইসলামে এমন কিছু নেই, যা মানুষের প্রকৃতির পরিপন্থী বা মানুষের প্রগতির অন্তরায়। ইসলাম জ্ঞানের অন্বেষাকে উৎসাহিত করে, কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করে এবং যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সব কিছুকে করে বিধিসম্মত। নিষিদ্ধ করে ক্ষতিকর ও মন্দ কাজ। তাই, মুসলমানদের কার্যকলাপে যখন ইসলামের অনুশাসন প্রতিফলিত হয়, তখন তার আবেদন সার্বজনীন এবং আকর্ষণ হয় চৌম্বকীয়।

www.pathagar.com

হযরত রসূল-ই-আকরাম-এর বৈশিষ্ট্য

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

হযরত রসূল-ই-আকরামের ইন্তিকালের পরে কোন এক সাহাবী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র নিকট এসে আরজি করেন- আম্মা, আপনি হযরত (সা)-এর সম্বন্ধে আমার কাছে বর্ণনা করুন। তাতে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি কি কুরআন পাঠ কর না?' তার অর্থ হচ্ছে কুরআনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন হযরত রসূল-ই-আকরাম (সা)। কুরআন-উল করীমের মধ্যে ভূতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রয়েছে এবং এতে যে দর্শন বা বিজ্ঞানের নীতি যুক্ত করা হয়েছে হযরত রসূল-ই-আকরাম (সা) তাঁর জীবনে সেগুলো প্রচার করেছেন এবং কুরআনের নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

এখানেই রয়েছে তাঁর নবী জীবনের বৈশিষ্ট্য। এ কুরআন-উল-করীম নাযিল হওয়ার পূর্ব থেকেই তাঁর জীবনে এক প্রস্তুতির পর্ব দেখা দেয়। কুরআন নাযিল হওয়ার পরে যে সকল রীতি-নীতি বা যেসব খাদ্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে- তিনি তাঁর শৈশবকাল থেকে সেগুলো পরিহার করেছেন। তৎকালীন কুরায়শ সমাজে বা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়া, গোত্রে গোত্রে অত্যন্ত ছোটখাটো বিষয় নিয়েও মারামারি, হানাহানি প্রভৃতিতে তিনি লিপ্ত হননি। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহ্ মানব জাতির মধ্যে এমন এক জীবন বিধান প্রবর্তন করতে মনস্থ করেছিলেন, তাকে জন্মের পর থেকেই সে বিধানের প্রবর্তকরূপে গড়ে তুলেছেন। এখানেই সংস্কারক ও নবী-মুরসালদের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। সংস্কারকদের জীবনে কোন এক পর্যায়ে ধর্মান্তর (conversion) দেখা দেয়। নবী বা রসূলদের জীবন শৈশব থেকেই তার এক প্রস্তুতির সূচনা হয়। এ দুনিয়ায় ধর্মের ইতিহাস পাঠে

www.pathagar.com

জানা যায় হযরত মূসা (আ) বা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ এভাবেই তাঁদের শৈশব থেকে গড়ে তুলেছিলেন। হযরত মূসা (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকেই আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী মিসরের বাদশাহ ফেরাউনের শত্রু ছিলেন। তেমনি হযরত ঈসা (আ) তৎকালীন ইহুদী সমাজে প্রচলিত সুদপ্রথার বিরোধী ছিলেন।

সংস্কারকগণ কিন্তু গোড়া থেকেই এভাবে প্রস্তুত থাকেন না। মহামতি তলস্তয় ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী। জীবনের সুধারস পান করার জন্য ছিলেন অত্যন্ত প্রলুব্ধ। পঞ্চাশোত্তর জীবনে তাঁর মানসে মানব জীবন সম্বন্ধে ঐসব প্রশ্নের উদয় হয়, সেগুলোর সমাধানকল্পেই তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। এবং কায়মনোবাক্যে সেগুলো রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। এজন্য নবীদের জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের রয়েছে পার্থক্য।

তবে অন্য নবীদের সঙ্গে এক্ষেত্রে হযরত রসূল আকরাম (সা)-এর জীবনের রয়েছে পার্থক্য। হযরত আদম সফিউল্লাহ (আ) থেকে হযরত ঈসা নবী (আ) পর্যন্ত যত নবী এ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের জীবনের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় তাঁর মধ্যে অলৌকিকভাবে প্রাধান্য রয়েছে।প্রচলিত ইতিহাসের মধ্যে তাঁর জীবন ও কার্যাবলীর খুব স্পষ্ট নিদের্শন নেই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র জীবনের সব কিছুই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এজন্যে তাঁকে বিনা দ্বিধায় ঐতিহাসিক নবী বলা যায়।

ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে বলে তাঁর জীবনে অলৌকিকতার স্থান খুব নিম্নে। তাঁর কাজে-কর্মে, সাংসারিক জীবনে এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানের মধ্যে কার্যকারণ.পরম্পরা নীতির কার্যকারিতা এবং প্রকৃতির মধ্যে সমরূপিতা বা uniformity of nature নামক নীতির অমোঘতার স্বীকৃতি রয়েছে।

সমগ্র মধ্যযুগে প্রত্যয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে সকল মতবাদ গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে তাঁর দ্বারা প্রচলিত ইসলামের ধর্ম ভিত্তিক মতবাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি যুক্তির প্রাধান্য ছিল। তার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের ইন্তিকালের পরে যখন সূর্যগ্রহণ হয়, তখন কোন কোন সাহাবীর ধারণা ছিল নবী-মুরসালের পুত্রের মৃত্যুর ফলেই শোক প্রকাশকরূপে সূর্যগ্রহণ দেখা দিয়েছে। তিনি তাদের এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, তাঁর

www.pathagar.com

পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্য গ্রহণের কোন সম্বন্ধে নেই। এতে সমরূপিতার নীতির প্রতি তাঁর যে জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে তা-ই পরবর্তীকালে আধুনিক বিজ্ঞানের এক মস্তবড় ভিত্তিরূপে দেখা দেয়। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের পরে মানব জীবনে যুক্তি বা বুদ্ধির পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে যে তাকীদ দেখা দিয়েছিল, তাই পরবর্তীকালে বিবর্তনের ধারায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ আন্দোলনরূপে দেখা দিয়েছে। যে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যষ্টি জীবনকে জ্ঞানের বা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান। তা সম্ভবপর হতো যদি তাকে চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়া হতো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-কুরআন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তি ও স্বজ্ঞাকেও স্বীকৃতি দেয়ার ফলে তা সম্ভবপর হয়েছে। ইসলামের আধুনিক প্রতিনিধি ও ভাষ্যকার আল্লামা ইকবাল উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন, "ইসলাম ধর্মে পয়গম্বরীতার পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এ সত্যটিই আবিষ্কার করেছে, পয়গম্বরির অবসান হওয়া প্রয়োজনীয়। তার অর্থ হচ্ছে জীবন চিরকালই কোন-না-কোন নেতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না। পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্যে মানুষকে তাঁর স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। ইকবালের এ ঘোষণার পোষকতায় বলা যায় আল-কুরআন প্রত্যাদেশমূলক (Revealed) হলেও তাতে ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা যুক্তিবাদমূলক জ্ঞানের (Rational knowledge) বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। বরং এ সবের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের জন্য রয়েছে প্রচন্ড তাকীদ। সাধারণভাবে আল-কুরআনে জ্ঞানকে বলা হয়েছে 'ইল্‌ম'। তবে হিকমত বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তার অপর প্রধান অংশ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইকবাল তাই বলেছেন- আল-কুরআন সামান্য মৌমাছিদের ও আল্লাহ্র প্রেরণা লাভ করার অধিকারীরূপে দেখেছে, তাতে পাঠকগণকে বায়ুর সতত পরিবর্তনশীল গতি, দিবারাত্রির আবর্তন, নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং অনন্ত স্থানবাসী গ্রহসমূহের সঞ্চারণ অবলোকন করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে। অপর এক স্থানে তিনি বলেছেন-"কুরআনের ঘোষণা অনুসারে তাঁকে জ্ঞানের এক উৎস বলা যায়, অপর দুটো হচ্ছে ইতিহাস ও প্রকৃতি।"

কেবল কুরআনের বাণীতে নয়, হযরত রসূল-ই-আকরাম (সা)-র বিভিন্ন বাণীতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞান ও জ্ঞানের তথ্যাদি ঘন্টাখানেক শ্রবণ করা এক হাজার

www.pathagar.com

শহীদের জানাযা থেকেও অধিকতর পুণ্যের, এক হাজার রাত্রিতে সালাতের (নামাযের) উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়েও পবিত্রতর।"

জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগের জন্যে যেমন তিনি তাকীদ দিয়েছেন তেমনি মানবতাবাদেরও এক অপূর্ব আদর্শ তিনি এ দুনিয়ার মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা করেছেন।

প্রাচ্যে যে মানবতাবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে তার মধ্যে ভারতীয় মানবতাবাদের উল্লেখ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় মানবতাবাদের সর্বপ্রথম প্রকাশ পাওয়া যায় উপনিষদের প্রথা সূত্রে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেসব সূত্রে যে ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে তাকে বলা হয়েছে–এ বিশ্বের মূলে বিরাজমান সর্বমূলাধার সত্তা। এ বিশ্বকে তাকে সদৃও বলা যায় না অসদৃও বলা যায় না, কেননা এক হিসাবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্ম থেকে তার উৎপত্তি। তবে অসদৃও বলা যায় না, কেননা মূল সত্তা না হলেও তার একটা স্থিতি রয়েছে। তবে জীবমাত্রেই ব্রহ্মের অংশসম্ভূত। মানুষে মানুষে তো বটেই, মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে এমনকি মানুষ ও ব্রহ্মাদির মধ্যেও মৈত্রীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতি আধুনিককালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মানুষে মানুষে কেন প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, তার উত্তর পাওয়া যায় সকল ধর্মে–কেননা সকল মানুষেরই একই সৃষ্টিকর্তা। তবে মানুষ কেন ইতর জীবকে ভালবাসবে, তার উত্তর রয়েছে বৈদান্তিক ধর্মে। উপনিষদে বলা হয়েছে–নির্গুণ ব্রহ্মা থেকেই এ জগতের সকল কিছুর উৎপত্তি। কাজেই যেহেতু একই ব্রহ্মের বিচিত্র রূপ নিয়ে এ জগতের বিভিন্ন প্রাণী দেখা দিয়েছে তাদের গোড়াতে রয়েছে একই ব্রহ্মের ভিত্তিতে এজন্যই তারা প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে বাধ্য।

এ প্রত্যয়ের আলোকে ভারতে যে মানবতাবাদের সৃষ্টি হয়েছে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারতীয় সাহিত্যে। রামায়ণ ও মহাভারতে মানুষের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর প্রেম ও মৈত্রীর উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজা ভর্তৃদয়ের ঘোষণার মধ্যেও কালিদাসের মেঘদূত ও শকুন্তলা নাটকে তার প্রকাশ অতিশয় স্পষ্ট। প্রকৃতির সকল জীবের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া এ মানবতাবাদের লক্ষ্য।

প্রতীচ্যের মানবতাবাদের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে প্রেটার্ক কর্তৃক যে আন্দোলনের সূচনা হয়

www.pathagar.com

তাতে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য রয়েছে তাকীদ। ফ্রান্সের পাদ্রি বেবেলা, হল্যান্ডের বিশ্বপ্রেমিক ইরেসসাম, স্পেনের সাহিত্যে সার্ভেনীস, ইংলন্ডের নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপীয়র,বেকন ও স্যার টমাস ম্যূর ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। ব্যষ্টি জীবনকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার নিজস্ব মতবাদ গঠন করার স্বাধীনতা লাভ করার জন্য তার সূচনা হয়, বরং মানুষের কৃতকর্মের ফল মানুষেরা এ দুনিয়ায়ই ভোগ করে বলে প্রকারান্তরে পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করা হয়। তার ফলে ১৬শ শতাব্দীতে জার্মানীতে রিফরমেশন আন্দোলনের হোতারূপে মার্টিন লুথার দেখা দেন। তারই ফল হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তার ফলে দুনিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

এজন্য আচার্য সিলভান লেভী মানবতাবাদের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন–ইউরোপে মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক। অপরদিকে প্রাচ্যে মানবতাবাদের লক্ষ্য ছিল মানুষে মানুষে তো বটেই, প্রকৃতিতে অবস্থিত অন্যান্য জীবের মধ্যেও প্রেম ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা।

হযরত রসূল–ই–আকরাম (সা) যে মানবতাবাদকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন–তাকে কুরআন নির্দেশিত মানবতাবাদ বলা যায়। এ মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা হবে কুরআন–উল–করীমে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টির জন্য যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তারই আলোকে। কুরআন–উল–করীমে আল্লাহ্ বলেছেন তিনি এ দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রতিনিধির পক্ষে মূল মালিকের গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাকে মালিকের গুণে গুণান্বিত করতে হলে উপযুক্ত দিশারীর প্রয়োজন এবং সেজন্য পথ নির্দেশিকার (Guide line)-ও প্রয়োজন। এজন্য তিনি হযরত রসূল–ই–আকরাম (সা)–কে মহাশিক্ষকরূপে এবং কুরআন–উল–করীমকে নির্দেশিকা হিসাবে এ দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্র রসূল (সা) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ– আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হলেই মানুষের পক্ষে ইনসান–ই–কামিল হওয়া যেতে পারে। এ ইনসান–ই–কামিলের কর্তব্য হবে আল্লাহ্র এ সৃষ্টিকে তার ইচ্ছামত পরিচালনা

www.pathagar.com

করতে হবে। আল্লাহ্‌র গুণের সংখ্যা হচ্ছে নিরানব্বই। তার মধ্যে রব ও মালিক নামক দুটো গুণই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'রব' শব্দের অভিধানগত অর্থ হচ্ছে স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিবর্তনকারী। স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্‌র কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্ট সকল জীবের আহারের সংস্থান এবং বিবর্তনকারীরূপে তার কর্তব্য হচ্ছে এ দুনিয়াকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে উত্তোলন। মালিক হিসাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এ দুনিয়ায় অপর কারো মালিকানা নেই। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এ দুনিয়ার সকল সম্পদের উপর সকল মানুষেরই রয়েছে সমান অধিকার। এজন্য যারা ইনসান-ই-কামিলরূপে এ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবেন তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের আহারের জন্য দায়ী হবেন এবং এ দুনিয়ায় যাতে সকল মানুষ সমানভাবে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করবে।

এ মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠাকারীগণ আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হবেন বলে তাদের পক্ষে যেমন মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, করুণা মমতার সৃষ্টি করবেন তেমনি মানুষ বা পশু, যার দ্বারাই মানব জাতির অকল্যাণের রয়েছে আশংকা তার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র অপরাপর গুণের মধ্যে জব্বার (প্রবল পরাক্রান্তশালী), মুন্‌তাকিম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) প্রভৃতি গুণ যাতে কোন মানুষই তার নিজস্ব শক্তির প্রয়োগে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে নষ্ট করতে না পারে, এ জন্য আল্লাহ্‌র আদেশে গঠিত ইনসান-ই-কামিলগণ তাদের সমূলে ধ্বংস করবেন।

এ মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসূলকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁরই মতো জীবন-যাপন করার জন্য মানব সাধারণের প্রস্তুতি। এজন্য দেখা যায়, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) সামান্য পক্ষীমাতার দুঃখে কাতর হয়েছেন অথচ যারা মানুষের অকল্যাণের জন্য সর্বদাই ছিল প্রস্তুত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর জীবনে মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল বলে তিনি এ বিশ্বের সকল জীবকে ভালবেসেছেন-সকল মানুষকেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন-তবে যারা মানবতার অপমান করে মানুষকে পশুর শ্রেণীতে পরিণত করে শাসন ও শোষণ করতে চেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত হয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে মানবতাবাদ তাঁর দ্বারাই চরম বিকাশ লাভ করেছে। কারণ প্রকৃতির সর্ব জীবের প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিদান করে চিন্তার স্বাধীনতা দান করলে তাতে প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হতে পারে–তবে তাও পরিশেষে পুঁজিবাদে পরিণত হয়। এ দুনিয়ার পক্ষে আজকের দিনে এমন এক মতবাদের প্রয়োজন, যাতে চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে শোষণের কোন অবকাশ না থাকে।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মানবতাবাদ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মানবতাবাদ নামক যে বক্তৃতা দেন, তাতে মানবতাবাদের স্বরূপ প্রসঙ্গে তার দু'টো দিক বেশ পরিষ্কার হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন পঞ্চদশ শতকে প্রতীচ্যে যে মানবতাবাদের সূচনা দেখা দিয়েছিল এবং যার পরিণতিতে ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার কর্তৃক খৃষ্ট ধর্মের সংস্কার বা Reformation হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, তার পরিণতিতে প্রতীচ্যে গণতন্ত্র বা Democracy-র প্রতিষ্ঠা হয়। অপর দিকে প্রাচ্যে মানবতাবাদ প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করাতে। তিনি আরও দেখাতে চেয়েছেন–মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম– প্রীতি ও ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করাই মানবতাবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ মানবতাবাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন। সুদূর প্রাচ্যে কনফুসিয়াস যে মানবতাবাদের নিদর্শন রেখে গেছেন–সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর মানবতাবাদিগণ যে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাতে তাঁরা প্রকারান্তরে বিশিষ্ট কর্মগুলোকে, বিশেষ করে সেমেটিক ধর্মগুলোকে মানবতাবাদ বিরোধী বলে ধারণা করেছেন। মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনে রাজ্য শাসকগণ ও যাজক সমাজের মধ্যে আঁতাতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলে সর্ব সাধারণ মানুষের প্রতি এ উভয় শ্রেণীর মানুষেরা যে অত্যাচার করতেন, এ জন্য তাদের পক্ষে এরূপ ধারণা

www.pathagar.com

করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অথচ এ দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মের এবং ধর্ম প্রবর্তকদের বাণী ও শেষোক্ত মানবদের আচরণের আলোচনা করলে দেখা যায় য়াহূদী, খৃষ্টান বা ইসলাম ধর্মের মধ্যেও মানবতাবাদের ধারণা রয়েছে। এ দুনিয়ার নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষকে অত্যাচারী ও শোষক শ্রেণীর মানুষের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সংগ্রাম করেছেন। তওরাতে বর্ণিত রয়েছে, মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য হযরত মূসা (আ) বনি ইসরাইল কওমকে নিয়ে নীল নদ উত্তরণ করে জাজিরাতুল আরবের মাটিতে পৌঁছেছেন। তেমনি হযরত ঈসা (আ) য়াহূদী সুদখোরদের কব্জা থেকে দুঃস্থ মানবদের মুক্তি দেয়ার জন্য তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র বা Guild-কে আক্রমণ করেছেন। তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও তার হাতে টাকা-পয়সা সঞ্চিত হলে তা দিয়ে তৎকালীন দাস বা গোলামদের মুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মানবতাবোধ না থাকলে তাঁরা এ কাজে আত্মনিয়োগ করতেন না। প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়ার সকল ধর্ম প্রবর্তকগণই ছিলেন সমাজবাদী বা Socialist. তা'না হলে তাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য এভাবে অগ্রসর হতেন না। বর্তমানকালে আমরা মানবতাবাদের ফলশ্রুতি হিসাবে যেসব মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি তাদের মধ্যে সার্বিক গণতন্ত্র, নারীর সমান অধিকার, চিন্তা জগতে ব্যষ্টির স্বাধীনতা এবং দুনিয়ার সম্পদের উপর সকল মানুষের সমান অধিকার প্রভৃতি নীতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভের জন্যই তার উৎপত্তি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা ধর্মে ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচ্যের মানবতাবাদের লক্ষ্য ছিল মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রতিষ্ঠা। এ উপমহাদেশীয় সাহিত্যের শীর্ষদেশে অবস্থিত রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাসের কাব্য ও নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি কনফুসিয়াসের কর্মের মধ্যেও তার প্রকাশ বর্তমান। হিব্রু ঐতিহ্য থেকে যে মানবতাবাদ বিকশিত হয়েছে তাতে একদিকে যেমন রয়েছে মানুষে মানুষে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা, তেমনি অপরদিকে

www.pathagar.com

রয়েছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা এবং তা' চরম বিকাশ লাভ করেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনে।

তাঁর বাণী ও আচরণের মধ্যেই আমরা মানবতাবাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাই। প্রথমেই তিনি নিজেকে অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ বলে ঘোষণা করে সর্বসাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার ফলে অন্যান্য ধর্মের প্রধান পুরুষেরা যেভাবে আল্লাহ্‌র অবতার রূপে সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছেন–তিনি 'আনা বাশারুম মিসলুকুম' আমি মানুষ ব্যতীত অপর কিছু নই–এ বাণীর দ্বারা প্রতিবাদ করেছেন। কেবল মানুষের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। এ দুনিয়ার সকল জীবই যে পরস্পরের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বলে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ, এজন্য তাদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ থাকা উচিত। এ সম্পর্কেও তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল জীবই তার অন্তর্ভুক্ত এবং সে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল সাধন করে।'

আবার তিনি বলেছেন, কে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন? যেই ব্যক্তি যার কাছে থেকে তার বান্দারা সবচেয়ে বেশি মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। মানবতার প্রতি তাঁর জীবনে কত শ্রদ্ধা ও দরদ ছিল তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে অতিশয় পরিস্ফুট।–সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যার কাছ থেকে মানবতা নানাবিধ কল্যাণ লাভ করে। এভাবে মানব–সাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের মানসকে প্রস্তুত করে যাতে তাদের বাস্তব জীবনেও সেভাবের রূপায়ণ হয় এজন্য তিনি বলেছেন–কোন্ কাজগুলো সর্বোৎকৃষ্ট? "কোন মানুষের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করা, কোন ক্ষুধার্তকে আহার দান করা, কোন বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করা, কোন ব্যথিত লোকের ব্যথার উপশম বোঝা এবং কোন অন্যায়ভাবে কষ্টপ্রাপ্ত লোকের কষ্টের প্রতিকার করা।"

এ সকল উক্তির সারমর্ম থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, সকল মানুষই সমান, তারা একই পরিবারভুক্ত লোকের মতো। মানুষের কল্যাণ সাধন মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এসব বাণী থেকেই পরবর্তীকালে বিশ্বসভ্যতা সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পায়। প্রকৃতপক্ষে হযরত রসূল–ই আকরাম

www.pathagar.com

(সা) ধর্মের কাঠামোর মধ্যে যে গণতন্ত্রের বীজ বপন করেছিলেন, কালের ধারায় তাই ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের রূপ লাভ করে। মদীনাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি অতি সহজেই সে রাষ্ট্রকে রাজ্যে পরিণত করে তার শাহানশাহ বলে তিনি আপনাকে দাবী করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। সে ভবিষ্যত গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে বলে। যাতে সে রাষ্ট্রে বংশানুক্রমিক রাজত্বে পরিণত না হয়, এজন্য তার বংশের কোন মানুষকেই তিনি তার স্থলবর্তী হিসেবে মনোনীত করেননি। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে প্রথমে তখনকার দিনের সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। রসূল-ই-আকরাম (সা)-এর জন্মের সময়ও আরব দেশের ইয়ামন প্রভৃতি প্রদেশে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ছিল বর্তমান । এ দুনিয়ার সমাজ গঠনের ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা থেকে কালের ধারায় পিতৃ প্রধান সমাজের উৎপত্তি হয়েছে। বহুযুগ পর্যন্ত পুরুষেরা নারীদের অধীন থাকায় পুরুষের সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলেই প্রায় সকল সমাজেই নারী নির্যাতন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়ে পড়ে। আরবের মাটিতে সে নারী নির্যাতন রসূল-ই-আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে চরম রূপ লাভ করে । কোন সম্পত্তিতে নারীর তো কোন অধিকার ছিলই না, তার উপর একসঙ্গে বহু নারীকে বিয়ে করতে কোন বাধা-বিপত্তিও ছিল না । নারী পণ্যের মতো পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে গণ্য হত। সে যুগে জন্মগ্রহণ করেও আল্লাহর রসূল (সা)-এর মনে কোন প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি দেখা দেয়নি বরং উল্টোদিকে তিনি নারীর বন্ধন মুক্তির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে-আমি কাকে সম্মান প্রদর্শন করবো ? তার উত্তরে তিনি বলেছেন; তোমার আম্মাকে। এভাবে ৩ বার উত্তরদানের পরে তিনি বলেছেন, তোমার আব্বাকে। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সন্তানের নিকট মায়ের স্থান পিতার তিন গুণের মতো। আবার সন্তানদের উদ্দেশে বলেছেন,-'সন্তানের বেহেশতের স্থিতি মায়েদের পদতলে।' অপর এক স্থলে বলেছেন-'এ পৃথিবী সম্পদ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্মিকা নারী। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সম্পদ হিসেবে নারীদের মর্যাদা পুরুষদের চেয়ে বেশি। যদিও সীমিত অর্থে পুরুষদের অধিকার দেয়া হয়েছে তবু মর্যাদার দিক থেকে নারীকে অধিকতর উচ্চে স্থান দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আল–কুরআনের ভাষায় তিনি পরিবারে ও সমাজে নারীর অধিকারগুলো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। কেবল অধিকারের বেলায় নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি চরম স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেন। তাঁর নানা ভাষণে যুক্তির প্রাধান্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ যুক্তির চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেননি। অথবা যুক্তি থেকে সুন্দরতর কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। এ বৃত্তির মধ্যে সেই আল্লাহ্ সবগুলো মঙ্গল দান করেন, জ্ঞানের উৎপত্তি থেকেই আল্লাহ্র ক্রোধ এ যুক্তিতেই উদ্রিক্ত হয় এবং তা থেকেই পুরস্কার ও শাস্তি লাভ অর্থাৎ যুক্তি যাদের নেই তাদের পাপ–পুণ্যের কোন বিচারও নেই, যুক্তি বা সজ্ঞানকৃত কর্মেরই মানুষ ফল লাভ করে। যুক্তি–জ্ঞানের প্রতি এতো গুরুত্ব আরোপ তার পূর্বে কোন নবীই করেননি।

বর্তমানকালে মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র হচ্ছে এ দুনিয়া থেকে শোষণের অবসান। যে কোনভাবেই এ দুনিয়া থেকে শোষকদের উৎখাত করে এর সম্পদ সকল মানুষ যাতে সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই এ যুগের মানবতাবাদীদের মূল লক্ষ্য। যাতে এ দুনিয়ার সম্পদ কোনকালেই বা কোনভাবেই কোন ব্যক্তির, কোন গোত্রের, কোন দলের বা কোন শ্রেণীর কুক্ষিগত না হয় সে জন্য আল–কুরআন এ দুনিয়ার সম্পদের মালিকানা শুধুমাত্র আল্লাহ্র বলেই ঘোষণা করেছে। সে মালিকানার অর্থনৈতিক অর্থ যেভাবে চন্দ্র–সূর্যের আলোক, আকাশ, বাতাস, নদ,–নদী খাল–বিল প্রভৃতির পানি ভোগ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে–তেমনি এ পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করার অধিকার সকল মানুষের রয়েছে। এ দুনিয়ার সম্পদ বলতে খনিজ ও ধাতব পদার্থ, বনজ বৃক্ষাদি, ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্যাদি সব কিছুকেই বোঝায়। এসব বিষয়বস্তুতে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকলে কলহ–কোন্দল প্রভৃতি হতে পারে বলে যাতায়াত, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য মানুষেরা বিভিন্ন দেশ গড়ে তুলেছে। সে দেশের সম্পদের উপর সে সকল মানুষের বিশেষ অধিকার রয়েছে সত্য, তবে সেই সকল দেশের সম্পদে উদ্বৃত্ত থাকলে তা ঘাটতি অঞ্চলের মানুষের পক্ষে রিজার্ভ করে রাখা অবশ্য কর্তব্য বলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফে নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুনিয়ার সম্পদের একমাত্র

www.pathagar.com

মালিক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। সে সম্পদ যাতে সর্বাবস্থায় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল ভোগ না করে, তার জন্য তাদের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু আত্মসাৎ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত উসমান গনী (রা)-র খিলাফতকালে শাহানশাহী ভোগ-বিলাসের বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ভাবে কোনও বিশেষ শ্রেণীর এ দুনিয়ার কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে হযরত রসূল-ই-আকরামের অন্যতম প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন। পরবর্তীকালে জাহিরী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম ইবনে হাজম মানুষের প্রয়োজনের সীমা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মহল্লায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, একজন মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে তার শরীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য পুষ্টিকর আহার্য, তার লজ্জা নিবারণের জন্য শীত গ্রীষ্মাদি বিভিন্ন ঋতুতে তার শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত পোশাক, বিভিন্ন ঋতুতে ঝড়, বৃষ্টি, বাদল বা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ।

তাতে স্পষ্টই মনে হয় হযরত রসূল-ই-আকরাম (সা) যে মানবতাবাদের প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার জন্য যে বীজ মন্ত্র দিয়েছিলেন তার আলোকেই বর্তমান কালের মানবতাবাদ আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। তাঁর মানবতাবাদ ছিল বাস্তবধর্মী। সে মানবতা কেবল নীতি নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে বাস্তব জীবনে রূপায়ণের জন্যও প্রেরণা দান করেছে। আজকের দিনে এ দুনিয়া তার সে নীতি গ্রহণ করলে অনেক দ্বন্দ্বেরই অবসান হত, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

তথ্যপঞ্জী

১. Prof Sylvan Levi–Humanism in the East and West, Published by the University of Dhaka.

২. Dewan Md. Azraf, Hazrat Abu Dharr Ghifari Published by the Islamic Foundation, Second Edition 1988.

৩. Ibn Hazm–vol VI, p. 158.

www.pathagar.com

মানব জীবনের সমস্যা সমাধানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

এ বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মানব-জীবনকে নানা যুগে এবং একই যুগে মনীষিগণ খন্ড খন্ডভাবে দেখেছেন। তার ফলে মানব জীবনের নানা সমস্যাও তাদের কাছে খন্ড খন্ডভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এজন্য সে সমস্যাগুলোর সমাধানও হয়েছে একদেশদর্শীরূপে। এতে এক যুগের সমাধানের সঙ্গে অপর যুগের সমাধানের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে। তার ফলে মানব জীবনে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মারামারি, হানাহানি।

সুদূর অতীতে মানব-মনীষার সূত্রপাত হয়েছে গ্রীস দেশে। এ দীর্ঘকাল ব্যাপী যারা মানব জীবনের সে আদি প্রশ্ন, এ দুনিয়ার আদি সত্তার রূপ কি? প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে একমাত্র সোফিষ্টগণ ব্যতীত অপর সকলেই মানব জীবনকে বুদ্ধিরই এক প্রকাশ বলে ধারণা করেছেন। সোফিষ্টগণের উদ্দেশ্য মহৎ না হলেও তারা মানব জীবনে ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যকারিতার ফলে উদ্ভূত জ্ঞানকে স্বীকার করে তার ফল প্রচার করেছেন। ব্যক্তি মানুষের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে তাদের এ প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেনি। গ্রীক দর্শনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা দেয় প্লেটো ও এরিস্টটলের চিন্তাধারায়। প্লেটোর দর্শনের বস্তু হচ্ছে of the good মঙ্গলের ধারণা। তাও তার মননেরই ফল। এতে মানব জীবনের কার্যকরী বুদ্ধি সাময়িকভাবে সন্তোষ লাভ করলেও তাতে বিরাট মানব জীবনে উত্থিত নানাবিধ সমস্যার সমাধান হয়নি। মানব জীবনে সাম্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করেছেন, তাতে বার্টান্ড রাসেলের ভাষায় বলা

www.pathagar.com

যায়, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কারো ইচ্ছা থাকলে সে তাতে গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা না থাকলে তা গ্রহণ নাও করতে পারে। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল তার দর্শনকে সমুজ্জ্বল করতে যেয়ে তার প্রচারিত নীতির অনেকগুলো পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তার কাছেও মানবিক সমস্যা ছিল মানব জীবনের বুদ্ধি থেকে উৎপত্তি প্রাপ্ত সমস্যা, যদিও তিনি মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যেয়ে বলেছেন Man is rational animal–মানুষ একটা যুক্তি পরিচালিত জীব, তবু তার আলোচনার মধ্যে মানব জীবনের যুক্তির প্রাধান্য বিশেষ করে প্রাধান্য লাভ করেছে। সে যে জীব এবং জীব হিসেবে যে তার জীবনে নানা সমস্যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আলোচনা করেননি।

সমগ্র মধ্য যুগে প্রত্যয় (Faith) ছিল প্রবল। খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের পরে দুনিয়ার মনীষিগণ যুক্তির দুস্তর পক্ষ পরিত্যাগ করে মানব–মানসের শান্তির জন্য প্রত্যয়ের আশ্রয় নেন। তবে মানব–মানস অখণ্ড এবং সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকায় এ ক্ষেত্রেও তা স্তব্ধ বা স্থানু হয়ে বসে থাকেনি। পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁ আন্দোলনের সূচনার পূর্বেই তাতে বুদ্ধির দীপ্তি আস্তে আস্তে প্রখর হতে থাকে।

সে রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলে মানব–মানস মুক্তি পেয়ে জীবনের মধ্যে উত্থিত নানাবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়। তার ফলে তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দিকে যেমন আরোহ পদ্ধতির (Inductive) প্রবর্তন সম্ভবপর হয় তেমনি যুক্তিরও প্রবর্তন দেখা দেয়। মনীষী বেকন যে সকল নীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার ফলেই এরিস্টটলের অবরোধ পদ্ধতির পাশাপাশি আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগও সহজ হয়ে দেখা দেয়। এর ফলে এ বিশ্ব সভ্যতায় বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছে। তবে এতে জ্ঞানের একটা বিশেষ দিক থেকে যায় অজ্ঞাত। যদিও মধ্যযুগের সূচনার পূর্বে তত্ত্বজ্ঞানী প্লটিনাস সে জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি দান করেছেন, তবুও তা ছিল দীর্ঘকাল দার্শনিক মহলে অবহেলিত। আধুনিক দর্শনের সূচনায় তত্ত্বজ্ঞানী স্পিনোজা (১৬৩২–১৬৭৭ খৃঃ) তার পূর্বে ক্যান্ট (১৭২৪–১৮০৪) এবং তারই দর্শনকে সঙ্গতিদান করার মানসে শেলিং (১৭৭৫–১৮৫৪) সত্তাকে স্বীকার করেছেন। তবু মানব মনে সে সত্তার যে প্রচণ্ড ক্রিয়াশীলতা রয়েছে– তা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ফরাসী

www.pathagar.com

দার্শনিক বেনমোর (১৮৫৯–১৯৪১) আবির্ভাবের পূর্বে জ্ঞানের এ দিকটা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা হয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য ইতালী দেশীয় দার্শনিক ক্রোচে (১৮৬৬–১৯৫২) তার দর্শনে তার যথাযথ মর্যাদা দানের চেষ্টা করেছেন।

কেবলমাত্র দার্শনিক মতবাদের মধ্যে নয়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের ও মানব মন তথা মানবাত্মা সম্বন্ধে এভাবে একদেশদর্শী নানা মতবাদ দেখা দিয়েছে। প্লেটোর ধারণা ছিল মানবাত্মার নানাবিধ অংশ রয়েছে। এরিস্টটল তার বিরুদ্ধে মানবাত্মাকে এক অখন্ড ও অবিভাজ্য বলে ধারণা করে তার মধ্যে কতকগুলো মনোবৃত্তি আবিষ্কার করেছেন। সেগুলোকে পুষ্টিকর (Nutritive) অনুভূতি সম্পন্ন (Sensitive) ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন (Rational) বলে অভিহিত করেছেন। তার ধারণা ছিল পূর্বোক্ত অংশ নষ্ট হলেও আত্মার বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন (Rational) অংশ নষ্ট হয় না। এজন্যই আত্মা অমর ও অক্ষয়।

সমগ্র মধ্যযুগে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই আত্মার এ অংশের সঙ্গে পরমাত্মা বা পৃথিবীর সম্বন্ধ নির্ণয়ে চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিককালে মধ্য যুগীয় ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলেও ক্যান্ট পর্যন্ত আত্মা সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারণার ছাপ ছিল। অতি আধুনিককালে উইলিয়াম জেম্‌স প্রেসেসই সর্ব প্রথম মানব–চেতনাকে প্রবহমান (Slowing) বলে ধারণা করেন। তার ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়োর মধ্যে যে অযথা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অপনোদনের সূত্র পাওয়া যায়। জেম্‌সের মতবাদ অনুসারে চেতনার প্রবহমান ধারা থেকে মানুষ তার সুবিধার জন্য এক একটা বিষয় বা বস্তু সৃষ্টি করে তাতে তিনি বিষয় ও বিষয়ীকে সমমর্যাদা দিতে চাইলেও বিষয়ীর মর্যাদাই উচ্চতর থেকে যায়। কারণ সে প্রবহমান চেতনা থেকে বিষয় (Subject) কিছু নির্বাচিত করে না, নির্বাচন করে বিষয়ী (Subject) যাকে সাধারণ ভাষায় মানব–মানস বলা যায়।

অপর দিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) মানব জীবনে আবিষ্কার করলেন এক অমোঘ যৌন শক্তি বা (Libido)। তার কার্যকারিতার ফলেই মানব–মানস নিয়ন্ত্রিত হয়। এ শক্তি উর্ধ্বে উত্থিত (Sublimated) হয়েই নানাবিধ সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়। শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ কলার মূলে সেই আদি কামশক্তিই রয়েছে ক্রিয়াশীল, তবে

www.pathagar.com

ম্যাকডুগালের (Mcdougal) মতে মানব-মানসকে যুদ্ধ-স্পৃহা বা (Pugnacity) সর্বপ্রধান সহজাত বৃত্তি। সে বৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্ত হয়েই মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে নানাবিধ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সাম্প্রতিককালে এ্যাডলার (Adler) নামক অপর এক মনোবিজ্ঞানীর মতে শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা (Love of power) দ্বারাই মানব জীবন নানা ক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা পাচ্ছি নানাবিধ মতবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ্যাডাম স্মিথের (Adam Smith) মতবাদই ছিল প্রধান। তাঁর ধারণা ছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যষ্টিক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তা হলেই তার পক্ষে সীমাহীন উৎপাদন করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি উৎপাদন প্রচুর হলে তাতে বিশেষ দেশের, জাতির তো বটেই এ বিশ্বের সর্বসাধারণের প্রচুর উপকার সাধিত হবে। এ মতবাদের বিরুদ্ধে কার্ল মার্কস (Karl Marx) তাঁর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Economic determins) প্রচার করে এ বিশ্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ব্যাষ্টিক তার পুঁজিসহ অবাধ উৎপাদনের ক্ষমতাদান করলে তার মূলধন ক্রমেই ফেঁপে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজদুরদের আয় নিচের দিকে নামতে থাকে। তার ফলে দুনিয়া বিত্তবান ও বিত্তহীন (Haves and have-nots)-এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ফলে এ দুনিয়ায় বিত্তহীন অনিবার্য ভাবেই একজোট হয়ে বিলাসী ধনীর প্রাসাদ চূর্ণ করবে।

ইতিহাসের ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ দুনিয়ায় নানা মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটা মতবাদের আলোচনা করলেই বোঝা যাবে-তাতে মানব জীবনকে কত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। পূর্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ক্যান্টের মতবাদ অনুসারে বিশ্ব সভ্যতা দু'টো পরস্পর বিরোধী প্রবণতার ফলেই অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রবণতা রয়েছে এবং মিলনের ফলেই মানুষ তাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত জীব হলেই অনুভব করে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে ঠিক বিপরীত ধরনের এক প্রবণতা বর্তমান। তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও

www.pathagar.com

চায়। এতে তাদের মানসে ধারণা জন্মে তারা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতাতে লিপ্ত। তাদের মানসের এ দ্বন্দ্বের ফলেই তারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে অপর মানুষের সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্র হতে চায়। এতে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে, অন্য মানুষের সঙ্গ তাদের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, তাদের সঙ্গ তেমনই বর্জনীয়। এভাবে একটা বিকৃত মনোবৃত্তি থেকেই মানুষের সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠে।

ক্যান্টের পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে হেগেলের ধারণা ছিল ইতিহাসের ধারার সূত্র পাওয়া যায় স্বাধীনতার ধারণা থেকে। সে চেতনা দেখা দেয় আত্মার মধ্যে এবং পরে তা স্বাধীনতার রূপায়ণের মধ্যে পর্যবসিত হয়। উদাহরণ স্থলে বলা যায় প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন, ব্যবিলন, মিসর প্রভৃতি দেশে স্বৈরতন্ত্র ও দাসত্ব এক সময় সাধারণ নীতি হিসেবে গৃহীত ছিল। ব্যক্তি মাত্রের জীবনই স্বাধীন ছিল। তিনি রাজা বলে সম্মানিত ছিলেন। গ্রীক রোমান সভ্যতায় দাসত্ব প্রথা রক্ষিত হলেও তাতে স্বাধীনতার ধারণা বিস্তৃতি লাভ করে। তার ফলে দেশের সর্ব সাধারণ নাগরিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে সমর্থ না হলেও স্বাধীনভাবে সকলেরই অধিকার রয়েছে বলে একটা নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। এ ধারণা গ্রহণ করে ব্যাষ্টি মানুষের স্বাধীনতা নিরংকুশ নীতি গ্রহণ করেছে। অতি আধুনিককালে ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বার্টাণ্ড রাসেলের ধারণা সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি মনে করেন, ভৌগোলিক ধারণা থেকে সাংস্কৃতিক কার্যের উৎপত্তি হতে পারে এবং তা থেকে বৈজ্ঞানিক স্পৃহার সৃষ্টি হতে পারে। আবার তা থেকে শিল্প জগতে বিপ্লব দেখা দিতে পারে। তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, বর্তমান যুগের শিল্পের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের মূলে রয়েছে কোপারনিকাসের অবদান। আবার কোপারনিকাসের সৃষ্টিতে রয়েছে কনস্টান্টিনোপলের পতন। কনস্টান্টিনোপলের পতনের মূলে রয়েছে তুর্কীদের বহিরাগমন। তার মূলে রয়েছে এশিয়ার মধ্যভাগ প্রাকৃতিক কারণে ওষুধ ভূমিতে পরিণত হওয়া। কাজেই কোনও একক কারণের দ্বারা শিল্প বিস্তারের ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। মার্কসবাদীরা যেভাবে কেবল অর্থনৈতিক কারণের দ্বারা মানব–সভ্যতার ব্যাখ্যা দিতে চান তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

www.pathagar.com

বর্তমানকালের রাজনীতিতে আমরা পাচ্ছি প্রধানত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতবাদগুলোকে। অতি পুরাতনকালে গ্রীকদের মধ্যে তাদের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় দেখা দিয়েছিল গণতন্ত্র। তবে তাতে বর্তমানকালের গণতন্ত্রের মতো এত পরিচ্ছন্ন নীতি দেখা দেয়নি। পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁ থেকে মানবতাবাদের যে সুর উঠে, তারই ফলে ষোল শতাব্দীতে ধর্মের রাষ্ট্রের ব্যাষ্টির স্বাধীনতা মন্ত্র হিসেবে রিফরমেশন দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের সুরই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুরে পরিণত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে তা আরও পরিষ্কার রূপ গ্রহণ করে। তাতে গণতন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) বলেন, (Government of the people, by the people, for the people) অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার হবে দেশের সর্বসাধারণের সরকার, তাদের দ্বারা গঠিত তাদের জন্য। তার ফলে সর্বসাধারণের ভোটদানের নীতি গৃহীত হয়েছে। তবে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Lusky) তাতে এক মহা দ্বন্দ্বের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। ভোট দানের অধিকার সকলের থাকলেও তাতে ধনী লোকের পক্ষে ভোট ক্রয় করে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অধিক। তার এ সমালোচনা ব্যতীত তাতে রয়েছে অপর এক ত্রুটি। তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায় না। গণতন্ত্র শাসিত দেশে নানাশ্রেণীর শিল্পী থাকতে পারে, নানা শ্রেণীর লোক থাকতে পারে। তাদের দ্বারা নির্বাচিত দেশে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সম্ভাবনা মোটেই থাকে না। সুর শিল্পী, কলাকার নানার মজদুর বা শিক্ষক শ্রেণীর প্রতিনিধির পক্ষে গণতান্ত্রিক পার্লিয়ামেন্টের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প। এজন্য কর্ম-ভিত্তিক গণতন্ত্রের (Functional democracy) প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্দোলন দেখা দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের মোদ্দা কথা হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। সে লক্ষ্যের পানে সমাজকে পরিচালনা করাই তার কর্তব্য। পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপ করে প্রকৃত মানব প্রেমিক নেতারাই রাষ্ট্রের কর্ণধার হতে সমর্থ হবেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দর্শনশাস্ত্রে, জ্ঞান বিদ্যার ক্ষেত্রে, মনস্তত্ত্বে বা ইতিহাস শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় মানব জীবনকে দেখা

www.pathagar.com

হয়েছে এক একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। তেমনি রাজনীতিতেও তাকে গ্রহণ করা হয়েছে কোনও একটা বিশেষ প্রবণতার অধিকারী হিসেবে। এজন্যই মানব জীবনের এত অপব্যাখ্যার ফলে একটা মতবাদের সঙ্গে অপর একটা মতবাদের চলছে সতত দ্বন্দ্ব। মানব জীবন ও তার সভ্যতা সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে তার জীবনের প্রকৃত পরিচয় লাভ সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তারই আলোকে তার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কার্যকর ও দুনিয়ার নানা আশ্চর্যের বিষয়ের মধ্যে মধ্য যুগের ঘোর তমসাচ্ছন্ন আরবের মাটিতে হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সা)-এর জন্ম অন্যতম। তিনি তাঁর কাল উত্তীর্ণ দৃষ্টির আলোকে মানব জীবনকে সামগ্রিকভাবে পাঠ করেছেন এবং তাঁর জীবনের নানাদিকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁর কাছে প্রেরিত ওহীর আলোকে। মানব জীবনে যেসব সমস্যা অনিবার্যভাবে দেখা দেয়, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান। আমরা মানুষেরা কোথা থেকে এলাম? কোথায় ফিরে যাবো? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের জীবনের ইতি হবে? আমাদের এ আগমনের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে কি না? আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায়? মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম কি? মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর না পরার্থপর? মানুষ এককভাবে বাস করে সুখী হতে পারে, না সমষ্টিগতভাবে বাস করে সুখী হবে? মানুষের জীবনে কোন্ প্রবৃত্তি সবচেয়ে প্রধান? কাম প্রবৃত্তি, যুদ্ধ স্পৃহা, না শক্তি-লাভের থাকা উচিত? এ সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি কুরআন-উল-করীমের ভাষায় বা তার নিজস্ব সত্তার আলোকে দিয়েছেন এবং সে সকল সমস্যার জন্য একটা আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধান করেছেন। সে রাষ্ট্র যদিও বেশি দিন টিকে থাকেনি তবুও তার এক একটা নীতি এখনও বিভিন্ন সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রবর্তিত হচ্ছে। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় জীবন-জিজ্ঞাসার তার উত্তরগুলো ছিল চিরন্তন ও শাশ্বত। এজন্য এ যুগে কেন অনাগত ভবিষ্যতেও মানুষের পক্ষে বাধ্য হয়েই সেগুলোকে জীবন সংস্থায় রূপায়িত করতে হবে।

জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে তিনি কুরআন-উল-করীমের ভাষায় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, যুক্তিলব্ধ জ্ঞান, ইতিহাস পাঠ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মর্যাদা দান করেছেন। মানুষকে শুধু মাত্র স্বার্থপর একক জীবন-যাপনে অভিলাষ বলে যেমন

www.pathagar.com

তিনি ধারণা করেননি, তেমনি সমাজদেহে তাকে সম্পর্কহীন বলেও ধারণা করেন। ষড় রিপুকে তিনি উৎপাটন না করে জীবনে তাদের যথাযথ মূল্য নির্ণয় করে সুনিয়ন্ত্রিত করার আদর্শ স্থাপন করেছেন। মানুষ তার কাছে ছিল অসংখ্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তির অধিকারী আলোক সামান্য এক জীব এ দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তাই তার পক্ষে সুস্থ জীবন- যাপন করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এজন্য সে সুস্থ স্বাভাবিক এবং আদর্শিক জীবন-যাপন করার মন্ত্র তাকে শুনিয়েছেন।

আজকের দুনিয়ায় তাই যেসব দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে তার নিরসন তখনই হতে পারে, যখন মানুষ তার প্রকৃত পরিচয়ের আলোকে তার জীবনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাধনা করবে এবং তার সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রকৃতি সে পরিচয়ের আলোকেই গঠন করতে প্রস্তুত হবে। একদেশদর্শী, অপূর্ণ, অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে মানব-সভ্যতা যে দোল খাচ্ছে, যে সংঘাত সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, আজ হযরত মুহম্মদ (সা) প্রবর্তিত নীতির অনুসরণ করে যদি মানব জীবনকে গভীরভাবে অর্থবান না করে এবং তার জীবন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করতে সমর্থ না হয়, তা' হলে মানব-সভ্যতার কি পরিণতি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান-দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। মানব জীবনের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরের জন্য এসব মতবাদের উৎপত্তি এবং এসব প্রশ্ন দেখা দিতেছে নানাবিধ সমস্যা থেকে। এ সকল সমস্যার সমাধানকালে মানব জীবনের কোনও এক বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে নানাবিধ মতবাদের উৎপত্তি। ফলে তাতে এ সব দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। মানুষ রক্ত মাংস দ্বারা গঠিত জীব। তার মধ্যে যেমন কামক্রোধ প্রভৃতি ষড় রিপু রয়েছে, তেমনি তাদের সুপথে পরিচালনা করার জন্যও রয়েছে মানুষের মননশীলতা। মানুষ যেমন তার দেহের পুষ্টির বা পরিপূর্ণতার জন্য আহার করে, তেমনি তার মানসিক বিকাশের জন্য জ্ঞান আহরণ করতে চায়। সে যেমন স্বাধীন জীবন-যাপন করতে চায়, তেমনি সে কর্তব্যবোধে প্রণোদিত হয়ে দেশের ও

www.pathagar.com

দশের সেবা করতে চায়। সে যেমন শোষিত হতে চায় না, তেমনি অপরাপর লোককেও শোষিত হতে দেখতে চায় না। সে যেমন তার নিজের ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে, তেমনি দেশের লোকেরও মঙ্গল চায়। কেবল দেশের লোকের নয়, এ দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতিও রয়েছে তার সহানুভূতি। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে তা'হলে ব্যাষ্টিতে ব্যাষ্টিতে, জাতিতে জাতিতে এতসব মারামারি হানাহানি হয় কেন? কেন দু'দিন পরপরই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অনল জ্বলে উঠে? মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে না দিয়ে অতি শৈশবেই তার মনে এমন কতকগুলো বুত (Idol) চাপিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে পরিণত বয়সেও সে তার সত্যিকার প্রকৃতি দ্বারা চালিত হতে পারে না। গোড়া থেকেই যদি মানুষের সত্যিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তাকে সেভাবেই গঠন করা হত, তা'হলে বিশ্ব-সভ্যতা এরূপভাবে বিড়ম্বনাগ্রস্ত হ'ত না।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-র জীবনে আমরা দেখতে পাই মানুষকে তিনি দেখেছেন পূর্ণাঙ্গ রূপে এবং সে পূর্ণ মানুষের বিকাশের জন্য তার সম্মুখে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন। মানুষকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তার প্রত্যেক বৃত্তি ও প্রবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং একই আদর্শের আলোকে ব্যাষ্টি সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। প্রথমেই তার নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-আনা বাশারুম মিসলুকুম-আমি তোমাদের মতই মানুষ। কাজেই পয়গম্বর হতে হলে যে অলৌকিক শক্তি বা অলৌকিক জীবনের অধিকারী হতে হয়, এরূপ ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছেন। কোন পয়গম্বর যে কেবল আরব জাতির জন্য বা কেবল মাত্র কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আবির্ভূত হননি তা কুরআন-উল-করীমের ভাষায় বলেছেন-'এমন কোন জাতি নেই যার ভেতর সতর্ককারীর আবির্ভাব হয়নি।' তার সোজা অর্থ হচ্ছে এই-প্রত্যেক জাতির মধ্যে সতর্ককারীর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাদের বাণী বিশ্বের মানব সাধারণের কল্যাণে কার্যকরী হয়েছে। এজন্য তার মতবাদ অন্যান্য নবী মুরসালদের মত এ বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই যে গৃহীত হবে তা' স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। জীবন-

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসার নানাবিধ প্রশ্নের সমাধান তাই তার পক্ষে সহজ হয়েছে। কারণ তিনি মানব জাতিকে এক ও অখণ্ড সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এজন্যই তার জীবন থেকে আমরা জীবনের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর পাই। জ্ঞানবিদ্যায় পণ্ডিত লোকদের মতো তিনি মানুষের জ্ঞানকে অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism), যুক্তিবাদ (Rationalism) বা স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি। তিনি জ্ঞানের প্রত্যেকটি স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআনের ভাষায় তিনি ইল্‌ম ও হিকমতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং ইল্‌মকে সর্বাত্মক জ্ঞান বলে গ্রহণ করে তার চর্চার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। জ্ঞান আহরণের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। এমনকি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পক্ষে জ্ঞান আহরণকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন।

দার্শনিক দিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে। আল কুরআনে কোথাও আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবরণকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও বা তাকে আমাদের গলার শাহ রগের আরও নিকটবর্তী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার কোথাও তাকে সারাবিশ্বে ব্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও এ বিশ্বের বাইরেও তার সত্তা বর্তমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও তাকেই একমাত্র সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্‌র সত্তার বিভিন্ন দিকই প্রকাশিত হয়েছে। তবে সকল বর্ণনাতে সর্বোত্তম সত্তা বলে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ব্যাষ্টি ও সমষ্টির অধিকার লোপ করে আল্লাহ্‌র রাষ্ট্রে তাদের ভোগ দখলের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তার ফলে একদিকে যেমন প্রজাতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিকাশের রয়েছে সুযোগ, তেমনি ব্যাষ্টি ও সমষ্টির অধিকারেরও রয়েছে সমন্বয়। এজন্য ইসলাম অনুমোদিত রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন দল বিশেষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের মতো এ দুনিয়ার ধনসম্পদ সমানভাবে ভোগ করার অধিকার এ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই রয়েছে। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রেরও আলোক, সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, ঝিল প্রভৃতি, বায়ু প্রভৃতি ভোগ করার অধিকার যেমন সকল দেশের সকল মানুষের রয়েছে, তেমনি

www.pathagar.com

এ দুনিয়ার সকল সম্পদ এ দুনিয়ার সকল মানুষের সমানভাবে ভোগ করার অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ্‌র এক রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করেছে মানুষেরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য এবং অপরকে শোষণ করার জন্য। এ দুনিয়ার মাটির উপর কোন ভৌগোলিক পার্থক্যের রেখা নেই।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একদিকে যেমন নীতি ভিত্তিক প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি আধ্যাত্মিক নীতি ভিত্তিক সাম্যবাদও সৃষ্টি হতে পারে। ব্যাষ্টির অধিকারের সীমা নির্দেশ করে দিয়ে তাতে আদর্শ প্রজাতন্ত্রেরও সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি এ বিশ্বে বা প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষ অঞ্চলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করা যেতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় এ বিশ্বের তথা রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র।

মনোবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারার আলোর প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি ফ্রয়েড মানুষকে কামসর্বস্ব, ম্যাকডুগাল যুদ্ধ স্পৃহা সর্বস্ব এবং এ্যাডলার মানুষের মধ্যে শক্তিশালী হওয়ার প্রবণতাই দেখতে পেয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের জন্মের বহু পূর্বে এসব প্রবণতা মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করে তাদের যথাযথ প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যৌন স্পৃহাকে তিনি ফ্রয়েডের মতো মানুষের একমাত্র আদি প্রবৃত্তি বলে গণ্য করেননি। তার কার্যকারিতা স্বীকার করে যাতে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং মানব জীবনে কোন বিকৃতি দেখা না দেয়, তার জন্য স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, আন নিকাহু নিছফুম মিনাল ঈমান। অর্থাৎ বিবাহ ঈমানের অর্ধেক। তার মূল অর্থ হচ্ছে বিয়ে না হলে মানুষের ঈমান পূর্ণ হয় না। নানাভাবে যৌন স্পৃহাকে অবদমন করে মানুষের জীবনে যৌন বিকৃতি দেখা দেয়। তাদের পক্ষে সুস্থভাবে প্রকৃত ধার্মিক জনের জীবন যাপন করতে হলে বিবাহের প্রয়োজন রয়েছে। তার এ বাণীতে এ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। তেমনি যুদ্ধ স্পৃহাকেও তিনি অস্বীকার করেননি বরং অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জিহাদ করা যে ব্যাষ্টি বা সমষ্টির পক্ষে কর্তব্য তা কুরআন–উল–করীমের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। তবে সে

www.pathagar.com

শক্তি যাতে বিশ্বের কল্যাণ বা মানবতার কল্যাণে যৌক্তিক হয় তার ব্যবস্থা দিয়েছেন।

তার নিজের জীবনে ছিল সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সকল প্রবৃত্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োগ করার সম্পূর্ণ শক্তি তিনি নিজে ছিলেন ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ। এজন্য তিনি এ দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলার জন্য তার জীবনে ছিল সাধনা। যাতে মানুষের জীবনে কোন এক বৃত্তির সঙ্গে অন্য বৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখা না দেয়, এজন্য তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আজকের দিনে মানুষে মানুষে এতসব দ্বন্দ্ব মারামারি হানাহানির মূলে রয়েছে মানুষের জীবনে তার নিজের পরিচয় লাভের অভাব। মানুষই তার আসল সত্তার পরিচয় পাচ্ছে না বলে কখনও তাকে এভাবে কখনও বা তাকে ওভাবে ধারণা করে তারই সন্তোষ বিধানের জন্য ছুটে চলেছে। তাই বিশ্বের মানুষের জীবনে দেখা দিচ্ছে চরম দুর্দশা। তার নির্দেশ অনুসারে মানুষেরা যদি জীবন পথে অগ্রসর হতো তা হলে সকল দ্বন্দ্বেরই অবসান হত।

প্রমাণপঞ্জি

১. Philosophy of History, Dewan Md. Azraf.

২. Ditto, chapter on Hegel.

৩. Bertrand Russell, Freedom and Organization p. 230.

৪. Harold Lasky, Democracy in Crisis.

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সা) সম্পর্কে আল-কুরআন এবং নিজের সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা)

আহ্মদ আবুল কালাম

আল-কুরআন মানুষের সার্বিক দিক ও বিভাগের সমন্বিত একটা পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন তার বাস্তব নমুনা। সাহাবা-ই-কিরাম (রা) এক সময় হযরত আয়েশা (রা)-র নিকটে রসূল (সা)-এর জীবন-চরিত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হযরত আয়েশা (রা) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন ঃ "তোমরা কি কুরআন পড় না? 'খুলুকুহুল-কুরআন'-আল-কুরআনই তাঁর জীবনচরিত'। বস্তুত রসূল (সা)-এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র,দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বসহ তাঁর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিকের আলোচনা ও ইংগিত কুরআনের পরতে পরতে বিদ্যমান।

আজ থেকে ১৪শ' বছর পূর্বে রসূল (সা-এর আবির্ভাব হয়েছে বলে আমরা জানি। কুরআন বলছে, রসূল (সা)-এর আবির্ভাবের সূত্রপাত ও প্রস্তুতি চলছে হাজার হাজার বছর পূর্বে-অনন্তকাল ধরে। কুরআনের ভাষায় ঃ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন-(হে নবীগণ।) তোমাদের কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবেন তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কী স্বীকার করলে? তারা বললেন, 'আমরা স্বীকার করলাম'। আল্লাহ্ বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।

-আল ইমরান ঃ ৮১

এ আয়াত প্রমাণ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ সকল নবী-রসূলই হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বেশ ভালভাবে জানতেন এবং গায়েবীভাবে কিনা তার উপর ঈমানও

www.pathagar.com

এনেছিলেন। তবে একথা সত্য নবী–রসূলগণদের যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা) এসে গেলে তাঁদের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা)–কে রসূল রূপে বরণ করা অপরিহার্য ছিল। কিয়ামত দিবসে সকল নবী–রসূলদের একত্র সমাবেশ ঘটলে সকল উম্মত ও নবীর জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা)–কে অনন্য রসূল ও সাক্ষী হিসেবে বরণ করার একটা দৃষ্টান্ত স্বয়ং কুরআনেই বিদ্যমান। আল্লাহ্ বলেন ঃ

সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব আর এদের সকলের বিষয়ে তোমাকে সাক্ষীরূপে আনয়ন করব। –সূরা নহল ঃ ৮৯

রূহ্ জগত থেকে হযরত আদম (আ) হিদায়াতের বাণী নিয়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলে পর পর হযরত শীষ (আ), নূহ (আ), সালিহ (আ) ও ইব্রাহীম (আ)–সহ বহু নবী–রসূলের আবির্ভাব ঘটে। জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) এসে আমাদের অভিহিত করেন মুসলিমীন বা আত্মসমর্পণকারী জাতি বলে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে কাবাঘর নির্মাণকালে নির্মাতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) উভয়েই এ বলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছিলেন–

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার সমীপে আত্মসমর্পণকারী এক (মুসলিম) উম্মত করিও। আমাদের ইবাদতের নিয়ম–পদ্ধতি দেখিয়ে দিও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের থেকে তাদের নিকট এক রসূল প্রেরণ করিও যিনি তোমার আয়াতাবলী তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পূতপবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

–সূরা বাকারা ঃ ১২৮, ১২৯

আমাদের মধ্যে বিশ্বনবীকে প্রেরণ করার প্রার্থনা সেদিন শুধু হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)–এর মুখের কথাই ছিল না। তাঁদের হৃদয়নিসৃত এ প্রার্থনা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশ, বাতাস, পৃথিবী ও মাটির ঘোষায় ঘোষায় সারাটা সৃষ্টি জগতে। তাই তো জগত চাতকের ন্যায় তাকিয়ে থাকছিল তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। হযরত ইবরাহীম (আ)–এর পরে আগত নবী–রসূলগণদের মধ্যে হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)–এর নাম বিশেষভাবে

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অনুসারীদের যথাক্রমে য়াহুদী ও খৃস্টান কিংবা তারা তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি কিতাব প্রাপ্ত বলে তাদের আহলে-কিতাবও বলা হয়। তাওরাত-ইঞ্জিলে রসূল (সা)-এর শুভাগমন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছিল। এত সুস্পষ্ট যে, তারা যেন রসূল (সা)-কে আপন সন্তানের মতো পরিচয়-জ্ঞান করতে পারে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (হযরত মুহাম্মদকে) সেরূপ চিনে, যেরূপ চিনে নিজেদের সন্তানদের। অথচ তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে। —সূরা বাকারা ঃ ১৪৬

এমনকি রসূল (সা) যে বায়তুল মুকাদ্দাস ছেড়ে আদি কিবলা মসজিদুল হারামের অভিমুখী হবেন তাও তাদের অজানা ছিল না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন ওদিকে মুখ ফিরাও আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিত জানে যে, তা (মাসজিদুল হারামের দিকে কিবলা পরিবর্তন) তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। —সূরা বাকারা ঃ ১৪৪

তারা আরো জানতো যে, তাওরাত ইঞ্জিলের মতো একটা কিতাব প্রতিশ্রুত রসূলের উপর অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

যাদের কিতাব দিয়েছি তারা জানে এটা (আল-কুরআন) তোমার প্রতি-পালকের নিকট থেকে সত্যসহ আগত। —সূরা আন'আম ঃ ১১৪

শেষ নবীর আগমন সম্বন্ধে তারা তওরাত ও ইঞ্জিলের মাধ্যমে এতকিছু জানত বলেই তাঁকে নিয়ে তাঁরা খুব গর্ব করত। এমনকি কখনও তারা মুশরিক ও কাফিরদের নিকট পরাজিত হলে শেষনবীর ওসীলায় সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্র নিকট থেকে তার সমর্থক কিতাব এলো। যদিও পূর্বে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করতো। তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিলো যখন এ জ্ঞাতব্য বিষয় তাদের নিকট এল তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। —সূরা বাকারা ঃ ৮৯

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর জন্মের প্রায় ছয় শত বছর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের নিকট তাঁর শুভাগমনের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে গেছেন। এমন কি তিনি তাঁর মুবারক নামেরও উল্লেখ করেছেন। কালাম মজীদে উল্লেখ হয়েছে ঃ

স্মরণ কর মরিয়ম–তনয় ঈসা (আ) বলেছিলেন–হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমার নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রসূল আসবেন আমি তাঁর সংবাদদাতা। –সূরা সফ্‌ফ ঃ ৬

এ আয়াতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে হযরত ঈসা (আ)–র রিসালতী দায়িত্ব পালনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিলো বনী ইসরাঈলের নিকট তওরাত–ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুত রসূলের আগমনী সংবাদ প্রদান।

হযরত ঈসা (আ)–র এ সুসংবাদের পরে কেটে যায় অনেক বছর–যুগের পর যুগ। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জুড়ে নেমে আসে বর্বরতা ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকার। কুরআনে এ যুগকে বলা হয়েছে জাহিলিয়ত বা অন্ধকার যুগ। ইরশাদ হয়েছে ঃ

তবে কি তারা জাহিলিয়ত যুগের বিধিবিধান কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? –সূরা মায়িদা ঃ ৫০

এ সময় নিপীড়িত মানবতার সঙ্গে সৃষ্টিজগত হাহাকার করে ওঠে–প্রতিশ্রুত রসূলের আর কত দেরী! পাশাপাশি সত্য–ন্যায়ের শেষ অবলম্বন কা'বা গৃহের নাম–নিশানা মুছে দেয়ার জন্য দম্ভভরে এগিয়ে আসে আবরাহা ও তার বিশাল হস্তিবাহিনী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তুমি কি লক্ষ্য করনি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের (কা'বা ধ্বংসের) কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তো তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী–যারা তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদের (ধ্বংস করে) ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন। –সূরা ফীল

আল্লাহ্‌র ঘর স্বয়ং আল্লাহ্‌কে রক্ষা করতে দেখে সৃষ্টিজগত প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। আসলে আল্লাহ্ চান মনের কা'বাকে আল্লাহ্ অভিমুখী করতে, সত্য ও ন্যায়ের আলো দিয়ে অসত্য ও অন্যায়ের অপসারণ ঘটাতে। আর সে জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজন শুধু কা'বা রক্ষা নয়, এমন কাউকে প্রেরণ করা, "যিনি মানুষের নিকট আল্লাহ্র আয়াতাবলী আবৃত্তি করবে, তাদের পূতপবিত্র করবে, কিতাব ও হিকমত দিবে এবং এমন কিছু শিক্ষা দিবে যা তারা জানে ন।" আর একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তিনি এই একই বছরে অর্থাৎ হস্তিবছরে প্রেরণ করেন যুগ যুগ ধরে বহু প্রতীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত রসূল বিশ্বনবী হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে।

রসূল (সা) জন্মগ্রহণ করলে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আল-কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় এ নামের উল্লেখ আছে। 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল' -(সূরা ফাতহ ঃ ২৯)। আর হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ হিসেবে মাতা আমিনার স্বতঃস্ফূর্ত মনে যে নামটি দাগ কাটে তা হলো আহমদ। (দ্র. সূরা সাফ্ফ ঃ ৬)

রসূল (সা)-এর জন্মের পূর্বে পিতা এবং জন্মের পরে মাতা ইন্তিকাল করলে তিনি য়াতিম হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তিনি কি তোমাকে য়াতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। —সূরা দোহা ঃ ৬

প্রথমত দাদা আবদুল মুত্তালিব ও পরবর্তীতে চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা রসূল (সা)-এর আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করেন। কিশোর বয়সে রসূল (সা) কুরায়শদের সঙ্গে 'ফুজ্জার' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে চলমান জাহিলিয়তের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। সমাজ থেকে অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ উৎখাত করার জন্য তিনি প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন তাঁর নেতৃত্বে হিলফুল ফুযূল গঠনের মধ্য দিয়ে তাঁর এ বিষণ্নতা ও বিমূঢ়তার অবসান ঘটান এবং অবিচলিতভাবে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথনির্দেশ দান করেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

তিনি তোমাকে পেয়েছেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অতঃপর তিনি পথনির্দেশ করেন। —সূরা দোহা ঃ ৭

প্রিয়নবী (সা) নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় লালিত-পালিত হন। আল্লাহ্র রহমতে তিনি হযরত খাদীজা (রা)-র বাণিজ্যের দায়িত্বভার লাভ করেন। ২৫

www.pathagar.com

বছর বয়সে আল্লাহ্‌র রহমতে হযরত খাদীজা (রা)–র সংগে তাঁর শাদী মুবারক সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ ইরশাদ করেন ঃ

তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত করেন। –সূরা দোহা ঃ ৮

শৈশবকাল থেকেই মক্কাবাসীরা রসূল (সা)–এর ক্রিয়াকলাপ ও বিভিন্ন আচরণ লক্ষ্য করে আসছে। তারা দেখল তাঁর কাজ–কর্মে কিংবা কথা–বার্তায় মিথ্যা বা প্রতারণার লেশমাত্র নেই। ফলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে আল্–আমীন বা বিশ্বাসভাজন উপাধিতে ভূষিত করে। যদিও তারা পরবর্তীতে তাঁর আনীত বিধানকে অস্বীকার করেছিলো কিন্তু তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেনি। আল্লাহ্ বলেন ঃ

আমি অবশ্যই জানি তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিত কষ্ট দেয় কিন্তু তারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে। –সূরা আন'আম ঃ ৩৩

রসূল (সা) যে আল্–আমীন ছিলেন কুরআনে এর প্রমাণের কোন অভাব নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তুমি তো শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। –সূরা কলম ঃ ৪

নবী–রসূলগণ চিরনিষ্কলুষ ও মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। সামগ্রিক জীবনে সততা ও সত্যনিষ্ঠাই তাঁদের প্রধান অবলম্বন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ। –সূরা আহযাব ঃ ২১

প্রিয় নবী (সা) শাদীর পর থেকে অধিকাংশ সময় দুর্গম হেরা গুহায় যেয়ে, মুরাকাবা মুশাহাদায় আত্মনিয়োগ করেন। ৪০ বছর বয়সে লাভ করেন প্রথম ওহী। এ সময় আল্লাহ্ লওহ্ মাহ্ফুজ থেকে প্রথম আসমানে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'আমি তা (আল–কুরআন) অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল কদরে'। –সূরা কদর ঃ ১

আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী। –সূরা দুখান ঃ ৩

www.pathagar.com

লায়লাতুল কদর রমযান মাসে অন্তর্ভুক্ত বলেই আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

রমযান মাস–এ মাসে মানুষের দিশারী সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে আল–কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

–সূরা বাকারা ঃ ১৮৫

ঐতিহাসিকদের মতে ৬১০ খৃষ্টাব্দে এ রমযান মাসেই হেরা গুহায় আল্লাহ্র ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) মারফত রসূল (সা) এ বলে প্রত্যাদেশিত হন–

(হে মুহাম্মদ) পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পাঠ কর আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। –সূরা আলাক ঃ ১–৫

প্রথম ওহী নাযিল হলে রসূল (সা) স্বাভাবিকভাবেই এ অভিনব অভিজ্ঞতায় কিছুটা শংকিত হয়ে পড়েন। বাড়ি এসে হযরত খাদীজা (রা)–র নিকট 'যামমিলূনী–আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর' বলে অস্থিরতা প্রকাশ করলে কিছুদিন পরে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ঃ

হে বস্ত্রাবৃত মুহাম্মদ (সা)! কিছু অংশ বাদে রাত্রি জাগরণ কর। অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে। আমি সত্বরই তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী (রিসালতের বাস্তব দায়িত্ব)।– –সূরা মুয্যামিল ঃ ১–৫

রসূল (সা) এ নির্দেশগুলো তিলে তিলে পালন করতে লাগলেন।রিসালতের বাস্তব দায়িত্ববোধ তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। আর তাই বস্ত্রাচ্ছাদন তার জন্য যেন সহজাত হয়ে উঠল। আল্লাহ্ এবার বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে নিভৃতে দাওয়াত–ই–দীনের জন্য তাঁর রসূল (সা)–কে উদ্বুদ্ধ করলেন–

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (মুহম্মদ)! ওঠ। সতর্ক বাণী প্রচার কর। এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (বিশ্বাসগত) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ কর। –সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ১–৭

একই সঙ্গে আল্লাহ্ মক্কার বিদ্রোহীদের মধ্যে দাওয়াত দেয়ার প্রাথমিক পথ ও পন্থাও বাতলিয়ে দিলেন–

www.pathagar.com

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে। সুতরাং ধৈর্যের সঙ্গে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর। এবং তাদের মধ্যে যে কাফির অথবা পাপিষ্ঠ তার আনুগত্য করিও না। বরং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়। রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। —সূরা দাহর ঃ ২৩–২৬

রসূল (সা) এ আয়াত অবলম্বনে দাওয়াত ও কঠোর সাধনায় লিপ্ত থাকেন। নবুয়তের প্রথম তিন বছরে বেশ কিছু লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), হযরত 'আবূ বকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), তালহা (রা) ও হযরত জায়েদ বিন হারিস (রা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত জায়েদ (রা) রসূল (সা)–এর নিকট অবস্থানকালে তার পিতামাতা তাঁকে নিতে এলে জায়েদ (রা) রসূল (সা)–কে পিতারূপে বরণ করেন। এতে অবিশ্বাসীরা জায়েদ বিন মুহম্মদ (–মুহাম্মদের ছেলে জায়েদ) বলে বিদ্রূপ করলে আল্লাহ্ বলেন ঃ

তোমরা তাদেরকে তাঁদের পিতৃ–পরিচয়ে ডাক। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা অধিক ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ–পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু।..... নবী করীম (সা) মু'মিনদের নিকট নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। তার স্ত্রীগণ মু'মিনদের মাতা। —সূরা আহযাব ঃ ৫

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করার পর নির্দেশ আসে– 'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর'। —সূরা হিজর ঃ ৯৪

আর এ পর্যায়ে প্রথমত স্বীয় গোত্র ও নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করতে বলা হলোঃ

(হে মুহম্মদ)! তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।...... তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তুমি বলিও–তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।

—সূরা শুআরা ঃ ২১৪–২১৫

প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ পেয়ে রসূল (সা) একদা সাফা পর্বতে আরোহণ করে তাঁর গোত্র ও নিকটাত্মীয়দের নিকট ইসলামের কথা বললে আবূ লাহাব

www.pathagar.com

দম্ভভরে বলল ঃ 'তাব্বান লাক- মুহম্মদ তোমার ধ্বংস হোক।' প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ

ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের উভয় হস্ত ; ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে। এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে-তার গলদেশে পাকানো রজ্জু।
–সূরা লাহাব

এরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অত্যাচার ভোগের মধ্য দিয়ে নবুয়তের চতুর্থ বছরের সমাপ্তি ঘটে। পঞ্চম বছরে কাফিরদের প্রবল দাবির মুখে রসূল (সা) তাদের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। কুরআনের ভাষায় ঃ

কিয়ামত আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, তারা কোন নিদর্শন দেখলেও মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে এ তো চিরাচরিত যাদু। –সূরা কামার ঃ ১–২

এক সময় রসূল (সা) নামাযরত থাকলে আবূ জেহেল বিদ্রূপাচরণ করে বলল, 'আমি কি তোমাকে নামায পড়তে নিষেধ করিনি।' সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ বললেন ঃ

তুমি কি তাকে লক্ষ্য করছ যে বাঁধা দেয় এক বান্দাকে (মুহম্মদকে) যখন সে সালাত আদায় করে। –৯৫ ঃ ৯, ১০

রসূল (সা)–সহ তখন বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে, কোন না কোনভাবে কাফিরদের দ্বারা অত্যাচারিত হননি। ফলে রসূল (সা)–এর নির্দেশে প্রায় শ খানেক সাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কুরায়শগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আবিসিনিয়ায় রাজা নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হয় এবং সাহাবীদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে বলে। কিন্তু নাজ্জাশী মুসলমানদের মুখে কুরআন ও রসূল (সা)–এর কথা শুনে বিমুগ্ধ হন। কুরআনের ভাষায় ঃ

এবং যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরকে তুমি মু'মিনদের নিকটতম বন্ধুরূপে দেখবে–কারণ, তাদের মধ্যে (নাজ্জাশীর মতো) অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে আর তারা অহংকারও করে না। যখন তারা রসূলের প্রতি অবতারিত বিষয় শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের

www.pathagar.com

প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদিগের অন্তর্ভুক্ত কর। –সূরা মায়িদা ঃ ৮২, ৮৩

নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল (সা)–কে হত্যা করার জন্য হযরত উমর রওয়ানা করলে পথিমধ্যে হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের মুখে শুনতে পান–

আসমান যমীন ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। তুমি উচ্চকন্ঠে যা–ই বল তিনি তো গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন, (তিনি তো) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। –সূরা তাহা ঃ ৬–৮

অমনি তাঁর অভ্যন্তরীণ জগতে বিরাট এক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং রসূল (সা)–এর হাতে বয়'আত গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে কাফিররা তেলে– বেগুনে জ্বলে উঠে। ফলে তারা নবুয়তের সপ্তম বছরে হযরত (সা) ও তাঁর অনুসারিগণের সমাজ থেকে বয়কট করে। মু'মিনদের জন্য এটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তাদের পূর্বদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। –সূরা আনকাবূত ঃ ২–৩

তখন রসূল (সা) ও তাঁর সাহাবা–ই কিরাম শিয়াবই আবী তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাফিররা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খুব প্রকটভাবে অত্যাচার করার। আল্লাহ্ বলেন ঃ

যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! –সূরা আনকাবূত ঃ ৪

দীর্ঘ তিন বছর যাবত শিয়াবই আবী তালিবে অবরোধ জীবন–যাপনের পর নবুয়তের দশম বছরে তিনি মুক্তি পান। আল্লাহ্ বলেন ঃ

যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই দুর্বলতম। যদি তারা জানত। –সূরা আনকাবূত ঃ ৪১

www.pathagar.com

এদিকে চাচা আবূ তালিব ও স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল হলে রসূল (সা) হিজরতের পূর্বাভাস পান।

হে আমার বান্দাগণ-তোমরা যারা ঈমান এনেছ। আমার পৃথিবী তো প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। -২৯ ঃ ৫৬

কাফিরদের অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে রসূল (সা) তায়েফে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পথে নাখলায় একদল জিন রসূল (সা)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কুরআনের ভাষায়ঃ

স্মরণ কর আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনতেছিল। যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো তারা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট চলে গেল সতর্ককারী রূপে।

-সূরা আহকাফ ঃ ২৯

নবূয়তের একাদশ বছরে রসূল (সা) ইসরা ও মিরাজ সম্পন্ন করেন।

কুরআনের ভাষায় ঃ

পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়-যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। -সূরা ইসরাঈল ঃ ১

তিনি যা দেখছেন তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি (মুহম্মদ) তাকে (জিবরাঈলকে) আরেকবার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহা বা প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্দারা আচ্ছাদিত ছিল। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। -সূরা নাজম ঃ ১২-১৮

রসূল (সা)-এর মিরাজ আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ্ এর দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.pathagar.com

আমি যে দৃশ্য তোমাকে (মিরাজ-রাজনীতে) দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। —বনী-ইসরাঈল ঃ ৬০

এ মিরাজ-রজনীতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অপরিহার্য করে দেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

আর সালাত কায়েম কর সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত (অর্থাৎ জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা)। আর কায়েম কর ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। —১৭ ঃ ৭৮

নবুয়তের একাদশ ও দ্বাদশ বছরে মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ আরম্ভ হয়। দুতিন দফায় প্রায় শ খানেক মদীনার লোক এলে এবং আকাবায় পর পর দুটি অঙ্গীকার গৃহীত হলে রসূল (সা) তাঁর অনুসারীদের হিজরতের জন্য মদীনাকে নির্বাচন করেন। এ সময় মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করতে শুরু করেন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদের দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায়! যদি তারা জানত।

কাফিররা মুসলমানদেরকে হিজরত করতে এবং ইসলামের শক্তি বাড়তে দেখে মুহম্মদ (সা)-এর উপর আরো চড়াও হলো। তারা 'দারুন-নাদওয়ায়' সম্মিলিতভাবে রসূল (সা)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কুরআনের ভাষায়ঃ

স্মরণ কর, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে, বা তোমাকে হত্যা করবে বা তোমাকে নির্বাসিত করবে। এবং তারা ষড়যন্ত্র করে। এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। —সূরা আনফাল ঃ ৩০

আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রসূলকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবিহিত করেন এবং হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। আরো নির্দেশ দেন এ দু'আ পাঠ করার-হে আমার প্রতিপালক আমাকে কল্যাণের সঙ্গে প্রবেশ করাও আর

www.pathagar.com

কল্যাণের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত করাও আর তোমার নিকট থেকে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি। –১৭ ঃ ৮০

রসূল (সা) এ দু'আ পড়তে থাকলেও প্রিয়–জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে যেতে যেন তার মন চাচ্ছে না। তাই আল্লাহ্ বলছেন ঃ সৌজন্য সহকারে তাদের পরিত্যাগ কর। –৭৩ ঃ ১০

নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে ৬২২ খৃস্টাব্দে হযরত আলী (রা)–কে স্বীয় বিছানায় রেখে রসূল (সা) হযরত আবূ বকর (রা)–কে নিয়ে মদীনার পথে রওনা করেন। পথিমধ্যে রসূল (সা) ও আবূ বকর (রা) উভয়ই সওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। এবং তিনি ছিলেন দুজনের একজন যখন তারা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিল। তিনি তখন তার সংগী (হযরত আবূ বকর)–কে বলেছিলেন,'বিষণ্ণ হইও না' আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। –৯ ঃ ৪০

রসূল (সা) মদীনায় এসে পৌছলে মদীনাবাসী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তবুও রসূল (সা)–কে স্বদেশ প্রীতি যেন বারবার বেদনাহত করছে। আল্লাহ্ বলছেন ঃ যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন, তিনি (আল্লাহ্) তোমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন স্থানে (অর্থাৎ মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন।' –২৮ ঃ ৮৫

রসূল (সা)–এর হিজরতের স্মৃতি স্বরূপ হিজরী সালের প্রবর্তন করা হয়। প্রথম হিজরীতে মদীনার সনদ ও আযানের প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময় বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বায়তুল্লাহ্র দিকে রসূল (সা)–এর কিবলা পরিবর্তন হয়। কুরআনের ভাষায় ঃ আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি (বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে) মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। –২ ঃ ১৪৪

www.pathagar.com

যাকাত ও সিয়ামও এ সময় মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য পালনীয় রূপে বিধিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

তোমাদের জন্য যে এ মাস (রমযান) পায় সে যেন সিয়াম পালন করে। এবং কেহ্ পীড়িত কিংবা প্রবাসে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে।

–২ ঃ ১৮৫

মক্কায় ১৩ বছর মু'মিনদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাদের প্রতিরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। হিজরতের পরে মু'মিনদের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। কুরআনের ভাষায় ঃ

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো–তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। –২২ ঃ ৩৯।

এরপর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য যুদ্ধ ফরয করেছেন।

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর কিন্তু সীমালংঘন করো না। সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

–২ ঃ ১৯০

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমজান কাফিরদের সঙ্গে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরআনের ভাষায় ঃ

স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। অথচ তোমরা চেয়েছিলে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যে, তিনি সত্যকে তার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন। –৮ ঃ ৭

এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। –৩ ঃ ১২৩

তৃতীয় হিজরীতে মুসলমানগণ ওহুদের জন্য বেরোলে পথিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাই সদলে পশ্চাদ্ধাবন করলে আনসারদের দুই শাখা গোত্র বনূ হারিসা ও বনূ সালমার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় । কুরআনের ভাষায় ঃ

www.pathagar.com

যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন—আল্লাহ্র প্রতি যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে।

—৩ ঃ ১২২

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের কারণ আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় ঃ

আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন। যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদের বিনাশ করতেছিলে । যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং (পর্বতের নিকট দাঁড়িয়ে থাকার) নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদের দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে।—৩ ঃ ১৫২

পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফল হয়েছিল এরূপ—

আল্লাহ্ কাফিরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট । আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদের (কাফিরদের) সাহায্য করেছিল তাদের দুর্গ থেকে অবতরণের জন্য বাধ্য করলেন । এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ আর কতককে করছ বন্দী ।

—৩৩ ঃ ২৫, ২৬

৬ষ্ঠ হিজরীতে হজ্জের উদ্দেশ্যে হযরত (সা) চৌদ্দশত সাহাবা নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন । হযরত উসমান (রা) কুরায়শদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে গুজন উঠে কুরায়শরা উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। অমনি সকল সাহাবা রসূলের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

—৪৮ ঃ ১৮

আয়াতে আসন্ন বিজয় বলতে খায়বর বিজয়কে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত হুদায়বিয়ার সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানের জন্য অবমাননাকর হলেও সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

বিজয়। যেহেতু এ সন্ধিই মক্কা বিজয়সহ ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়। কুরআনের ভাষায় :

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছিলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় (অর্থাৎ খায়বর বিজয়)।

৪৮ : ২৭

মক্কা বিজয়ের পর মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কুরআনের ভাষায় :

যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করিও। তিনি তো তওবা কবুলকারী। —সূরা নাসর

ইসলামের এ বিজয়ের ফলে আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর দুনিয়ায় অবস্থানের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। এতে বিশিষ্ট সাহাবীগণ রসূল (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী বলে বুঝতে পারেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ১২ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল রসূল (সা) ইহধাম ত্যাগ করেন। ফলে হযরত উমর (রা)-সহ জনসাধারণের মধ্যে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় হযরত আবূ বকর (রা)-এর পঠিত আয়াতে তার অবসান ঘটে। তিনি ঘোষণা করেন :

মুহম্মদ একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে কখনও সে আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন। আল-ইমরান : ১১৪

নিজের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল করীমের মূর্ত প্রতীক। কুরআন মজীদের বাস্তব বিশ্লেষণ তাঁর মতাদর্শ ও জীবন-চরিত। বস্তুত

www.pathagar.com

সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুটিত করে তোলার জন্যই কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয় একজন রসূলের প্রতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও। —সূরা নাহল ঃ ৪৪

আমরা রসূলে করীম (সা)-এর জীবন ও আদর্শ তুলে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষীর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করি, কখনও বা বিবেক-বুদ্ধির আশ্রয়ে তাঁকে গবেষণা করি। কিংবা প্রচলিত ইতিহাস দিয়ে তাঁকে পরিমাপ করি। মূলত রসূলে করীম (সা)-কে মূল্যায়ন করতে হলে, তাঁর যথার্থ পরিচয় জানতে হলে কুরআনের পরে তাঁর পবিত্র মুখের বাণীই হবে প্রধান অবলম্বন। আল্লাহ্ বলেন ঃ তিনি (নিজের পক্ষ থেকে) মনগড়া কথা বলেন না, তাঁর কথা তো ওহী-যা তার প্রতি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) প্রত্যাদেশিত হয়। —সূরা নাজম ঃ ৩-৪

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেন?' রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন।' —মাওয়া হিবুল লাদ্দুনিয়া, ১ম খন্ড

কুরআন মজীদেও প্রিয়নবী (সা)-কে নূর বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা মায়িদার ১৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কাছ থেকে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি রসূলগণের ভূমিকা, আমি নবীদের উপসংহার- এতে আমার কোন গর্ব নেই।' (বর্ণনায় হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্)।

—মিসকাত শরীফ

এর দ্বারা বোঝা যায়, প্রিয় নবী (সা) সকল নবী-রসূলের প্রথম ও শেষ তথা আদি ও অন্ত আর আদি ও অন্তের মধ্যে পূর্ণতার একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকে। সূরা আল-ইমরানের ৮১ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানব আসার বহু পূর্বে আল্লাহ্ সকল নবী-রসূলকে একত্র করে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, তাদের মাঝে প্রিয়নবী (সা) এলে তাঁরা যেনো তাঁকে বিশ্বাস করে, তাঁকে সাহায্য করে। উক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'স্মরণ কর,

www.pathagar.com

যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি তা স্বীকার করলে ? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বললো ঃ 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন ঃ 'তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সংগে সাক্ষী থাকলাম।'–সূরা আল–ইমরান ঃ ৮১

হাদীসে এভাবে ফুটে ওঠেছে 'আমি তো আল্লাহ্র নিকটে সেই সময় থেকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ–যখন আদম (আ) (মানুষ) ছিলেন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আবৃত (দ্র. হযরত ইরবাস বিন সারীয়াহ বর্ণিত ঃ মুসনাদে আহমদ, শরহি–সুন্নাহ)। 'আদম (আ) যখন পানি ও মাটির মধ্যে বিলীন ছিলেন–তখনও আমি নবী ছিলাম।' আমার নবুয়ত বিধিবদ্ধ হয় আদম (আ)–এর শরীর ও প্রাণের মধ্যে বিভক্ত থাকাকালেই [হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–এর প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত] –তিরমিযী শরীফ

রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ 'আমি আদম সন্তানদের উত্তম যুগগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রেরিত হতে থাকি। অবশেষে সেই যুগে এসেই আমার আবির্ভাব ঘটে, যে যুগে আমি বর্তমান আছি [বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)]।

–বুখারী শরীফ

রসূলুল্লাহ্ (সা)–এর পিতামহ প্রপিতামহ থেকে শুরু করে হযরত ইসমাঈল (আ) তথা হযরত আদম (আ) পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন সবাই নিজ নিজ যুগে সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন –তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই হীন বা অকুলীন ছিলেন না । নবী করীম (সা) আরো বলেন, আমি সত্বরই তোমাদের অবহিত করছি আমার নবুয়তের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে । আর তা হলো হযরত ইবরাহীম (আ)–এর দু'আ, হযরত ঈসা (আ)–এর সুসংবাদ এবং আমাকে প্রসবকালে আমার মায়ের স্বপ্ন । আমার জন্মের প্রাক্কালে এমন একটা নূর (জ্যোতি) বিচ্ছুরিত হলো, যা সিরিয়া দেশের প্রাসাদগুলো আলোকিত করে তুলেছিল।' (দ্র. হযরত ইরবাস বিন সারীয়াহ থেকে বর্ণিত) –মুসনাদে আহমদ, শরহে–সুন্নাহ্

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আ)–এর দু'আ ছিল এরূপ ঃ 'হে আমাদের রব! তাদের থেকে তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করিও যিনি তোমার আয়াতাবলী তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব (বিধান) ও হিকমত (কৌশল) শিক্ষা দিবে এবং তাদের পূতপবিত্র করবে।' (সূরা বাকারা ঃ ১২৯) আর হযরত ঈসা (আ)–এর সুসংবাদ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ স্মরণ কর মরিয়ম–তনয় ঈসা বলেছিলেন, 'হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তাওরাত বিদ্যমান আমি তার সমার্থক। আর আমার পরে আহমদ (মুহাম্মদ) নামে যে রসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।' –সূরা সাফফ ঃ ৬

রসূলে করীম (সা)–এর প্রসবকাল আসন্ন হলে তাঁর মাতা আমীনা যে স্বপ্ন দেখেন সে প্রসঙ্গে বলা হয় একজন আগন্তুক এসে আমীনাকে বললো, 'তুমি কি জান মানব জাতির নেতাকে তুমি ধারণ করে আছ?'

প্রিয়নবী (সা) বংশগত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)–এর সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ইসমাঈল (আ)–কে মনোনীত করেন এবং ইসমাঈল (আ)–এর সন্তানদের মধ্য থেকে বনী কিনানাকে মনোনীত করেন আর কিনানার সন্তানদের থেকে তিনি মনোনীত করেন (নদর বংশধর) কুরায়শদের । আর কুরায়শদের থেকে মনোনীত করেন বনী হাশিমকে । আর বনী হাশিম থেকে তিনি মনোনীত করেন আমাকে (ওয়াসিলা বিন আসকা থেকে বর্ণিত।) –মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ

হযরত আব্বাস (রা) একবার রসূলে করীম (সা)–এর নিকট উপনীত হলে রসূল (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ বলত আমি কে? উপস্থিত সবাই বলল ঃ আপনি তো আল্লাহ্র রসূল! তখন রসূল (সা) স্বয়ং বললেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। আল্লাহ্ সৃষ্টি জগত (মানুষ ও জ্বিন) সৃষ্টি করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠদের (মানুষের) অন্তর্গত করলেন। তাদের (মানুষদের) আবার দু'শ্রেণীতে (আরব, অনারব) বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠদের (আরবদের) অন্তর্গত করলেন। তাদের আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠ গোত্রে (কুরায়শদের) অন্তর্গত

www.pathagar.com

করলেন। অনন্তর তাদের (কুরায়শদের) বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের সেরা পরিবারের অন্তর্গত করলেন । সুতরাং আমি আভিজাত্য ও বংশগত কৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ। কিতাবুল মানাকিব, তিরমিযী শরীফ

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে আপনি নিশ্চিতভাবে জানলেন যে, আপনি একজন নবী? তখন রসূলে করীম (সা) বললেন, হে আবূ যর! (আমি নবুয়তের ব্যাপারে অবগত হই এভাবে) মক্কার কোন কংকরময় স্থানে অবস্থানকালে আমার নিকট দুজন ফিরিশতা এল। তাদের একজন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করল এবং অপরজন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে স্থির হলো। তারা একে অপরকে বলল ঃ ইনি কি সেই (প্রতিশ্রুত নবী)? অপরজন বলল ঃ অবশ্যই, আলবৎ। তাদের একজন বলল ঃ তো তাঁকে [মুহম্মদ (সা)-কে] আরেকজন লোকের সঙ্গে তুলনা কর। আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলাম। অতঃপর সে (ফিরিশতা) বললঃ তাকে [মুহম্মদ (সা)-কে] দশজনের সঙ্গে তুলনা কর। আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলাম। পরে সে (ফিরিশতা) বলল ঃ তাঁকে [মুহম্মদ (সা] এক শজনের সঙ্গে তুলনা কর। আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করলাম। পরে সে (ফিরিশতা) বলল ঃ তাঁকে [মুহম্মদ (সা]-কে সহস্রজনের সঙ্গে তুলনা কর। আমাকে তুলনা করা হলো। আমি তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করলাম। তখন আমি যেন দেখছি তারা (সহস্রজন) সম্মিলিতভাবে আমার থেকে হীনতার পরিচয় দেয়ায় হতভম্ব হয়ে পড়ে। এতে সে ফিরিশতা তার সাথীকে বলল ঃ যদি তাঁকে [মুহম্মদ (সা)-কে] তাঁর সমগ্র উম্মতের সঙ্গেও তুলনা করা হয় তবুও তিনি তাদের সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করবেন। -দায়ামী, মিশকাত শরীফ

এ আলোচ্যমান ঘটনাটা রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহনকারী অসংখ্য ঘটনা ও নিদর্শনাবলী থেকে একটা ঘটনা বৈ আর কিছুই নয়। রসূলে করীম (সা) যে একজন নবী তা তিনি বিভিন্নভাবে অবগত হলেও তাঁর উপর প্রত্যাশিত (আল্লাহ্‌র) ওহী তাঁকি চূড়ান্ত নিশ্চয়তার উপনীত করে ।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র রসূল । আল্লাহ্‌ আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন [বর্ণনায় হযরত আলী (রা)]।

–তিরমিযী, ইবনু মাজাহ শরীফ

'আমি তোমাদের জন্য পরবর্তী কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ককারী (দ্র. হযরত ইবনুল আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁর দাস। [হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ মুসলিম শরীফ]। আমি জ্ঞান–বিজ্ঞান বিতরণ করি আর আল্লাহ্‌ তাঁর যোগান দেন। (হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক বিবৃত ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]। আমি ও আমার সঙ্গীগণ যে পথে আছি তা–ই হচ্ছে সিরাতুল মুসতাকীম–যথার্থ অনুসৃত সরল পথ । –[হযরত ইবনুল মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ মিশকাত শরীফ] 'আল্লাহ্‌র কসম! জেনে নাও! আমি অনেক বিষয় তোমাদের আদেশ প্রদান করি অনেক বিষয় তোমাদের নিষেধ করি, অনেক বিষয় তোমাদের উপদেশ প্রদান করি। বিস্তুত এগুলো কুরআনেরই অনুরূপ (অপরিহার্য) (ইয়যায বিন সারীয়াহ কর্তৃক বর্ণিত ঃ আবূ দাউদ শরীফ)। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এই মানবজাতির মধ্যে য়াহূদী, খৃস্টান কিংবা যে কেউ যদি আমার কথা পালন না করে এবং আমি যে রিসালত নিয়ে এসেছি তার প্রতি বিশ্বাস না করে মৃত্যুবরণ করে তবে সে তো হবে অগ্নিবাসী।'

–আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত মিশকাত শরীফ

'আল্লাহ্‌ আমাকে (নবীরূপে) প্রেরণ করেছেন উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তে [হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রা) কর্তৃক বর্ণিতঃ শরহি সুন্নাহ]। আমি জ্ঞান প্রজ্ঞার বাড়ি আর আলী (রা) তার দ্বার স্বরূপ [দ্র. হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিতঃ তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ)। বস্তুত হযরত আলী (রা)–র মতো প্রত্যেক সাহাবীই রসূলে করীম (সা)–র জ্ঞান প্রজ্ঞার দ্বারস্বরূপ। রসূল (সা) স্পষ্টই বলেছেনঃ 'আমার সাহাবী বা সঙ্গীগণ নক্ষত্র সদৃশ তোমরা যার অনুসরণ করবে–হিদায়াত লাভ করবে। –মিরকাত ঃ মুল্লা আলী কারী

সৃষ্টি জগতে রসূলে করীম (সা)–এর অবস্থান ও তাঁর মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ 'আমি বিশ্ব জগতের নেতা।' –বায়হাকী শরীফ

www.pathagar.com

'আল্লাহ্ তো আমাকে সকল নবী রসূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আর আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সকল উম্মতের উপর।' – তিরমিযী শরীফ

'আমি আদম সন্তানের (মানুষের) নেতা।' আমি আল্লাহ্র নিকটে বনী আদমের (মানুষের) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (হযরত আনাস থেকে বর্ণিত ঃ তিরমিযী শরীফ, দায়ামী।) রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই অতুলনীয় মর্যাদার কারণ প্রসঙ্গে স্বয়ং তিনি বলেন ঃ 'আমাকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। ১. আমাকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে–এক মাস দূরের শত্রুও আমার বিরাট ব্যক্তিত্বে ভয় পায়। ২. আমার জন্য সমগ্র পৃথিবী মসজিদ (নামায স্থান)–ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে কোন স্থানে সালাতের (নামাযের) সময় হলে আমার উম্মত সালাত আদায় করতে পারে। ৩. আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করে দেওয়া হয়েছে–আমার পূর্বে তা কারও জন্য হালাল ছিল না। ৪. আমাকে ব্যাপকভিত্তিক শাফ্‌যাতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ৫. (পূর্বেকার) নবী–রসূলরা বিশেষভাবে স্বজাতির নিকট প্রেরিত হয় অথচ আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানুষের নিকট। (দ্রঃ হযরত জাবির বিন আব্দুলাহ্ কর্তৃক বর্ণিত ঃ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)। আমাকে ছ'টি বিষয়ের দ্বারা নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে ঃ ১. আমাকে জ্ঞানগর্ভ ও সারসংক্ষেপ কথা বলার যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, ২. আমার দ্বারা নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে (বাকি চারটা উপরিউক্ত হাদীসে বিবৃত)'।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ মুসলিম শরীফ প্রিয়নবী (সা) তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম যোগ্যতা ও অতুলনীয় মর্যাদার উল্লেখ করে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার মতো ? আমি নিশি যাপন করি আর আল্লাহ্ আমাকে পানাহার করান' [দ্র. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ]। প্রিয়নবী (সা) লোকদের সাওমে বিসাল (ইফতার বিহীন অবিরাম রোযা) পালন করতে নিষেধ করলেন অথচ স্বয়ং নিজে সাওমে বিসাল পালন করলে তার কারণ হিসেবে উপরোক্ত আভাস দেন। ইবন কাইয়ুম বলেছেনঃ আলোচ্যমান হাদীসটির মর্ম হলো, আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবীকে

www.pathagar.com

তাঁর মহত্ত্বের ধ্যানে তাঁর নূরের প্রত্যাক্ষায়ণে তাঁর উপলব্ধির অধ্যবসায় এবং তাঁর সঙ্গে নির্জন সাক্ষাতকারের গভীরতায় মত্ত রেখে পানাহারের মতো তুচ্ছ ব্যাপার থেকে তাঁকে নিবৃত্ত রাখেন, আধ্যাত্মিক আহার কখনও শারীরিক আহার থেকে শক্তিশালী ও সুস্বাদু হয়ে থাকে (দ্র. আহনী)। তাই রসূল (সা) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের মতো সাধারণ প্রকৃতির নই।–হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

আখিরাতে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব ও 'কৃতিত্ব প্রসঙ্গে প্রিয় নবী (সা) জানান, 'আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের (মানুষের) নেতা। কবর থেকে যাদের পুনরুত্থিত করা হবে আমি তাদের প্রথম। আমিই প্রথম শাফা'আতকারী। আমিই প্রথম ব্যক্তি যার শাফা'আত কবূল করা হবে [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ মুসলিম শরীফ]। 'যাদেরকে যমীন থেকে পুনরুত্থিত করে জান্নাতের অলংকার পরিধান করানো হবে, আমি তাদের প্রথম। আমি আরশের ডানে দাঁড়াবো, আমি ব্যতীত সৃষ্টি জগতের কেউই সেখানে দাঁড়াবার মর্যাদা লাভ করবে না [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ তিরমিযী শরীফ], যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আমি হব নবীদের ইমাম, তাদের কথক এবং তাদের মধ্যে এক অনন্য শাফা'আতকারী –এতে আমার কোন গর্ব নেই (দ্র. উবাই বিন কাব থেকে বর্ণিত ঃ তিরমিযী শরীফ) । বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ওসীলা। তা কেবলমাত্র এক ব্যক্তিই লাভ করবে। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ তিরমিযী শরীফ]। 'কিয়ামত দিবসে নবীদের মধ্যে আমিই হব সর্বাধিক অনুগামী (শাফা'আতের জন্য)। আমি বেহেশতের নিকট উপনীত হয়ে দ্বার উন্মোচন করতে বলব। তখন বেহেশতের প্রহরী বলবে, আপনি কে? আমি বলব, আমি মুহম্মদ। তখন সে বলবে, আমি কেবলমাত্র আপনার জন্যই আদিষ্ট হয়েছি, আমি অন্য কারও জন্য এ দ্বার উন্মোচন করার নই [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ –মুসলিম শরীফ

মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে প্রেরণ করেন অসংখ্য নবী–রসূল। এসব নবী–রসূলের মধ্যে প্রিয়নবী (সা)–র অবস্থান নিয়ে আমাদের মনে কৌতূহল জাগে। স্বয়ং প্রিয়নবী (সা) বলেন ঃ 'আমার উপমা ও আমার পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

নবীদের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটা সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করলো কিন্তু এক কোণে একটি ইটের স্থান বাকী রয়ে গেল । অতঃপর লোকেরা গৃহটিকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল আর বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি ? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'আমিই সেই ইট, আমিই শেষ নবী [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

আলোচনারত একটা সভার নিকটবর্তী হয়ে মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ 'আমি তোমাদের আলোচনা শুনেছি। তো তোমরা বিস্মিত হয়েছো যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র খলীল (প্রেমিক বন্ধু), তা অবশ্যই বটে। মূসা (আ) আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন তা অবশ্যই বটে । ঈসা (আ) আল্লাহ্র বাণী ও তাঁর ফুঁৎকার (অর্থাৎ বাণী ও ফুঁৎকারের ফল)–তা অবশ্যই বটে। আদম (আ)-কে তিনি বন্ধু মনোনীত করেছেন– তা অবশ্যই বটে। তবে শুন আমার প্রসঙ্গ, আমি আল্লাহ্র হাবীব (প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক) এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমি কিয়ামতের দিবসে প্রশংসার পতাকা বহনকারী, এ পতাকাতলে আশ্রয় নিবে আদম (আ) ও আদমসন্তানগণ । এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমি আল্লাহ্র নিকটে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ [দ্র. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ দারামী শরীফ]। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ (হে রসূল) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্র সংগে বন্ধুত্ব করতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। এ আয়াত প্রিয়নবী (সা)–কে কেবল আল্লাহ্র হাবীব বা (প্রেমাস্পদ) বন্ধুরূপেই উপস্থাপন করে না বরং সরাসরি প্রমাণ করে আল্লাহ্র বন্ধু হওয়ারও মাধ্যম তিনি। পরকালে প্রিয়নবী (সা)–এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীসগুলোতে যেসব বিবরণ এসেছে আল্লাহ্ সে সবের পূর্বাভাস দিয়েছেন অতি সংক্ষেপে। তিনি বলেছেন ঃ 'সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব।' আর এদের সকলের বিষয় (সকল নবী উম্মতের বিষয়ে সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করব স্বয়ং তোমাকে [মুহম্মদ (সা)]।

—সূরা নহল ঃ ৮৯

আশা করা যায় তোমার প্রভু তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে (সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে)। —বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯

www.pathagar.com

মহানবী (সা)-এর অতুলনীয় সম্মান ও অপরিসীম মর্যাদা তাঁকে নেহায়েত বিনয়ী করে তোলে। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রকাশ করেও বিনীতভাবে বলতেন ঃ 'নবীদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিও না।

–বুখারী শরীফ

আমাকে মূসা (আ)-র উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না-বুখারী শরীফ। সৃষ্টির সেরা ইবরাহীম (আ) (দ্র. নিবরাস)। আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয় ইউসুফ (আ) (দ্র. বুখারী শরীফ)। এসব হাদীসের তাৎপর্য হলো নবুয়ত ও রিসালতের প্রকৃতিতে সকল নবী-রসূল সমান-কারও উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেনঃ 'আমরা (মু'মিনগণ) তাঁর (আল্লাহ্‌র) রসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। –সূরা বাকারা ঃ ২৮৫

আর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ কর্তব্য পালনের ব্যবধানে নবী-রসূলগণ একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এক একজন নবী এক এক প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল। আল্লাহ্ বলেন, 'এই রসূলগণ তাদের মধ্যে আমি কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।'

–সূরা বাকারা ঃ ২৫৩

আর সার্বিক দিক ও বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মহানবী মুহম্মদ (সা)। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তোমরাই (উম্মতে মুহম্মদী) শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব।' –আল ইমরান ঃ ১১০

উম্মত শ্রেষ্ঠ বলে উম্মতের নবী মুহম্মদ (সা) অন্যসব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয়ে পারেন না। আল্লাহ্ তা'আলা যে বিশ্বজগতের প্রতিপালক মুহম্মদ (সা) সেই একই বিশ্বজগতের জন্যই রহমত। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'আমি তোমাকে কেবল বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' –সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭

আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।–সূরা আলাম নাশরাহ ঃ৪

নবী-রসূলগণকে আল্লাহ্ গায়ব সম্পর্কে অবহিত করতেন। এ পর্যায়ে রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ 'আমি মক্কায় একটা পাথর সম্পর্কে অবহিত আছি যে, উক্ত পাথরখানা আমি নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করত। আমি উক্ত পাথরখানাকে এখনও চিনি (দ্র. হযরত জাবির

www.pathagar.com

বিন সামুরা কর্তৃক বর্ণিত ঃ মুসলিম শরীফ)। আমি দেখি তোমরা যা দেখ না। আমি শুনি তোমরা যা শুন না। আকাশ সর্বদা (ফিরিশতাদের ভারে) চড় চড় করছে আর তার পক্ষে চড় চড় করা স্বাভাবিক। সেখানে চার আঙ্গুল পরিমাণও শূন্য জায়গা নেই যে, ফিরিশতারা সিজদাবনত হয়নি। আল্লাহ্র শপথ–আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানিতে তবে কম হাসতে ও বেশি বেশি কাঁদতে। তোমরা তো স্ত্রী সম্ভোগ করতে পারতে না। ঘর ছেড়ে আল্লাহ্র উদ্দেশে জঙ্গলে বেরোতে [দ্র. হযরত আবূ যর গিফারী (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ মিশকাত শরীফ]। এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী (সা)–র কখনও কখনও এমন হতো যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের প্রকৃতিতে অবস্থান করতেন। নবী করীম (সা) মদীনায় এলে দেখতে পেলেন মদীনার লোকেরা খেজুর বৃক্ষে তা'বীর করছে–নরবৃক্ষের কেশর মাদী বৃক্ষে সংযোগ করছে। প্রিয়নবী (সা) বললেন, 'তোমরা এরূপ করছো কেন?' তারা বলল, 'আমরা বরাবরই এরূপ করে আসছি।' প্রিয়নবী (সা) বললেন ঃ 'মনে হয় তোমরা এরূপ না করলেই ভাল হয়।' ফলে তারা তা'বীর থেকে নিবৃত্ত থাকলে তাদের ফলন হ্রাস পায়। তারা (ফলন হ্রাসের) ব্যাপারটা প্রিয়নবী (সা)–র নিকট উল্লেখ করলে প্রিয়নবী (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন ঃ 'আমি তো কেবল একজন মানুষ। তো আমি যখন তোমাদের দীনের বিষয় তোমাদের কেবল নির্দেশ দেই তোমরা তা আঁকড়িয়ে ধরবে। আর আমি নিজস্ব মতানুসারে তোমাদের কোন নির্দেশ দিলে তোমরা জানবে আমি তো একজন মানুষ।'– রাফী বিন খাদীজা (রা) থেকে বর্ণিত। –মুসলিম শরীফ

হযরত মুহম্মদ (সা) একজন সার্থক সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'হে মুহম্মদ (সা)! আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।' –সূরা সাবা ঃ ২৮

মুহম্মদ (সা) বিভিন্ন প্রকার উপমার সাহায্যে এ প্রসঙ্গটা হৃদয়গ্রাহী করে তুলছেন। তিনি বলছেন ঃ "আমার উপমা ও আল্লাহ্ আমাকে যে রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা এরূপ ঃ যেমন এক ব্যক্তি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার স্বচোখে শত্রুসৈন্য দেখে এসেছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য একজন চূড়ান্ত সতর্ককারী। সুতরাং পরিত্রাণ!

www.pathagar.com

পরিত্রাণ!! (তোমরা পরিত্রাণের প্রস্তুতি নাও) এসব শুনে সম্প্রদায়ের একটা দল তাঁকে স্বীকার করল এবং রাতারাতি স্থান ত্যাগ করে শত্রু থেকে পরিত্রাণ পেল। আর অন্য একটা দল তাঁকে অস্বীকার করে স্বস্থান আঁকড়িয়ে ধরল। প্রত্যূষে আকস্মিক শত্রু সৈন্য এসে তাদের ধ্বংস করল ও সমূলে বিনাশ করে দিল। এ হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত, যে আমাকে স্বীকার করল ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করলো এবং তার দৃষ্টান্ত যে, আমাকে অস্বীকার করলো ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো–হযরত আবূ আল আশ'আরী (রা) কর্তৃক বিবৃত। –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী (সা) আরো একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন ঃ 'আমার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন প্রজ্বলিত করলো। আগুন তার চতুর্দিকে আলোকিত করে তুললে পতঙ্গসমূহ ও ঐসব কীট যারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবাই দলে দলে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো আর সে ওগুলোকে বাধা দিতে লাগলো কিন্তু ওরা (পতঙ্গসমূহ) তাকে পরাস্ত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। তো এটাই হলো আমার ও তোমাদের উপমা। আমিও (মুহম্মদ (সা) তোমাদের (হে মানব জাতি) কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে পিছনে টানছি আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছো। তোমরা আগুন থেকে এস আমার দিকে [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিতঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]। রসূলে করীম (সা) প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নির্ণয় করে সুন্দর একটা উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ আমাকে যে হিদায়ত (পথ নির্দেশিকা) ও ইল্‌ম (জ্ঞান-বিজ্ঞান) দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি যা কোন ভূখন্ডে বর্ষিত হয়। ফলে ভূখন্ডের একটা উৎকৃষ্ট (উর্বর) অংশ বৃষ্টির পানি ধারণ করে প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশির জন্ম দেয়। আর (ভূখন্ডের) অপর একটা শক্ত ও গভীর অংশ পানি (শোষণ করেও) আটকিয়ে রাখে যার দ্বারা আল্লাহ্ মানুষের উপকার সাধন করেন। তারা তা নিজেরা পান করে অপরকে পান করায় এবং কৃষি কাজে ব্যবহার করে। আর (ভূখন্ডের) আরেকটা কঠিন (অনুর্বর) ও সমতল অংশ যা বৃষ্টির পানি আটকিয়েও রাখে না কিংবা (পানি শোষণ করে) ঘাস পাতাও জন্মায় না। এ হচ্ছে (আমার সঙ্গে) তার উপমা যে আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ আমাকে যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তদ্দ্বারা তাকে উপকৃত করেন সে নিজে জ্ঞান লাভ করে ও অন্যকে জ্ঞান দান করে। আর তার উপমা যে এসব মাথা তুলেও দেখে না এবং আমি যে আল্লাহ্র পথনির্দেশিকা নিয়ে এসেছি তা গ্রহণ করে না।–হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

রসূলে করীম (সা) মাঝে মাঝে তার কামনা–বাসনা ও ইচ্ছা–আকাঙক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর স্বতস্ফূর্ত উক্তি 'আমার একান্ত কামনা 'আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, আবার শহীদ হই, পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক, আবার আমাকে শহীদ করা হোক, পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক, আবার আমাকে শহীদ করা হোক [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিতঃ বুখারী শরীফ]। আমার নিকট যদি ওহুদ পরিমাণ সোনাও থাকত, তবে গ্রহণ করার মতো কোন ব্যক্তি পাওয়া গেলে এবং আদায়যোগ্য ঋণের জন্য সংরক্ষিত রাখা ব্যতীত তার থেকে একটি মাত্র দীনারও অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমার উপর তিনটি রাত্র অতিবাহিত হোক এটা আমি পছন্দ করতাম না [দ্র. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিতঃ বুখারী শরীফ] হে আল্লাহ্ আমাকে দরিদ্ররূপে জীবিত রাখ এবং দরিদ্ররূপে আমার মৃত্যু ঘটাও। দরিদ্রের সংগে হাশর করিও এবং–কিতাবুয্ যুহদ –তিরমিযী শরীফ

প্রিয়নবী (সা) বিভিন্ন নামে অভিহিত। প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেনঃ 'আমার কতগুলো নাম রয়েছে, আমি মুহম্মদ (চরম প্রশংসিত), আমি আহমদ (চরম প্রশংসাকারী), আমি আল–মাহি (নিশ্চিহ্নকারী)–আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি আল হাশির (সমবেতকারী)–আমার পশ্চাতে (কিয়ামতে) মানব জাতিকে সমবেত করা হবে। আমি আল–আকিব (শেষ আগমন–কারী)–আকিব মানে যার পরে কোন নবী নেই। [হযরত আবূ মূসা আল–আশ'আরী (রা) কর্তৃক বর্ণিতঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ]। আমি নবী–উর রহমাহ (দয়ার নবী), আমি নবী–উত তাওবা (তাওবার নবী), আমি আল–মুকাফ্ফী (শেষ নবী), আমি নবী–উল–মালাহিম (সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নবী, জিহাদের নবী, সংশোধনের নবী)।

www.pathagar.com

কুরায়শরা নবী করীম (সা)-কে মুহম্মদ (নন্দিত) নামের পরিবর্তে মুযাম্মাম (নিন্দিত) বলে অভিহিত করলে রসূল (সা) বলেন, কি আজব ব্যাপার! আল্লাহ্ কি চমৎকারভাবে কুরায়শদের গালমন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার উপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তারা মুযাম্মাম (নিন্দিত)-কে গালমন্দ করে, তারা মুযাম্মামকে অভিসম্পাত করে কিন্তু আমি তো মুহম্মদ (নন্দিত চরম প্রশংসিত)। আমি মুযাম্মাম নই [হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। —বুখারী শরীফ

রসূলে করীম (সা)-এর উপরিউক্ত নামসমূহের মধ্যে আহমদ ও মুহম্মদ নাম সর্বাধিক পরিচিত। আহমদ মানে যিনি অধিক প্রশংসা করেন-চরম প্রশংসাকারী। এ নামের মর্ম হলো, প্রিয়নবী (সা) আল্লাহ্ ও জীবন জগত সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত-বর্ণনাকারী তথা প্রশংসাকারী। প্রিয়নবী (সা) স্বয়ং নিজেই বলছেন ঃ 'আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত, আমি আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভয় করি, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করি (দ্র. কিতাবুল ঈমান ঃ মুসলিম শরীফ)। আর যার মধ্যে এসব গুণ নিহিত রয়েছে তিনি সৃষ্টিজগতে নির্ঘাত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আর এজন্যই তাঁর নাম মুহম্মদ (চরম প্রশংসিত)। আল্লাহ্ বলেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে সর্বাধিক সাবধানী।"

রসূলে করীম (সা) মানব জাতির একচ্ছত্র আদর্শ। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। তিনি আদর্শ ও অনুসৃত বলেই সকলের ভালবাসা ও মহব্বতের পাত্র। প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ 'তোমাদের কেউই মু'মিন হয়ে উঠবে না-যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা পুত্র ও সমগ্র মানুষের চেয়ে প্রিয় হবো [দ্র. হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বিবৃত] ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। এমনকি একজন মু'মিনের জন্য স্বীয় প্রাণের চেয়েও নবী করীম (সা)-কে অধিকতর ভালবাসতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'নবী (সা) মু'মিনদের নিকটে তাদের নিজেদের আত্মা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (দ্র সূরা আহ্যাব ঃ ৬)। মূলত রসূল (সা)-এর সঙ্গে উম্মতের এই ভালবাসা আদর্শিক-অনুকরণ ও অনুসরণ-ভিত্তিক। প্রিয়নবী (সা) তাঁকে ভালবাসার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ 'যে আমার সুন্নাহ (আদর্শ) ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে

www.pathagar.com

ভালবাসালো সে আমার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে–হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত। –তিরমিযী শরীফ

আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের নিকট সমুজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দীন নিয়ে এসেছি। যদি মূসা (আ)–ও বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষে আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না (দ্র. হযরত জাবির)

www.pathagar.com

রহমাতুল্লিল আলামীন

মওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার

রহমাতুল্লিল 'আলামীন জগতসমূহের জন্য রহমত। 'রব্বুল আলামীন'-জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লা শানুহূ কুরআন মজীদে ১৭ পারা, সূরা আম্বিয়ার ৭ম রুকূতে ইরশাদ করেছেন : (হে নবী) আপনাকে আমি জগতসমূহের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি। এ আয়াতে করীমাতে আল্লাহ্ হাকীম আমাদের প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম)-কে এমন একটি মর্যাদা দান করেছেন যা জানামাত্র আমাদের মন মেযাজ খুশীতে ভরে যায়। বিশ্বপালক মহিমান্বিত গৌরবান্বিত আল্লাহ্ হযরত রসূলে মকবুলকে বেশুমার গুণে ভূষিত করেছেন। সকল গুণের মধ্যে এ গুণটি সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

তিনি যে জগতসমূহের জন্য রহমত, এ বিষয়টি চারটি পর্যায়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ১. কি ধরনের রহমত ? ২. কার প্রতি রহমত ? ৩. কখন থেকে রহমত ? ৪. কতকালের জন্য রহমত ?

প্রথমত জগতসমূহের জন্য রহমত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কেউ নয়। এটা তাঁর বিশেষ গুণ। এ সম্মান আর কাউকে দেয়া হয়নি। সাইয়্যেদুনা হযরত ঈসা রূহুল্লাহি (আলায়হিস সালাম) সম্পর্কে কুরআনুল করীমে ইরশাদ : আমাদের পক্ষ থেকে রহমত কিন্তু কতকালের জন্য এবং কি জন্য রহমত তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। অন্যান্য আম্বিয়া (আলায়হিস সালামের) বেলায় ইরশাদ হয়েছে :

আমি ঐ সময় পর্যন্ত কোন দেশ ও জাতির প্রতি আযাব নাযিল করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের প্রতি কোন রসূল প্রেরণ করি অর্থাৎ পূর্বাহ্নে কোন নবী

www.pathagar.com

রসূল প্রেরণ না করে কোন দেশ ও জাতির প্রতি তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তিস্বরূপ আযাব-গযব নাযিল করি না।

তাহলে দেখা যায়, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম মু'মিনগণের জন্য রহমত এবং তাদের প্রতি অবাধ্যতা আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গযব নাযিলের কারণ। ভেবে দেখার ব্যাপার, সাইয়্যেদুনা হযরত নূহ্ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায় কিভাবে মহাপ্লাবনে ধ্বংস হলো। সাইয়্যেদুনা হযরত লূত (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের কি শোচনীয় পরিণতি হলো! সাইয়্যেদুনা হযরত মূসা কলীমুল্লাহি (আলায়হিস্ সালাম)-এর জাতি ফিরাউনের গোষ্ঠী কিভাবে ডুবে মরলো! কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ জানিয়ে দিয়েছেনঃ আপনি যেহেতু তাদের মাঝে রয়েছেন তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আযাব দিবেন না। সত্যি প্রণিধানযোগ্য যে, হুযূর (আলায়হিস সালাম) কতো বড় রহমত ! অর্থাৎ উম্মতে মুহম্মদীর উপর ঐ ধরনের আসমানী ও যমিনী গযব-আযাব আপতিত হবে না, এটা হুযূরের খাস বৈশিষ্ট্য। হুযূর যে রহমত তার প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা 'রব্বুল আলামীন' এবং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তিনি করেছেন রহমাতুল্লিল আলামীন। আল্লাহ্ জগতসমূহের রব (প্রতিপালক), আমাদের প্রিয়নবী জগতসমূহের রহমত (করুণা)।

'আলম' অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য সবকিছুকেই বুঝায়। 'আলম' বহু রকমের। আলমে ইমকান (সম্ভাব্য সবকিছু), আলমে আমর (হুকুম জগত বা রূহ্ জগত), আলমে আলম (জ্যোতির জগত), আলমে আজসাম্ (দেহ জগত), আলমে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তা জগত) ইত্যাদি। আলমে আজসাম্ (দেহ জগত)-এর মধ্যে মানুষ, পশু, সকল জীবজন্তু, প্রাণীমাত্রকেই বুঝায়। গাছপালা, ইট-পাথর সবই বুঝায়। কাজেই 'আল্ আলামীন' শব্দে সকল আলমকেই বুঝানো হয়েছে। সোজা কথায় হুযূর আলায়হিস্ সালাম সকল আলমের জন্যই রহমত। ফেরেশ্তা, জ্বিন, মানুষ, সকল প্রাণী, কাফির, মুসলমান সবার জন্যই তিনি রহমত।

www.pathagar.com

তফসীরে রূহুল বয়ানে আল্লামা ইমাম ইসমাইল হাক্কী রহমতুল্লাহি আলায়হি একখানা হাদীস বয়ান করেছেন ঃ "এক সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো সকল আলমের জন্য রহমত। তুমিও তো একটি আলম। তুমি আমার থেকে কি রহমত পেয়েছ? আরয করলেন, ইয়া নবীবাল্লাহ্! (হে আল্লাহ্‌র পিয়ারা রসূল !) আমার শেষ পরিণতি কি হবে সে চিন্তায় আমি বিভোর ছিলাম। কারণ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম নিজের চক্ষের সামনে হারূত মারূত ফেরেশতা ও ফেরেশতা জগতে বিচরণকারী ইবলীসের শোচনীয় পরিণতি দেখেছেন। আপনার মাধ্যমে আমি নিরাপত্তা লাভ করেছি। দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছি। বিশ্বপালক আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন ঃ সামর্থ্যবান, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, বিনয়ী এবং বিশ্বাসভাজন।

সকল নবী-রসূল, সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতা সবাই হযরতের রহমত প্রাপ্ত। কাফিরদের প্রতিও বহুভাবে তাঁর রহমত রয়েছে । হযরতের এ পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্বে কাফিরদের প্রতি নানারকম আযাব-গযব আপতিত হতো, আজ তা বন্ধ। অপরাধী গুনাগারদের শাস্তি, অপমান, লাঞ্ছনা পৃথিবীতেই বহু হতো। আজ তা বন্ধ। কিয়ামতে কঠিন বিচারের দিনে নাযাত লাভ। হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করানো তাঁরই মাধ্যমে হবে। সোমবার দিন আসলে আবূ লাহাবের প্রতি আযাব কম করা হয়। খাজা আবূ তালিবকে হুযূরের ইযযতে, বরকতে লঘু আযাব দেয়া হয়। আবূ লাহাবের বাঁদী ছোওয়াইবাহ্ হুযূরের জন্ম সংবাদ দিয়েছিল। তাই আবূ লাহাব খুশীর সংবাদ দাত্রী ছোওয়াইবাহ্‌কে দাসত্ব মুক্ত করে দিয়েছিল। ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলী উঁচিয়ে ছোওয়াইবাহ্‌কে সম্বোধন করে বলেছিলো, 'তুই আমাকে সুসংবাদ দিয়েছিস, যা তোকে আমি আযাদ করে দিলাম।' আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ তাঁর হাবীবের জন্ম সংবাদে যে সে দাসত্বমুক্ত করেছে, সে জন্য সোমবার দিন সে আঙ্গুলটির আযাব বন্ধ রাখেন। আবূ লাহাব আঙ্গুলটি চুষে স্বস্তি পায়। খাজা আবূ তালিব নিখুঁতভাবে হযরতকে

www.pathagar.com

ভালোবাসতেন। স্নেহ আদর করতেন। সে কারণেই তার আযাব লঘু করা হয়েছে।

আশেকে রসূল আল্লামা বুসিবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসামূলক কাব্য 'কাসীদায়ে বরদাহ্‌র' ব্যাখ্যায় আল্লামা খরপুতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শাফাআত সাত রকমের হবে। ৩ প্রকারের দ্বারা কাফিররাও লাভবান হবে। ৪ প্রকারের দ্বারা কেবলমাত্র মুসলমানগণ উপকৃত হবে। নেককার মুসলমান কোন কোন ব্যাপারে এ সুবিধা লাভ করবেন। বদকার মুসলমানও বিশেষ বিশেষভাবে সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

চতুর্থত, যেদিন থেকে জগত সৃষ্টি হয়, হুযূর (আলায়হিস সালাম) সেদিন থেকেই রহমত। আল্লাহ্‌ তা'আলার রবুবিয়াত (প্রতিপালন) যেদিন থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেদিন থেকে হুযূরের রহমতও প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কথা হলো, জগত সৃষ্টিই হয়েছে হুযূরের তোফায়েলে। প্রথম মানুষ আদি পিতা সাইয়্যেদুনা হযরত আদম ছফিয়ুল্লাহ আলায়হিস সালাম সম্মান ও মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়েছেন হুযূরের বরকতে। তারপর তাঁর দু'আ কবূল হওয়া তাও হুযূরের সম্মানে। সূরা বাকারার ৪র্থ রুকূতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

তারপর আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কলেমা শিখে নিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর তওবা কবূল করলেন, তিনি তওবা কবূলকারী ও দয়ালু।

তফসীরে খাযেন, মাদারিক, রূহুল বয়ানে বর্ণিত হয়েছে, সাইয়্যেদুনা হযরত আদম আলায়হিস সালাম তাঁর ভুলের জন্য প্রায় তিনশো বছর পর্যন্ত শরমে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাননি। এতো কেঁদেছেন যে, সারা দুনিয়ার সকল চোখের পানি একত্র করলেও তাঁর সমান হবে না।

দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পাঁচজন প্রিয় বান্দাহ সবচেয়ে বেশি কেঁদেছেন। ১. হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন–কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর। ২. খাতুনে জান্নাত সায়্যিদাতুন্নিসা ফাতিমাহ্‌ যহরা–হুযূর আলায়হিস সালামের ওফাতের পর। ৩. হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলায়হিস সালাম–আল্লাহ্‌

www.pathagar.com

পাকের মহব্বতে। ৪. হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম। ৫. হযরত সাইয়্যেদুনা আদম আলায়হিস সালাম।

কাঁদতে কাঁদতে কিছু দু'আ কালেমা তাঁর মনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেলো। তিনি সেসব দোয়া-কালেমা পড়ে যখন তওবা করলেন, রহমতে ইলাহী নাযিল হলো।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলায়হি তাঁর 'মাদারেজুন-নবুওয়াত' কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের শুরুতে, তফসীরে রূহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়, তিবরানী, হাকিম, আবূ নয়ীম, বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম সাইয়্যেদুনা হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, একদিন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মনে পড়ে গেলো আমি বেহেশতে থাকাকালীন আরশে আযীমের পারায় লেখা দেখেছি ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। তিনি ভাবলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার এতো অধিক প্রিয় যে, নিজের মুবারক নামের সংগে তাঁর নাম জড়িয়ে রেখেছেন। তিনি তাঁর ওয়াসীলাহ নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে নিজের কৃত ভুলের জন্য মাফ চাইলেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের দরিয়া উথলে উঠলো।

তাহলে প্রমাণিত হলো যে, সাইয়্যেদুনা আদম আলায়হিস সালাম সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নূর ধারণ করার গুণে সমস্ত ফেরেশতার সিজদা পেলেন। তারপর তাঁরই বদৌলতে তওবা কবূল হলো।

এবার আদেশ হলো যে, হযরত সাইয়্যেদুনা আদম আলায়হিস সালামের সকল আওলাদ যে কেউ গুনাহ্ করবে, জুলুম করবে, কুফরী করবে আমাদের প্রিয়নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযিরা দিয়ে তাঁর শাফা'আতের দরখাস্ত করলে তওবা এবং তিনি শাফা'আত করলে অবশ্যই তওবা কবূল হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

(হে নবী) আমার গুনাহ্গার বান্দাহ্রা আপনার কাছে আসবে, নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইবে এবং তাদের জন্য রাসূলও মাফ চাইবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করবেন, তিনি পরম দয়ালু। এর

www.pathagar.com

অর্থ এ নয় যে, তোমাকে দৌড়ে মদীনা মনওয়ারায় যেতে হবে। এখানে বসেই রসূলে করীমের নিয়মে তওবা করলে তওবা কবূল হবে। তিনি তাঁর উম্মতের খবর রাখেন, উম্মতের সকলে তা না বুঝলেও।

কালামে মজীদের দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর প্রিয়নবী রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ যাঁর রব আল্লাহ্ তাঁর জন্য রহমত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

অনুপম আদর্শ

ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য ঘটনার সমাহারে অনন্য। তিনি যখন তাঁর জীবনের ৪৫তম বছর অতিক্রম করছেন, সে সময়ের একটি ঘটনা। তখন পবিত্র মক্কার কা'বায় স্থাপিত ছিলো ৩৬০টি মূর্তি। কা'বার কর্তৃত্ব ছিলো মক্কার কুরায়শদের হাতে। তারা তখন ছিলো ইসলামের ঘোর শত্রু। কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে আবূ সুফিয়ান ইব্‌নে হারব্, আন-নাদার ইব্‌ন আল হারিছ, আবুল বাযতারী,আল আসওয়াদ ইব্‌ন আল মুত্তালিব, যাম'আ ইব্‌ন আল-আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন আল-মুগিরা, আবূ জাহল ইবন হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমাইয়া, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, আল আস ইব্‌ন অয়েল, মুনাব্বিহ ইব্‌ন আল হাজ্জাজ এবং নুবাইহ ইব্‌ন হাজ্জাজ একদিন সূর্যাস্তের সময় কা'বার পার্শ্বে সমবেত হয়। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে কিছু কথা বলার জন্য তাঁকে সেখানে ডেকে আনে। তারা তাঁকে বলে ঃ হে মুহাম্মদ ! তোমাকে আমরা কিছু বলার জন্য এখানে ডেকে এনেছি। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ছাড়া আর কেউ আরবদের মাঝে এমন বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করেনি। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের অপমানিত করছো, আমাদের ধর্মকে দোষ দিচ্ছ, দেবতাদের গালি দিচ্ছো, আমাদেরকে বোকা সাব্যস্ত করছো, আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছো, আর এমন কি রইলো যা তুমি বাকী রেখেছো? তবে যা তুমি বলছো তার উদ্দেশ্য যদি সম্পদ আহরণ করা হয়, আমরা তোমাকে আমাদের মাঝে সব চাইতে সম্পদশালী করে দেবো ; যদি মর্যাদা ও গৌরব চাও, তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেবো, যদি বাদশাহ হতে চাও, আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করবো; যদি জ্বিন-ভূতের আছর হয়ে থাকে, যত অর্থের প্রয়োজন হোক আমরা তোমার চিকিৎসা করাবো। জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না,

www.pathagar.com

এসবের কিছুই নয়। আমি যে বাণী তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি তার বিনিময়ে চাই না কোন সম্পদ, সম্মান, কোন নেতৃত্ব, কোন বাদশাহী। আমাকে তো মহান আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর রসূল করে পাঠিয়েছেন, নাযিল করেছেন আমার উপর আল-কুরআন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যেনো আমি তোমাদের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হই। যা তোমাদের কাছে আমি নিয়ে এসেছি তা যদি তোমরা কবূল করো তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তা হবে তোমাদের হিস্যা কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান কর, আমি ধৈর্য ধারণ করব আল্লাহ্র ফয়সালার জন্য।

একথা শুনে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বলতে লাগলো : তুমি তো গণক, তুমি তো যাদুকর, তুমি তো দিবা স্বপ্নচারী, তুমি তো উন্মাদ, তুমি তো কবি ইত্যাদি। তখন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আমি তো অবস্থান করছি তোমাদের মাঝে দীর্ঘকাল এর আগে, তবুও কি তোমরা বুঝতে পারো না ?' —১০ : ১৬

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এ কথা শুনে লা-জবাব হয়ে গেলো। সবাই ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলো। কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। তারা জানতো এর অর্থ। তারা বুঝেছিলো এর তাৎপর্য। তারা উপলব্ধি করেছিলো এর মর্মার্থ। তাই সে দিন তারা কোন উত্তর না দিয়ে, কোন প্রতিবাদ না করে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে কেটে পড়েছিলো। তারা তো তাঁকে আশৈশব দেখেছে। তারা তো তাঁর কৈশোর ও যৌবনকাল প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘ ৪০/৪৫ বছর তিনি তো তাঁদের একজন ঘনিষ্ঠ আপনজন ছিলেন। তারা তো তাঁকে পরম বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী আল-আমীন বলে ডেকে আসছে। তাই সেদিন তাদের পক্ষে নির্বাক ও নিশ্চুপ লা-জবাব হওয়া ছাড়া উপায় কি ছিলো।

জীবনের যে সময় মানুষের মাঝে উচ্ছ্বাস থাকে, আবেগের প্রাবল্য থাকে, উদ্যমের বল্গাহীনতা থাকে, আকাঙ্ক্ষার বিশালতা থাকে, যুক্তির চাইতে প্রবৃত্তির প্রাধান্য থাকে, সে সময় যে মানুষটি আল-আমীন খেতাবে ভূষিত হলেন, কি করে তিনি রাতারাতি চল্লিশোর্ধ বয়সে এসে পাল্টে গেলেন ? বদলে গিয়ে কি করে হঠাৎ গণক হয়ে বসলেন ? যাদুকর বা উন্মাদ হলেন ? কবি বা দিবা

www.pathagar.com

স্বপ্নচারী সাজলেন? কেনো ? কোন্ উদ্দেশ্যে ? যে কাজ তিনি করছেন তাতে নির্যাতন বৈ আর কিছু তিনি পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, মান-মর্যাদা, অর্থ, সম্পদ যদি পেতে চাইতেন, তা তিনি অবলীলায় পেতে পারতেন।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের বিগত জীবনকে সনদ হিসেবে আপনজনদের সামনে উপস্থাপন করার আর একটি নজীর এছাড়া নেই। আমাদের প্রিয়নবী কুরায়শদের অলীক ও অসার বক্তব্য অপনোদনের জন্য অন্য কোন যুক্তির অবতারণা না করে নিজের বিগত জীবনকে সনদ হিসেবে পেশ করেন। আর এ সনদ এমন কার্যকর ও মোক্ষম ছিল যে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ না করলেও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরে এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এ মানব ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, পরমত সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরোপকার, ধৈর্য ইত্যাদি যতো মানবীয় গুণ আছে সবকিছু ইতিবাচক এবং এ সবই একজনের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তি, ষড়রিপু-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদির তাড়নে কেউ প্রভাবিত হবে না, এমনটি অকল্পনীয়। তাই এসবের কারণে এমন কিছু করা মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক যা অনুচিত। মানুষ শৈশবে, কৈশোরে ও যৌবনে সাধারণত রিপুর অনুগত থাকে এবং এ সময়ই যা কাম্য নয় এমন কিছু না কিছু করে বসে। কবি তাই তো বলছেন ঃ

রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায়গো লয়
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনই পুড়িতে হয়।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনে এ ধরনের আত্মগ্লানির কোন অবকাশ আসেনি। যা বিস্ময়কর। যা অসাধারণ।

পৃথিবীর তাবৎ দৃষ্টান্ত পেশ করলেও এমন একটি পাওয়া যাবে না যেখানে কোন মনীষী, কোন নবী, কোন দার্শনিক, কোন নেতা বা অন্য কেউ নিজের জীবনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে সনদ রূপে স্বজাতির সামনে পেশ করে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্যই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠ মানুষ, আদর্শে অনুপম।

www.pathagar.com

সর্বোত্তম আখলাক যাঁর

মওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার

সমগ্র কুরআন করীমের বিকাশস্থল হযরত নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম। তিনিই একমাত্র মহামানব যিনি বিশ্বপালক আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবার থেকে সম্মানের সম্ভাষণ লাভ করেছেন, اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।' (সূরা কলম ঃ ৪) এ মহান চরিত্র পবিত্র কুরআনের জাহির ও বাতিন উভয় দিক থেকে। যে দিন মানুষ কুরআন হাকীমের জাহির ও বাতিন সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে, সেদিন তার পক্ষে সারওয়ারে কায়েনাত, ফখ্‌রে মওবূদাত হযরত আহমদ মুজতবা মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর জাহির ও বাতিনের চারিত্রিক বিশ্লেষণ সম্ভব হবে-তার পূর্বে নয়। কুরআন মজীদের সীমাহীন পারাবার হতে মানব জাতি আজ পর্যন্ত এক বিন্দুও তুলতে পারেনি। সে শুধু তার তীরে উপল খণ্ড সংগ্রহ করেছে, তার অনন্ত কলরোল ধ্বনিতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঈমানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন হাকীমকে বুঝতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা তাতে ভরপুর। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব মুস্তফাকে আদেশ করেছেন, আপনি আমার পরিচয় জগতকে জানিয়ে দিন। ওদিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই তাঁর প্রিয়নবীর পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। এ দু'টি বিষয় মনোযোগ সহকারে দেখবার ব্যাপার। এ রহস্য যাঁর পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে, তাঁর কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পরিচয় সহজ হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

সাধারণ দৃষ্টিতেও শতাধিক আয়াত সরাসরিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিচিতি রূপে কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত রয়েছে। সব আয়াতই বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক অথৈ পাথার। স্বল্প পরিসরে এ সবের আলোচনা মোটেই সম্ভবপর নয়। প্রসঙ্গক্রমে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

১ম পারা, সূরা বাকারা, ৩য় রুকূ, ২৩ আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ আমাদের প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম)–কে তাঁর 'আব্দ' (বান্দাহ্) বলে জগতকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ইবাদত করতে করতে আব্দ। ইবাদত করাই আবদের কাজ। বন্দেগী করাই বান্দাহ্র বৈশিষ্ট্য। 'আব্দ' শব্দের অর্থ কেউ কেউ 'দাস' বা 'ক্রীতদাস' বলে থাকেন। তারা এ কথাটি বুঝতে চান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দাসরূপে কিনে আনেননি। ইবাদতের জন্য 'আব্দ' সৃষ্টি করেছেন। কাজেই 'দাস' বা 'ক্রীতদাস' শব্দ এখানে একেবারে বেমানান, মূর্খতার পরিচায়ক।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের প্রাণ প্রিয়নবী মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য বান্দাহ্র ন্যায় বান্দাহ্ নন। কারণ, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছে। তফসীরে খাযেন ও মাদারেকে বর্ণিত হয়েছে, যাঁর মুবারক যবান থেকে কালামুল্লাহ শরীফ বেরিয়েছে, এমন মুবারক যবান কুল মখলুকাতে দ্বিতীয়টি আর কোথায় ? হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আইউকুম মিছলী'–তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছে ? অন্য এক হাদীসে আছে 'ওয়ালাকিন্নী লাস্তুকা আহাদিম মিন্‌কুম' কিন্তু আমি তোমাদের মতো নই। সাধারণ বুদ্ধিতে এ কথা বোঝা যায় যে, তাঁর মতো আর কেউ নয়।

আমরা তাঁকে বিশ্বাস করে নিয়ে মু'মিন, তাঁকে সত্যরূপে মেনে নিয়ে সত্যবাদী। তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আমাদের নিদ্রার কারণে ওযূ নষ্ট হয়। আল্লাহ্র রসূলের নিদ্রা নয় তন্দ্রা হতো, আর তন্দ্রার কারণে ওযূ নষ্ট হতো না। আমরা আল্লাহ্ তা'আলা রূহ্, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, আমলনামা প্রভৃতি সম্পর্কে তার নিকট থেকে শুনে বিশ্বাস করি, অথচ

www.pathagar.com

তিনি সবকিছু দেখে বিশ্বাস করেছেন। আমাদের নামায পাঁচ ওয়াক্ত, তাঁর নামায তাহাজ্জুদসহ ছয় ওয়াক্ত। শামী কিতাবের যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, আমাদের জন্য ইসলামের রোকন পাঁচটি, হুযরতের জন্য যাকাত বাদে চারটি। আমাদের জন্য চার স্ত্রী একত্রে রাখা জায়েয, তদূর্ধ্ব সংখ্যক নিষিদ্ধ। অথচ তাঁর জন্য সংখ্যা নির্ধারিত নেই। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশানের মধ্যে বিভাজ্য। হুযূর (সা)-এর সেভাবে নয়। তাঁর বিবিগণ উম্মতের মা। কারো সাথে বিবাহযোগ্য নন। আল্লাহ্ তা'আলার সকল নবী ও রাসূলই বাশার বা মানুষ। কিন্তু তাঁদের কাউকেই হে ভাই! হে বাবা ! হে পিতঃ ! হে মানুষ ! ইত্যাকার সম্বোধন করা হারাম। অপমান করার নিয়তে এরূপ সম্বোধন করলে তো সে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে। –ফতোওয়া আলমগীরী দ্রষ্টব্য

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কালেমা তাও আলাদা। তাঁর কালেমা হলো : 'আশ্হাদু আন্নী রাসূলুল্লাহি' –আমি সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রসূল। আমরা এরূপ বললে কাফির হয়ে যাবো। সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন মু'মিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাধারী। মু'মিনের তুলনায় সলিহ, শহীদ, মুত্তাকী, মুজতাহিদ, আওতাদ, আবদাল, কুতুব, কুতবুল আকতার, গওছ, গওছুল আ'যম, এরপর অনেক উচ্চে তাবেয়ী, সাহাবী, আনসারী, মুহাজির, সিদ্দীক, নবী, রসূল, উলুল আযম, খলীল, খাতামুন নবীয়্যীন, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, হাবীব মুস্তফা পর্যায়ক্রমে বেশি মর্যাদাশীল। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্তবা ২৭ গুণ উর্ধ্বে। যাঁর উর্ধ্বে আল্লাহ্ মালিক ব্যতীত আর কেউ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলে করীমের মাঝেও কেউ নেই।

তফসীর রূহুল বয়ানে সূরা মরইয়মের প্রথমে 'কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ'-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূল সাধারণ মানুষ নন। তিনি ইরশাদ করেছেন, যে আমাকে দেখলো সে সত্যই আমাকে দেখলো। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধরতে পারে না।' আরো ইরশাদ করেছেন, 'কোন

www.pathagar.com

কোন সময় আমার প্রতিপালকের সাথে আমার এমন গভীর নিবিষ্টতা হয় যে, সেখানে কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা এবং নবী-রসূলও পৌছতে পারে না।'

হযরত মওলানা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'মাদারিসুন্ নবুওয়াত' কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজেকে বাতির আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। (সূরায়ে নূর) কিন্তু তাই বলে কি কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে চেরাগের নূর বা আলো মনে করে? ঠিক তেমনিভাবে নবী মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম)-কে অন্যান্য মানুষ বা বান্দাহ্র মতো মনে করা ঠিক হবে না।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসেম নানুতুবী রসূলে আরবীয় প্রশংসায় লিখেছেন, 'রাহা জামাল পে তেরে হিজাবে বাশারিয়ত। না জানা কুছভী কেছিনে তুঝে বজুয্ ছাত্তার।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিচয় ব্যক্ত করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নূর ও প্রকাশ্য কিতাব এসেছে। (সূরা মায়িদা ঃ ১৫) সরাসরি নূর বা আলোকে প্রত্যক্ষ করা মানবীয় শক্তির বাইরে। যেমন সূর্য আলোকরশ্মিময়, কোন চক্ষু তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কিন্তু মানব চক্ষু ও সূর্যের মাঝে সামান্য মেঘের আড়াল হলে সহজে সূর্য প্রত্যক্ষ করা যায়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের পর্যায়ে এনে তাকে জগতের সকলের সামনে হাযির করা হয়েছে, যাতে সহজে মহান আল্লাহ্র বান্দাগণ প্রিয়নবী (সা)-কে বুঝতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীকে প্রিয়নবী (সা)-র পরিচয় করে দিয়েছেন। 'হে মানব জাতি ! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছেন এক দলীল বা প্রমাণ।' (সূরা নিসা ঃ ১৭৪) আয়াতে করীমাতে 'বুরহান' শব্দ ইরশাদ হয়েছে। বুরহান দলীল বা প্রমাণ অর্থে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ হুযূর (আলায়হিস সালাম) আপাদমস্তক সবই সত্যের দলীল। হযরতের সকল মুবারক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্যের দলীল। প্রতিটি মুবারক অঙ্গ থেকে মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি হযরতের পেশাব-পায়খানা থেকেও মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি যে বিশ্বনবী তার প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব মানবের সকলকে সম্বোধন করে পরিচিতি ব্যক্ত করেছেন। 'ইয়া আইয়্যুহান্নাছ'। অন্য আর কোন নবী বা রসূল সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত হননি।

তারা সীমিত কালের জন্য সীমিত ও চিহ্নিত সম্প্রদায় বা জাতীয় হিদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

দাবি বা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলীল-প্রমাণের দরকার হয়। নবুয়ত ও রিসালতের জন্য মু'জিযা জরুরী ব্যাপার। নবী-রসূলের দুশমনেরা মু'জিযার কারণেই তাঁদের কাছে অপারক, অক্ষম, নালায়েক প্রমাণিত হতো। মু'জিযা অর্থ অলৌকিক ব্যাপার যা অন্য সব কিছুকে অক্ষম ও অপারক করে দেয়। কাজেই মহান আল্লাহ্র নবী-রসূলগণ যে সত্য ও সক্ষম এবং তাঁদের দুশমনেরা যে মিথ্যা ও দুর্বল তা প্রমাণিত হয়ে যেতো।

অন্য নবী-রসূলগণের মু'জিযা আংশিক ও সাময়িক এবং আমাদের হযরতের মু'জিযা স্থায়ী এবং সার্বিক। হযরত ঈসা রূহুল্লাহি আলায়হিস সালামের মু'জিযা তাঁর শ্বাসের মধ্যে। হযরত মূসা কলীমুল্লাহি আলায়হিস সালামের মু'জিযা তার হাতের লাঠিতে। কোন কোন নবীর হাতে মু'জিযা প্রকাশ পেতো। আমাদের প্রিয়নবীর মু'জিযা তাঁর পবিত্র দেহের সর্বত্র বিদ্যমান।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চুল মুবারক খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর টুপিতে থাকার কারণে তিনি সব যুদ্ধে জয়ী হতেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পাগড়িতে রাখায় তার মাথা ব্যথা নিরাময় ছিল।

কবরে শান্তির আশায় হযরত আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কাফনের মধ্যে হযরত (সা)-এর চুল মুবারক রেখে দিতে ওসিয়ত করে গেছেন।

হযরত আমীর মুয়াবীয়াহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও কাফনের মধ্যে প্রিয়নবী (সা)-র চুল, নখ রেখে দাফন করতে ওসিয়ত করে যান।

সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চুল মুবারক থেকে নেয়া পানি রোগীদের সেবন করাতেন।

www.pathagar.com

হযরত তালহা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু–এর ঘরে প্রিয়নবী (সা)–র চুল মুবারক রাখায় ফেরেশতাগণের তসবীহ তাহলীল শুনতে পেয়েছেন।

–মাদারেজুন নবুওয়াত ও মাওয়াহেবে লুদুন্নিয়াহ দ্রষ্টব্য

প্রিয়নবী (সা)–র চক্ষু মুবারক আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতসহ তাঁর সৃষ্টির সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা দেখতে পেয়েছেন। সূর্য গ্রহণের সময় কুছুকের নামায আদায়ের সময় মসজিদের প্রাচীরের মধ্যে বেহেশত–দোযখ দেখেছেন।

মুকতাদিগণ পিছনে কি করতেন, তাও তিনি দেখতেন।

নাক মুবারকের মু'জিযা হলো, ইয়ামন থেকে হযরত ওয়াইজ করনী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে মুহব্বত করতেন, সে মুহব্বতের খুশবু তিনি পেতেন। –তফসীরে রূহুল বয়ান দ্রষ্টব্য

যবান যে মু'জিযা তা অস্বীকার করলে তো কুরআন ও ওহী অস্বীকার করা হবে।

হযরত যাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু–এর ঘরে খাদ্যের হাঁড়িতে মুখ মুবারকের লালা ফেলে দিলে তাতে বরকত হয়েছিলো। আটার মধ্যে ফেলেছিলেন। চার সের আটা হাজার হাজার লোক খাওয়ার পরও চার সেরই রয়ে গেছে।

হযরত মূসা কালিমুল্লাহ আলায়হিস্ সালামের মুবারক লাঠির আঘাতে পাথর ফেটে তা থেকে পানির নহর বয়ে গিয়েছিলো। প্রিয়নবী (সা)–র লালা মুবারকের বরকতে হযরত জাবের রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু–এর হাঁড়িতে গোশ্তের টুকরা ও শুরবাহর ফোয়ারা বয়ে গিয়েছিলো। শুরবাহ তো নিমক, মরিচ, ঘি, ধনিয়া ইত্যাদি মসলা দিয়ে তৈরি হয়। তা হলে বুঝতে হয় যে, কতোবড় মু'জিযায় সে শুরবাহর ফোয়ারা বয়ে গিয়েছিলো। খয়বরের যুদ্ধে হযরত আলী কাররমুল্লাহ ওয়াজহু'র কঠিন বেদনাযুক্ত স্থানে লাগিয়ে দিলে শেফা হয়ে গিয়েছিলো।

সওর পর্বতের গুহায় হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু–কে সাপে কাটলে তার চিহ্নিত স্থানে লালা মুবারক লাগিয়ে দিলে চির উপশম হয়ে

www.pathagar.com

যায়। যতদিন বেঁচেছিলেন, সাপে কাটা রোগীকে তাঁর সে স্থান ধোয়া পানি পান করালে সাপের বিষ দূর হয়ে যেত।

হাত মুবারক মু'জিযা। বদর যুদ্ধের দিন এক মুষ্টি ধূলিবালি কাফিরদের প্রতি ফিকে মারলেন, সাথে সাথে কাফিরদের চক্ষু অন্ধের মতো হয়ে গেলো। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা তাদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখতে থাকলো, ভয় পেলো, মুসলমানরা জয়ী হলেন।

হাতে কংকর নিয়েছিলেন। কংকরগুলো কালিমা তায়্যিবাহ্ পড়েছিলো।

আঙ্গুলগুলোও মু'জিযা। একটি পানির পাত্রে একটি আঙ্গুল রেখেছিলেন, তাতে এতো পানি আসতে লাগলো যে, তাতে পাঁচটি পানির ফোয়ারা বয়ে গেলো।

আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিলো।

শরীরে ঘাম মুবারকের মু'জিযা। তা থেকে খুশবু বের হতো।

কদম মুবারক মু'জিযা। যমীন, আসমান, আরশ–কুরশী সবকিছু প্রিয়নবী (সা)–র মুবারক কদমের আসরে বরকতময় হয়েছে। প্রিয়নবী (সা)–র জিস্‌ম মুবারকে ছায়া ছিলো না। আলোর কখনো ছায়া হয় না। প্রিয়নবী (সা)–র নাম মুবারকও মু'জিযা। 'মুহম্মদ' নাম দাদা আবদুল মুত্তালিবকে ফেরেশতা শিখিয়েছিলো। জন্মের পরে নয়, এ মুবারক নাম আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির আদিতেই ঘোষণা করেছেন। হযরত আদম আলায়হিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার আরশের পাশে এ নাম লেখা দেখেছেন। হযরত নূহ আলায়হিস সালাম–এর কিশ্‌তী এ নামের বরকতে পূর্ণতা লাভ করেছে। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম 'আহমদ' নাম নিয়ে দু'আ করতেন। কোন নবী এবং কোন মানুষের নাম এতো উত্তম ও সার্থক নয়। 'মুহাম্মদ' সত্য অর্থই প্রশংসিত। 'আহমদ' নামও 'সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী' হিসাবে সর্বে সত্য।

সূর্যের রশ্মি যেমন বরফ গলিয়ে দেয় 'মুহম্মদ' নাম তেমনি কাফিরের পাষাণ হৃদয় গলিয়ে দেয় এবং ইসলাম কবূল করতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রিয়নবী (সা)–র নামের বরকতে কবরে মুক্তি এবং আখিরাতে নাযাত। যে ব্যক্তি 'মুহম্মদ' নাম ধরে গালমন্দ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। হুযূরের

www.pathagar.com

মু'জিযা চিরস্থায়ী। কুরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফ 'বুরহান' বা দলীল বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায়। 'নূর' দ্বারা বোঝা যায়।

দার্শনিক ও তার্কিক লোক হযরতকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। সাধারণ লোক চোখে দেখে। খৃষ্টান ধর্মযাজক বাহীরাহ্ হযরতকে চোখে দেখে এবং হযরত সালমান ফার্সী (রা) আকলবুদ্ধি খাটিয়ে চিনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কুরআন মজীদ এক অথৈ পাথার আর তাতে তাঁর প্রিয়নবী প্রসঙ্গ আরেক সীমাহীন ব্যাপার। মহাসিন্ধুর এক বিন্দু আলোচনা করলাম। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আল্লাহ্ মাফ করুন! আমীন।

www.pathagar.com

সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)–র অবদান

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, বিশ্ব মানবের মানোন্নয়ন এবং সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সুবিচার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ন্যায়বিচার কায়েম করার মহান আদর্শ পেশ করেছেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআন যে মূলনীতি ঘোষণা করেছে, তা হলো এই যে, 'যে কোন মূল্যে এবং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে সুবিচার কায়েম কর এমন কি যদি নিজের বা আত্মীয়–স্বজনের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তাও করতে হবে বিনা দ্বিধায়।' পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ 'হে মু'মিনগণ ! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও। যদিও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতা–আত্মীয়–স্বজনের বিরুদ্ধে এ জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তবুও যে কোন মূল্যে ন্যায়বিচার কায়েম করো।'

মহানবী (সা) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মহান আদর্শ পেশ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সুবিচার কায়েম করার বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। সাহাবী হযরত বশির ইবনে হাশিম (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের উপর দণ্ডায়মান করা হবে। যদি সে ন্যায়বিচার কায়েম করে থাকে তবে মুক্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি সে অবিচার করে থাকে তবে পুলসিরাত ধসে যাবে এবং সেই ব্যক্তি ৭০ বছরের রাস্তার নিম্নে পতিত হবে।" আর এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা সুবিচার কায়েম করার বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা সুবিচার ও পরোপকারের আদেশ দিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ-সম্পদ দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অশ্লীল অন্যায় কাজ সম্পর্কে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের নসিহত করেছেন হয়তো তোমরা এই নসিহত গ্রহণ করবে।"

এই আয়াতে 'ইয়া'মুরু বিল আদলে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সুবিচার কায়েম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর এই আদেশ প্রতিটি মুসলমানের প্রতিই। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে সুবিচার কায়েম করা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলেও ইরশাদ হয়েছে ঃ

"এবং যখন তোমরা জনসাধারণের বিরোধ মীমাংসা কর, তখন সুবিচার কায়েম কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অতি সুন্দর এবং অতি উত্তম নসিহত করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।"

সুবিচার কায়েম করা যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। 'লিয়াহ্‌কুমা বাইনান্নাস' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম করার দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এজন্যই তিনি সর্বদা ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেছেন, ন্যায়নীতি অনুসারে বিচার-মীমাংসা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সুবিচার কায়েম করার, ন্যায়নীতির মর্যাদা রক্ষা করার রীতিনীতি, পদ্ধতির তা'লিমও দিয়েছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সুবিচার কায়েম করতে উদ্বুদ্ধ করে ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়-বিচারক কাযীর সাথী।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "বিচারক যদি সত্য নির্ধারণে, ন্যায়ের উদ্ধারকল্পে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তাঁর চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি না করেন এবং যথার্থ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে রায় দেন তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তিনি সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবেন।"

পক্ষান্তরে, সুবিচার কায়েম না করলে তার পরিণাম যে অত্যন্ত শোচনীয় এবং মন্দ হবে এ কথাও ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "বিচারক

www.pathagar.com

তিন প্রকার আর তাতে দুই প্রকারই দোযখের আর এক প্রকার বেহেশতের। যারা জেনেশুনে অন্যায়–অবিচার করে, প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে রায় দেয়, আর যারা অন্যায় সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সত্বেও রায় দেয় তারা উভয়েই দোযখে যাবে। আর যে ন্যায়বিচারক, সে সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করে ন্যায়ভিত্তিক রায় দেয় সে বেহেশতী।" অতএব, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা হলো সুবিচারকের পবিত্র দায়িত্ব। বস্তুত এজন্যই আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কারো ফরিয়াদ বা অভিযোগ শ্রবণমাত্রই রায় দিতেন না বরং প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করতেন। এর পর ফরিয়াদীকে সাক্ষী হাযির করার নির্দেশ দিতেন। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন ঃ প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও অভিযোগ শ্রবণ সঠিক বিচার ও যথার্থ সত্য নিরূপণের অন্যতম উপায়। মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সম্মিলিতভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিচারক মনোনীত করেছিলেন এবং যে কোন বিষয়ে কোন প্রকার কলহ–দ্বন্দ্ব, বিবাদ–বিসম্বাদের সূত্রপাত হলে তার মীমাংসা করতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে সর্বপ্রকারের মোকদ্দমা পেশ করা হতো এবং তিনি আল্লাহ্‌র কুরআন মুতাবিক তাতে রায় দিতেন।

আধুনিক জগতে যেমন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায়সমূহ সংরক্ষিত এবং সংকলিত হয় যাতে করে পরবর্তীকালে উক্ত বিচারালয়ে বা নিম্ন আদালতে অনুরূপ মোকদ্দমা হলে পূর্ব সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা যেতে পারে, তেমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে পেশকৃত মোকদ্দমাগুলোর রায়ও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হয়েছে। সাধারণত হাদীসগ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু মুসলিম মনীষিগণ শুধু তাতেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রায়সমূহের স্বতন্ত্র সংকলনও প্রকাশ করেছেন। এ পর্যায়ে দু'টি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম জহিরুদ্দীন সঙ্গী–তানী হানাফী (মৃত্যুঃ ৫০৬ হিঃ) কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ যার নামকরণ করা হয়েছে 'কজিয়াতুর রাসূল (সা)' অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

রায়সমূহ। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটির সংকলক হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে ফজলুল মালেকী আলকরতবী।

বিভিন্ন সময়ে যে জটিল মোকদ্দমা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হয়েছে এবং তিনি সেগুলো সম্পর্কে যে রায় দিয়েছেন, সেসব রায় সংরক্ষিত এবং লিপিবদ্ধ হয়েছে উভয় গ্রন্থে। একজন সুদক্ষ বিচারক হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর গৌরবময় ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায় এই গ্রন্থসমূহ দ্বারা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে মহান আদর্শ পেশ করেছেন, তা যেমন অতুলনীয় তেমনি চির অনুকরণীয়। এ পর্যায়ে দুটো ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বনি মখজুম গোত্রের একজন মহিলাকে চুরির অপরাধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির করা হলো। তিনি চুরির শাস্তি হিসেবে হস্ত কর্তনের আদেশ দিলে তার সমীপে সেই মহিলাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা হিসেবে রেহাই দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ্র শপথ করে বলেছেন ঃ 'যদি আমার কন্যা ফাতিমাও এই অপরাধ করতো, তবে আমি তাকেও অনুরূপ শাস্তি দিতাম।'

আর একবারের একটি ঘটনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে জনৈক ইহুদী একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে নালিশ করলে তিনি সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সেই ইহুদীর পক্ষে রায় দিয়ে সুবিচার কায়েম করার ক্ষেত্রে এক অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

বিশ্বনবী (সা)–র চরিত্রশোভা

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মহান চরিত্রের অধিকারী, সুন্দর ও মার্জিত স্বভাবের প্রতিচিত্র। মহানবী (সা)–র চরিত্র সকলের জন্যে নমুনা ও আদর্শ চরিত্র। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ আর আপনি তো মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। –সূরা কলম ঃ ৪

মহানবী রাসূল (সা) বলেন ঃ 'শিষ্টাচার, মার্জিত আচরণ ও উত্তম চরিত্রসমূহের সমাপন ও পরিপূরণের উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।'

বিশ্বনবী (সা)–র চরিত্র হচ্ছে কোমল, উদার ও অতিসুন্দর। কর্কশ, কঠিন ও শিষ্টাচার বর্জিত ব্যবহার মহানবী (সা) থেকে প্রকাশ পায়নি। পরনিন্দা, অশ্লীল ও অশিষ্ট বাক্য তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্র রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো। –সূরা আল–ইমরান ঃ ১৫৯

মহানবী (সা) কারো মনে কষ্ট দিতেন না,কারো সাথে অভদ্র আচরণ করতেন না, উচ্চ স্বরে বা শোরগোল করে কথা বলতেন না। তাওরাত কিতাবেও মহানবী (সা)–র এসব গুণের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন (বুখারী শরীফ, প্রথম খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সাহাবীদের সাথে মহানবী (সা) খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করতেন। সাহাবীদের মনোরঞ্জনের জন্যে বাস্তব হাসি–উপহাসও করতেন। তিনি বলতেন ঃ 'বাস্তব কৌতুকে কোন দোষ নেই।' আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রফুল্লচিত্ত, উদার ও হাস্যরসপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।' উল্লেখ্য যে, মহানবী (সা)–র ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসাধারণ গাম্ভীর্যও ছিল। মহানবী (সা)

www.pathagar.com

বলেন, 'এক মাসের দূরত্ব পর্যন্তও আমার প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা লোক প্রভাবিত হতো। এভাবে আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন।' মহানবী (সা)-র হাসি-উপহাস হতো অর্থপূর্ণ।

একবার মহানবী (সা) তাঁর ফুফু হযরত সফিয়্যা (রা)-কে উদ্দেশ করে বললেন ঃ কোন বুড়ো মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তা শুনে হযরত সফিয়্যা (রা) বিষণ্ন হৃদয়ে ফিরে যেতে লাগলে মহানবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ 'বুড়ো মহিলা জান্নাতে যাবে না' এ কথাটির ব্যাখ্যা হলো-আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি ওদের সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। ওদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিণী ও সমবয়স্কা।'

-সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৩৫-৩৭

একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-র কাছে সওয়ারির উদ্দেশ্যে একটি উট চাইলে তিনি বললেন ঃ আরোহণের জন্যে আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দিব। সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করবো? মহানবী (সা) বললেন, সকল উটই প্রথমে বাচ্চারূপে জন্মায়।

একজন মরুবাসী যাঁর নাম 'উযায়হর' (রা)। মহানবী (সা) তাঁকে ভালবাসতেন, সে গ্রাম থেকে মদীনায় এলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্যে উপহার সাথে করে আনতো। শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাকে উপহার দিতেন। একবার উযায়হর (রা) তাঁর কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মদীনার বাজারে এলেন এবং বাজারে পণ্য বিক্রয় করছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) সন্তর্পণে পিছন থেকে এসে উযায়হরের চোখে হাত রেখে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন। উযায়হর (রা) প্রথমে চিনতে না পেরে হাউমাউ করে বলতে লাগলো, 'কে হে, আমাকে ছেড়ে দাও।' এদিকে মহানবী (সা) কৌতুক করে বললেন-এ দাসটি কে ক্রয় করবে ? উযায়হর (রা)-এর সাথে কৌতুককারী ব্যক্তি যে স্বয়ং মহানবী (সা) এবার সে তা উপলব্ধি করতে পারলো। তাই উযায়হর (রা) বললেন, আমার মতো অধমকে কেইবা ক্রয় করবে, আর আপনি আমাকে বিক্রয় করে কি পাবেন ? আমার মূল্যই বা কত হবে ? মহানবী (সা) বললেন, উযায়হর ! আল্লাহ্র নিকট কিন্তু তোমার অনেক মূল্য।

www.pathagar.com

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সফরসঙ্গিনী হলাম। তখন আমি খুব একটা মোটাসোটা ছিলাম না। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাথীদের বললেন, তোমরা অগ্রগামী হও, তাঁরা সামনে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা কিছু দূর গেলে পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দৌড় প্রতিযোগিতার আহবান জানালেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। প্রতিযোগিতায় আমি জিতে গেলাম। মহানবী (সা) আমার বিজয় মেনে নিলেন। আমার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার দেহও কিছুটা মোটা হলো। অন্য আরেক সফরে অনুরূপভাবে মহানবী (সা) আমাকে দৌড় প্রতিযোগিতার আহবান জানালে আমি তাতে রাযী হলাম এবং দৌড় হলো। এবার প্রতিযোগিতায় মহানবী (সা) বিজয়ী হলেন। আমি হলাম পরাজিত। মহানবী (সা) হেসে বললেন, এবার পূর্ব প্রতিযোগিতার শোধ নওয়া হলো।

হযরত আয়েশা (রা) আরেকটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেন। একবার আমি পায়েশের মতো এক রকম খাদ্য তৈরি করে মহানবী (সা)-র সমীপে উপস্থিত করলাম। তখন উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা) আমাদের মধ্যখানে উপবিষ্ট ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌র একপাশে আমি আর একপাশে ছিলেন সাওদা। আমি সাওদাকেও পায়েশ খেতে বল্লাম কিন্তু তিনি খেতে সম্মত হলেন না। আমি বললাম, খেতে হবে, নতুবা আমি পায়েশ মেখে দেবো, তবুও তিনি আহার করতে রাযী হলেন না। আমি ঠিকই তাঁর মুখমন্ডলে পায়েশ মেখে দিলাম। মহানবী (সা) আমার কান্ড উপভোগ করে হাসলেন। অতঃপর সাওদাকে বললেন, তুমিও এর প্রতিশোধ নাও। তিনি আমার মুখমন্ডলে পায়েশ মেখে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের এই কান্ড দেখে হাসলেন।' মহানবী (সা) পরিজনদের সাথে এরূপ খোলাখুলি ও নিরহঙ্কার ব্যবহার করতেন।

মহানবী (সা) তিনটি কাজ থেকে নিজকে সব সময় বিরত রাখতেন-এক. লোক দেখানো কর্মকান্ড, দুই. অহংকার করা ও তিন. অনর্থক কাজ।

খাদ্যদ্রব্যের নিন্দা বা অতি প্রশংসা থেকে মহানবী (সা) নিজকে বিরত রাখতেন। কারো মনে আঘাত দেওয়া, কারো প্রতি জোরজুলুম করাকে মহানবী

www.pathagar.com

(সা) পাপ ও অপরাধ বলে গণ্য করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর (রা) আরব নিবাসী জনৈক ব্যক্তির ঘটনাও বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষ্য এই, 'হুনায়ন যুদ্ধে আমার পায়ে ছিল ভারী জুতো। ঘটনাক্রমে আমার পদচাপে মহানবী (সা)-র পায়ে আঘাত লাগলো। অন্যায়ের জন্যে মহানবী (সা) আমাকে কশাঘাত করলেন। আমি আমার অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হলাম এবং অনুশোচনায় রাত কাটালাম। ভোরে দেখি কেউ আমাকে সন্ধান করছেন। বললেন, অমুক ঘরে আছে কি? আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বের হলাম। মহানবী (সা)-কে দেখে আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে নির্বাক। মহানবী (সা) বললেন, গতকাল তোমাকে আমি কশাঘাত করেছি। তাই আজ আমি একটি বেতের পরিবর্তে আশিটি বেত নিয়ে এসেছি, তুমি এগুলো দিয়ে তোমার আঘাতের বদলা নাও। ওফাতের পূর্বে মহানবী (সা) তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, আমি যদি কাউকে কোন সময় আঘাত দিয়ে থাকি তবে সে যেন অবশ্যই সেই আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞ লোকদের থেকে বিমুখ থাকো।'

উক্ত আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত জিবরীল (আ) মহানবী (সা)-র কাছে এসে বললেন, আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ হচ্ছে যে, 'আপনার সাথে যে সম্বন্ধ ছিন্ন করবে আপনি তার সাথে সম্বন্ধ জোড়বেন, আর যে আপনাকে বঞ্চিত করবে আপনি তাকে দান করবেন, অনুগ্রহ করবেন, আর যে ব্যক্তি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে আপনি তাকে ক্ষমা করবেন।' মহানবী (সা) বলেন, 'মু'মিনের আচরণ যতক্ষণ না অনুরূপ হবে ততক্ষণ সে প্রকৃত মু'মিন হবে না।'

একবার জনৈক মরুবাসী মহানবী (সা)-র পবিত্র গলায় চাদর পেঁচিয়ে টানতে লাগলো। ফলে মহানবী (সা)-র গলায় ফাঁস পড়ার উপক্রম হলো। সে বললো ঃ হে মুহাম্মদ (সা) আমাকে কিছু দাও, রসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে ফিরে হেসে হেসে তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

একবার এক মরুবাসী মসজিদে প্রস্রাব করতে লাগলো। উপস্থিত সাহাবিগণের কেউ তাকে মারধর করতে চাইলে মহানবী (সা) তাঁদের এরূপ

www.pathagar.com

করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, তাকে মারধর না করে প্রস্রাবের পর পানি এনে মসজিদ পরিষ্কার করো, (কারণ সে অজ্ঞ। মসজিদের আদব জানে না) তোমরা মানুষের প্রতি সরল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছো, কঠোর ব্যবহারের জন্যে নয়।

কয়েকজন ইহুদী একবার মহানবী (সা)-র নিকট এসে ধূর্তামি করে 'আস্সালামু আলাইকুম'-এর পরিবর্তে 'আস্সামু আলাইকুম' বললো, যার অর্থ 'তোমার মৃত্যু হোক।' উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা তাদের এ চালাকির উত্তরে বললেন-তোমাদের মৃত্যু হোক, আর বর্ষিত হোক তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত ও ক্রোধ। মহানবী (সা) বললেন : হে আয়েশা! থামো, কঠোরতা ও কটুবাক্যের পরিবর্তে নম্রতা অবলম্বন করো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ইহুদী কি বলছে তা কি আপনি শুনেননি ? মহানবী (সা) বললেন, আমি উত্তরে বলেছি, তোমাদের মৃত্যু হোক, এটা কি তুমি শুননি ? আমার দোয়া আল্লাহ্‌র নিকট কবূল হবে কিন্তু ওদের দোয়া কবূল হবে না (এটাই যথেষ্ট)। এক মন্দ স্বভাবের লোক একবার মহানবী (সা)-র নিকট আসতে দেখে মহানবী হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আগন্তুক ব্যক্তিটি মন্দ লোক বটে, কিন্তু সে এলে পর মহানবী (সা) হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, ভাল ব্যবহার করলেন, খোলাখুলিভাবে তার সাথে আলাপ করলেন। লোকটি চলে গেলে হযরত আয়েশা মন্দ লোকের সাথে এরূপ ব্যবহারের হেতু জানতে চাইলে মহানবী (সা) বললেন, হে আয়েশা ! তুমি আমাকে কবে উগ্র-কঠোর পেয়েছো এবং দুর্বাক্য ব্যবহার করতে দেখেছো, মন্দ স্বভাবের জন্যে যাকে লোকে বর্জন করে আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই অধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

মহানবী (সা)-র দয়া, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আরো অনেক ঘটনা রয়েছে, নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হলো।

যে কথায় সওয়াবের আশা করা যায় না এরূপ কোন কথা বলা থেকে মহানবী (সা) বিরত থাকতেন। কোন ব্যক্তি কথায় এবং প্রশ্নে কর্কশ হলে অসঙ্গত আচরণ করলে মহানবী (সা) ধৈর্যের সাথে সহ্য করতেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। মহানবী (সা)-র মজলিসে কেউ কথা বললে ধৈর্য

www.pathagar.com

সহকারে সবাই তা শুনতেন। তাঁর কথা শেষ না করা পর্যন্ত অন্য কেউ তাঁর কথা কেটে কথা বলতো না। মহানবী (সা) নিজের জন্যে রাগ করতেন না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করা হলে এবং সত্য প্রত্যাখ্যাত হলে তখন তিনি রাগান্বিত হতেন এবং তখন প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকে কেউ বিরত রাখতে পারতো না।

গোত্র বা সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি সম্মান দিতেন এবং সেরূপ ব্যক্তিকে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করতেন। মহানবী (সা) সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাঁদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। সাথীদের কেউ দূরে থাকলে তাঁর জন্যে দোয়া করতেন, খোঁজখবর নিতেন। কেউ পীড়িত হলে মহানবী (সা) তাঁকে দেখতে যেতেন, লোকের মাধ্যমে জনসাধারণ কি পরিস্থিতিতে আছেন তা অবহিত হতেন। জনহিতৈষী ও মঙ্গলকামী ব্যক্তিবর্গ মহানবী (সা)-র কাছে উত্তম লোক বলে বিবেচিত হতেন এবং পরোপকারী ও মানবদরদী লোকদের মহানবী (সা) সমধিক মর্যাদা দিতেন। মহানবী (সা)-র মজলিসে উঠতে-বসতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হতো। মহানবী (সা) কোন মজলিসে পৌঁছলে মজলিসের প্রান্তে যেখানে স্থান শূন্য থাকতো তিনি বিনাদ্বিধায় সেখানে বসে পড়তেন। কাউকে কষ্ট দিয়ে, ডিঙিয়ে মজলিসে স্থান গ্রহণ করা থেকে তিনি বিরত থাকেতেন। সাহাবীদেরকেও তিনি এ নীতি অনুসরণ করতে বলতেন। মজলিসে উপস্থিত সকলকে তিনি মর্যাদা দিতেন। সকলের সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যে, প্রত্যেকে মনে করতেন যে, আমাকে সর্বাধিক সম্মান দেওয়া হলো।

একবার মহানবী (সা)-র পরিধানে একটি চাঁদর ছিল। একজন সাহাবী মহানবী (সা)-র কাছে চাদরটি চাইলেন। তিনি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চাদরখানা সে সাহাবীকে দিয়ে দিলেন।

ইনসাফ ও অধিকারের বেলায় মহানবী (সা)-র কাছে ছিল সকলেই সমান। মহানবীর মজলিস ছিল ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রমের প্রতীক। মজলিসে কোন অভদ্রজনোচিত ব্যবহারে কোন উচ্চবাক্য ও বিতর্ক স্থান পেত না। মহানবী (সা) যখন কথা বলতেন উপস্থিত সকলেই তা নত মস্তকে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে

www.pathagar.com

শুনতেন। মনে হত যেন তাঁদের মাথায় কোন পাখি বসে রয়েছে। মজলিসে সাহাবীদের কেউ কথা আরম্ভ করলে সকলে মনোযোগের সাথে তা শুনতেন। তাঁরা হাসলে মহানবী (সা)-ও হাসতেন, তাঁরা কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

মহানবী (সা) সদা প্রফুল্ল এবং হাস্যমুখ থাকতেন। তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একরাতে আমার ঘরে আসলেন এবং আমার সাথে একই লেপে একই শয্যায় শয়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা) আমাকে বললেন ঃ 'আয়েশা ! আমাকে যেতে দাও, আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি।' অতঃপর তিনি শয্যা ত্যাগ করে ওযূ করলেন এবং সালাত (নামায) আদায় করলেন, তারপর এতো কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর চোখের পানিতে পবিত্র সিনা ভিজে গেলো।

মহানবী (সা) রুকূ, সিজদা এবং সিজদা থেকে বসেও অনুরূপভাবে কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় ফজরের নামাযের সময় হয়েছে বলে সংবাদ দিতে আসলেন হযরত বিলাল (রা)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম-'হে আল্লাহ্র রসূল, আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা মার্জনা করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন কেন ? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এর জন্যে আমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত নয় কি ? আর আমি কাঁদবো না কেন ? আজই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্র যিক্র করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তো এ নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।" —৩ ঃ ১৯০-১৯১

মহানবী (সা) স্ত্রী ও খাদিমগণকে কোনদিন প্রহার করেননি। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি একাধারে দশ বছর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করেছি। আল্লাহ্র কসম, আমি কাজ করলে, তুমি এরূপ কেন করলে! রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন

www.pathagar.com

সময় তা বলেননি। আর কোন কাজ না করলেও মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ করলে না কেন ?' হযরত আনাস (রা) আরো বলেন, একবার বিশেষ একটি কাজের নির্দেশ দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সে কাজ করতে কর্মস্থলে যেতে বললেন। আমি বলে দিলাম-আমি যাবো না। অথচ তখনও আমার ইচ্ছা যে, আমি যাবো। তারপর আমি বাজারে বালকদের সাথে খেলায় মগ্ন হয়ে পড়ি। হঠাৎ দেখি যে, পিছন দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সা) আমার বস্ত্র ধরে টানছেন এবং আদর করে বলছেন-'হে উনাইস ! তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে যাও।', আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যাচ্ছি।

মহানবী (সা)-র ধৈর্যশক্তি ছিল অতুলনীয়। একবার হুনায়ন যুদ্ধে কয়েকজন মরুবাসী মহানবীর কাছে উপস্থিত হয়ে গনীমতের মাল হতে কিছু মাল তাদের দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন। তখন তাদের দেয়ার মতো কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মরুর একটি কাঁটাওয়ালা বৃক্ষের কাছে নিয়ে পৌছাল। এ সময় মহানবী (সা)-র পবিত্র চাদর কাঁটাতে আটকে পড়লো। এতেও মহানবী (সা) বিরক্তি প্রকাশ না করে বললেন, আমার চাদরখানা ফিরিয়ে দাও। জেনে রাখো, আমার কাছে যদি এ মরূদ্যান পূর্ণ গবাদিপশু থাকতো তবে তাও আমি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিতাম। মহানবী (সা) ছিলেন অসীম সাহসী, রণক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত। তিনি আরো ছিলেন অসাধারণ লজ্জাশীল। কোন বিষয়ে আনন্দিত হলে মহানবী (সা) আনন্দে চোখ আনত করতেন, হাঁচির উদ্রেক হলে মুখে হাত বা কাপড় দিয়ে তা রোধ করতেন।

মহানবী (সা) সু-আভাস ও শুভ লক্ষণ গ্রহণ পছন্দ করতেন। যেমন হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন কাফির দলপতি সুহাইল ইবনে 'আমর-এর আগমনী সংবাদ মহানবী (সা) জানলেন তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের ব্যাপার সহজ করা হয়েছে।' 'সুহাইল' শব্দ থেকে 'সুহ্হিলা' অর্থাৎ 'সহজ করা হয়েছে' এ শুভ আভাসটি মহানবী (সা) গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

কারো নাম অসুন্দর হলে মহানবী (সা) তা পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন। এ বিষয়ে বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা যায় : বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) বলেন, আমার পিতা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমীপে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, হযন অর্থাৎ দুঃখ। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন-'তোমার নাম 'সাহল' অর্থাৎ 'সহজ সরল"। তিনি নাম পরিবর্তনে অসম্মতি জানিয়ে বললেন, 'আমার পিতার রাখা নাম পরিবর্তনে আমি রাযী নই। ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) বললেন : এ জন্যে আমাদের পরিবারে দুঃখ-দৈন্য নিত্য সাথী হয়ে থাকলো।

মহানবী (সা) পরামর্শ গ্রহণের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি নিজে বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'সাথীদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চেয়ে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।' মহানবী (সা) সম্পর্কে কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে :

'এবং সে মনগড়া কথা বলে না, এ তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' -৫৩ : ৩-৪

মহানবী (সা) যখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন তাতে বোঝা যায় অন্যদের বেলায় এর প্রয়োজন কত অধিক, গুরুত্ব কত অপরিসীম তা বলার প্রয়োজন রাখে না। পরামর্শ করাকে মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করা বা এতে নিজের বুদ্ধির অপরিপক্কতার ধারণা পোষণ করা জ্ঞানী লোকের পক্ষে সমীচীন নয়। কেননা, পরামর্শ করা দু'কারণে উপকারী ও মঙ্গলজনক। এক. কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উক্ত বিষয়ের ভালমন্দ নির্ণয়ে দ্বিধা থাকলে পরামর্শ করা দ্বিধা মুক্তির ব্যাপারে সহায়ক হয়। দুই. কোন কাজের প্রতি আগ্রহ জাগলে তার মন্দ দিকগুলো অনেক সময় দৃষ্টির আড়ালে থাকে। পরামর্শ করলে অজানা দিকগুলো স্পষ্টরূপে সামনে আসে এবং উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ ও মঙ্গলজনক হয়।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) মানুষের দোষত্রুটি গোপন রাখতেন। ছিদ্রান্বেষণ তিনি পসন্দ করতেন না। তিনি বলতেনঃ 'যে মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করবে আল্লাহ্ও তার ছিদ্রান্বেষণ করবেন অর্থাৎ তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন। আর যে মানুষের দোষত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ্ও তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। কোন কথা বা কাজ অপসন্দ হলে মহানবী (সা)-র মুখমন্ডলে তার লক্ষণ দেখা যেতো। কারো সাথে তিনি মন্দ ব্যবহার করতেন না। কারো কাজ বা ব্যবহার অপসন্দ হলে মহানবী (সা) তার নাম উহ্য রেখে সাধারণত বলতেন, 'যারা এ কাজ করলো বা যারা এরূপ বলে তাদের কি হয়েছে।' মন্দ দ্বারা মন্দের প্রতিশোধ গ্রহণ মহানবী (সা)-র নীতি ছিল না। বরং ক্ষমাসুন্দর ব্যবহারই ছিল মহানবী (সা)-র চরিত্র বৈশিষ্ট্য। সুমামা ইবনে উসাল মহানবী (সা)-কে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। পরে ধৃত হয়ে মদীনায় এলে রসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অনুরক্ত হন।

একবার লবীদ ইবনে আসম নামক এক ইহুদী মহানবী (সা)-কে যাদু করে। আল্লাহ্র ফেরেশতাদের সহায়তায় মহানবী (সা) যাদু থেকে উদ্ধার পান। কিন্তু মহানবী (সা) লবীদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবহার করেননি।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে মহানবী (সা) যে ব্যবহার করেছেন তা অতুলনীয়। তার জানাযার সালাত (নামায) আদায় করেছেন। তাকে নিজের জামা মুবারক প্রদান করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-র জননী হিন্দ বিনতে উৎবা ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-র সাথে যে পৈশাচিক ব্যবহার করেছে তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা) তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন এবং মহানবী (সা)-র এ ক্ষমাসুন্দর ব্যবহারে তিনিও মুগ্ধ না হয়ে পারেননি।

মহানবী (সা)-র স্বভাব ছিল নম্র কোমল। চিত্ত ছিল প্রশস্ত, ব্যবহারে তিনি উদার। সাহাবী ও পরিজনদের কেউ মহানবী (সা)-কে সাহায্যের জন্যে আহ্বান জানালে মহানবী (সা) সে আহ্বানে সাড়া দিতেন। তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। মহানবী (সা) সাহাবীদের সাথে খোলাখুলিভাবে মিশতেন। শিশুদের

www.pathagar.com

সাথে ব্যবহারেও তিনি উদার ছিলেন। তাদের সাথে হাস্য-পরিহাস করতেন। শিশুদের সঙ্গে করে নিজ ঘরে নিয়ে যেতেন, নিজের সঙ্গে বসাতেন। হযরত আব্বাস (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্ (রা) প্রমুখকে মহানবী (সা) বলতেন, তোমাদের মধ্যে আমার কাছে যে আগে পৌছবে তাঁকে আমি পুরস্কার দেবো। তাঁরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। পুরস্কার গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরব-অনারব, সাদা-কালোর কোন পার্থক্য ছিল না, সবাইকে তিনি স্নেহ করতেন। সবাই মহানবী (সা)-কে ভালবাসতেন। হযরত সাইদ ইবনে হারিসা (রা) মহানবী (সা)-র দয়া ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আপন পরিজনের স্নেহ-মমতার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন মহানবী (সা)-এর সাহচর্যকে। মহানবী (সা) ইয়াতীম, বিধবা ও অসহায়দের সহায়ক ছিলেন। কোন ক্রীতদাসীও যদি তার কোন দুঃখ বলার জন্যে মহানবী (সা)-কে গলির একপ্রান্তে নিয়ে যেতে চাইতো, তাতেও মহানবী (সা) সাড়া দিতেন। কেউ পীড়িত হলে তিনি তাকে দেখতে ও খোঁজ-খবর নিতে যেতেন। কুশল জিজ্ঞেস করে তার জন্যে দু'য়া করতেন। মৃত ব্যক্তির জানাযায় মহানবী (সা) শরীক হতেন। কেউ চুপে চুপে কোন কথা মহানবী (সা)-কে বলতে ইচ্ছা করলে তিনি তাতে কোন আপত্তি করতেন না এবং আলাপকারী ব্যক্তি পবিত্র কানের কাছ থেকে তার মুখ না সরানো পর্যন্ত মহানবী (সা) ধৈর্যের সাথে কান পেতে তার কথা শুনতেন। বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। কেউ মহানবী (সা)-র সাথে হাত মিলালে স্বেচ্ছায় হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত মহানবী (সা) হাত সরাতেন না। আগন্তুক ও সাক্ষাতকারীকে তিনি আগে সালাম দিতেন। সাহাবীদের সাথে মহানবী (সা) আগে হাত মিলাতেন। তিনি সাহাবীদের সামনে পা লম্বা করে বসতেন না। কেউ মহানবী (সা)-র নিকট এলে তিনি তাঁর সম্মানে নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে বলতেন এবং নিজের পাশ-বালিশ তার দিকে এগিয়ে দিতেন। সে সংকোচ বোধ করলে মহানবী (সা) তাকে ইসরার (পুনঃ পুনঃ বলে) করে বসাতেন। সালাত (নামায) রত অবস্থায় কোন সাক্ষাতপ্রার্থী এলে মহানবী (সা) সালাত সংক্ষিপ্তভাবে পড়ে আগন্তুকের কুশল জিজ্ঞেস করতেন, তার উদ্দেশ্য অবহিত হতেন। আলাপ সমাপ্ত হলে এবং আগন্তুকের

www.pathagar.com

আবশ্যক পূরণ হলে মহানবী (সা) পুনরায় সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সালাতরত অবস্থায় কোন শিশুর কান্না শ্রুত হলে মহানবী (সা) নামায সংক্ষেপে পড়তেন, যাতে মায়েরা আপন শিশুদের খোঁজ-খবর নিতে সক্ষম হন। মানুষের প্রতি মহানবী (সা)-র দয়া ও স্নেহ ছিল অপরিসীম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

'আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' -(সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭

মহানবী (সা) বলতেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা, বান্দার মতই আমি আহার করি এবং বান্দার ন্যায় আমি বসি। তিনি গাধার পিঠেও সওয়ার হতেন। কোন আচ্ছাদক ব্যতীত সওয়ারীর মুক্তপৃষ্ঠেও তিনি আরোহণ করতেন। সওয়ারীর পিঠে মহানবী (সা)-র সাথে অন্যকেও বসতে দিতেন। বিনয়বশত কোন কোন সময় তিনি মাটির উপরও বসতেন। সর্বপ্রকার শুভ কাজে ডান হাত এবং ডান দিক থেকে আরম্ভ করা মহানবী (সা) পসন্দ করতেন। মিসওয়াক মহানবী (সা)-র প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি সুর্মা ব্যবহার করতেন। ইসমিদ নামক সুর্মা ভালবাসতেন। নিজ হাতে বকরির দুধ দোহন করতেন, জুতো সেলাই করতেন, কাপড় রিফু করতেন, উটকে ঘাস খাওয়াতেন, ঘরের পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘরে থাকতেন তখন তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সেলাই ও রিফুর কাজ করতেন। কোন সময় কোন অভাবী লোকের জুতো সেলাই করে তাকে সাহায্য করতেন। কোন সময় কোন বিধবার বস্ত্র সেলাই করে দিতেন। মহানবী (সা) বাজার থেকে নিজে পণ্য ক্রয় করে তা বহন করে আনতেন। তিনি সুগন্ধ দ্রব্যকে ভালবাসতেন। অন্যকেও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহারের উৎসাহ দিতেন। শুক্ক ও আম্বর জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্য মহানবী (সা) পসন্দ করতেন। সাহাবীদের মহানবীর আগে চলার নির্দেশ দিতেন। পার্থিব সম্পদের প্রতি মহানবী (সা)-র কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। তিনি ওফাতের সময় কোন দিরহাম দীনার রেখে যাননি। পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনে মহানবী (সা)-র লৌহবস্ত্র তিরিশ সা যবের বিনিময়ে অন্যের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল। মহানবী (সা) বলতেন ঃ

www.pathagar.com

কোনমতে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারলেই হলো। ছাঁকা আটা তিনি আহার করতেন না।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন সময় ছাঁকা আটা আহার করেননি। প্রেরিত হওয়ার পর থেকে ওফাত পর্যন্ত মহানবী (সা)-র জীবন যাত্রার এ ধারা অপরিবর্তিত ছিল। মহানবী (সা) বলেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক ? দুনিয়াতে আমার অবস্থান সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে গ্রীষ্মে সফরকালে সামান্য প্রশান্তির জন্যে কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। ছায়া সরে গেলে সে এমনভাবে চলে গেল যে, সে গাছের নিকট আর কোনদিন ফিরে এলো না। একবার হযরত ফাতিমা (রা) মহানবী (সা)-র উদ্দেশে একটা রুটি নিয়ে উপস্থিত হলেন। মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ রুটি আনলে কেন মা ? হযরত ফাতিমা (রা) বললেন, এ রুটি আমি নিজ হাতে প্রস্তুত করেছি। মনে মানলো না, তাই আব্বা আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। মহানবী (সা) আহার করলেন এবং বললেন, এ রুটিই হচ্ছে প্রথম খাদ্যদ্রব্য যা তিন দিন পর আজ তোমার পিতা আহার করলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ 'এমনও হতো যে, পুরো মাসব্যাপী রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কোন ঘরে রুটি বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য রান্নার জন্যে আগুন জ্বালানো হয়নি।' তবে কি আহার করে আল্লাহ্‌র রসূল ও তাঁর পরিজন জীবন নির্বাহ করতেন ? আবূ হুরায়রাকে এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন-পানি এবং খেজুর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-'অনেক সময় একাধারে কয়েক রাত আহার করার মতো কিছু থাকতো না।' উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একবার হযরত আবূ বকর (রা) ছাগলের একটি রান আমাদের জন্যে পাঠালেন। আমি রাতের অন্ধকারে গোশত কেটে কেটে রসূলুল্লাহ (সা)-কে খেতে দিয়েছি। তখন তেলের সাহায্যে বাতি জ্বলতো। 'আপানাদের ঘরে তখন বাতি জ্বালানো হতো না ?' এ মর্মে কেউ প্রশ্ন করলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন-'তেল ক্রয়ের সামর্থ্য যদি থাকতো তবে আমরা তা দিয়ে অবশ্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতাম।' অনেক সময় মহানবী (সা) দু' রকমের খাদ্যদ্রব্য একসাথে আহার করেননি। গোশত থাকলে

www.pathagar.com

কেবল গোশত আহার করতেন, খেজুর থাকলে স্রেফ খেজুর আহার করেছেন, এর সাথে অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য যোগ করা হতো না।

বিশ্বনবী (সা)–র মহান চরিত্রের আকর্ষণেই সারা বিশ্ব মুগ্ধ হয়েছে, তিনি সারা বিশ্বের জন্যে উত্তম আদর্শ। বার্নার্ড শ বলেছেন ঃ 'বর্তমান অশান্ত বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ জীবিত থাকলে·তবে এক কাপ কফি পান করতে যেটুকু সময় দরকার ততটুকুন সময়ের মধ্যে তিনি এ বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান দিতে সক্ষম হতেন।'

www.pathagar.com

সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র

সৈয়দ আবদুস সুলতান

মূল্যায়নের জন্যে প্রথম প্রয়োজন মূল্যবোধ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম ও প্রধান দারিদ্র্য মূল্যবোধের অভাবজনিত। মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে অবশ্যই তাই কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করতে হয়।

কতক মানুষের পাকস্থলীতে যখন অহর্নিশ ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। অথচ সেই একই সময়ে যখন আর কতক মানুষের জন্যে উচ্চতর মানের জীবন-যাপন সম্ভব হচ্ছে, তখন চারিত্রিক মূল্যায়নের দর্শনে কর্ণপাত এবং মনোনিবেশ সঙ্গত কারণেই অবাস্তব দেখায়। কিন্তু এই অনস্বীকার্য পরিস্থিতিই আবার আমাদের মূল্যবোধহীনতার নির্ভুল প্রমাণ। সবার উপরে আল্লাহ্ সত্য এই মূল্যবোধ যদি আমাদের সকল কথা ও কর্মকে প্রভাবিত করতো তাহলে আমরা এই সার্বিক দুর্দশার শিকার হতাম না। মূল্যবোধহীনতার কারণেই আজ মানুষের নিজের হাতে গড়া, মানুষের রক্তের বিনিময়ে গড়া মানুষের দুঃখ আর ত্যাগে সৃষ্ট মানুষের সমাজে মনুষ্যত্বের এই অবমাননা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু বাঁচার জন্যেই মানুষ তার সমাজ গড়েছে। মনুষ্যত্বের ধ্বংসযজ্ঞে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে নয়। মানুষকে আজ তাই তার মূল্যবোধ ফিরে পেতে হবে। মূল্যবোধের অবলুপ্তি মানুষের আত্মাকে দ্রুত নিম্নগামী করে। শেষ পর্যায়ে তাকে এমন স্থানে নিয়ে যায় যেখানে তার ও ইতর প্রাণীর মাঝে কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

প্রভুত্ব-অভিলাষী, সাম্রাজ্যবাদী এবং উপনিবেশবাদী মানুষমাত্রই তাই যুগে যুগে যুদ্ধোত্তরকালে সর্বাগ্রে বিজিতদের মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। আমাদের ভূভাগে বর্তমান শতাব্দীতে একাধিকবার আমরা এর নমুনা দেখেছি। আমরা এমনি স্তরে পৌঁছে গেছি যেখানে আমরা অর্থের বিনিময়ে মানুষের চরিত্রের, মানুষের মর্যাদার, মানুষের মৌলিক অধিকারের ক্রয়-বিক্রয়ের ঘৃণ্য

www.pathagar.com

নাটক বার বার নির্দ্বিধায় অভিনীত হতে দেখে চলেছি। এ অভিনয়ের সম্পূর্ণ অবসান কবে হবে সে কথার জবাব কে দেবে?

এর চেয়েও অনেক বেশি অধঃপতিত এক সামাজিক পরিবেশে হযরত (সা)-এর জন্ম হয়েছিল। তাঁর স্বদেশ ও স্বসমাজের সবাই সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে প্রথমে তাঁকে যে কোন মূল্যে নিরস্ত করতে এবং ব্যর্থ হয়ে পরে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। ফলে তিনি তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের নিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে প্রণিধানযোগ্য যে, তাঁর যে কথা তাঁর স্বদেশবাসীরা গ্রহণ করতে পারল না সেই একই কথা সুদূর ইয়াস্‌রিবের অধিবাসীরা গ্রহণ করলেন। বক্তা এক, বক্তব্য এক, শুধু শ্রোতা ভিন্ন। এর একটি মাত্রই জওয়াব সম্ভব। তা হলো, তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়ন মক্কাবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, ইয়াস্‌রিবের অধিবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল। উভয় সমাজের উদ্দেশে তিনি একই কথা বলেছিলেন। তবে সেই সাথে তিনি একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন। সেই শর্তটি মক্কাবাসীদের পক্ষে বোধগম্য ছিল না এমন নয়। কিন্তু সেসব শর্তের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে যে নৈতিক সাহসের প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। আর ইয়াস্‌রিববাসীদের বুদ্ধি ও মানসিকতার তখনও অতটা অধঃপতন ঘটেনি, যার ফলে মানুষ শুধু পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে ভালবাসে, নতুনের মুকাবিলা করতে ভীত হয় এবং মনের অগ্রগতির পথে আপাতদৃষ্টিতে যে বিঘ্ন দৃষ্ট হয় তাকে বিভীষিকার চোখে দেখে। তাই তাঁরা হযরত (সা)-কে তাঁদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন এই দ্ব্যর্থহীন শর্তে যে, তাঁর কথা তাঁদের বিচারে উত্তম বলে উত্তীর্ণ হলে তাঁরা তা গ্রহণ করবেন। নিজেদের বিচার শক্তির উপর তাঁদের প্রত্যয় ছিল বলেই তাঁরা এই চ্যালেঞ্জ সেদিন গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। শুধু মূল্যবোধই মানুষকে এই সাহসিকতা দান করতে পারে। হযরত (সা)-ও তাঁদের কাছ থেকে সেদিন আর কোন কিছুর দাবি করেননি। তাঁর কথাকে শুধু এই কারণে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করতে হবে যে তা নবী (সা)-র বাণী, যা গ্রহণ না করলে তাদের উপর নৈসর্গিক মুসিবত নেমে আসবে-এমন কোন কথা

www.pathagar.com

তিনি তাঁদের বলেননি। সত্যকে শুধু এ কারণেই গ্রহণ করতে হবে যে তা সত্য। এমনি একটি বিরাট ঝুঁকি নিয়েই তিনি স্বদেশ ও পরিচিত পরিবেশের বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন। সত্য ও সুন্দরের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর এই অগাধ বিশ্বাস নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ানো এক অসাধারণ সাহসের পরিচয়। মানুষের ইতিহাসে, চিন্তার জগতে যতবার বিপ্লবের সার্থকতা সম্ভব হয়েছে ততবারই তার মূলে ছিল বিপ্লবীর এই আত্মপ্রত্যয়। Testing Pilate-রা বার বার কত বার 'সত্য আবার কাকে বলে' (What is truth) বলে ব্যঙ্গোক্তি করে চলে গেছেন। কিন্তু তাতে সত্যের এতটুকু ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু মক্কাবাসীদের জন্যেই হোক আর ইয়াসূরিববাসীদের জন্যেই হোক, কি বক্তব্য ছিল হযরতের? ইতিহাস তা অক্ষয় করে রেখেছে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার মাধ্যমে। মক্কাতে নও-মুসলিমদের উপর যখন অসহনীয় অত্যাচার চলছিল, তখন তাঁদের মাঝখান থেকে তিরাশি জনের একটি দল লোহিত সাগরের অপর তীরে খৃস্টান রাজ্য আবিসিনিয়াতে (বর্তমান ইথিওপিয়া) গিয়ে খৃস্টান রাজা নাজ্জাশীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অপরদিকে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে সমুচিত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল মক্কাবাসীদের একটি দল নাজ্জাশীর জন্যে প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে তাঁর রাজধানীতে উপস্থিত হলো। নাজ্জাশীর কাছে তারা নিবেদন করল যে, তাঁর আশ্রিত মক্কাবাসীরা সবাই এক নতুন ধর্মের নামে সমাজদ্রোহী ও দেশত্যাগের অপরাধে অপরাধী। তারা তাদের ফিরিয়ে নিতে এসেছে। নাজ্জাশী একান্ত কৌতূহলী হয়ে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, কেমন সেই ব্যক্তি যাঁর মোহ তাঁদের এমন অভিভূত করেছে যে তাঁরা নিজেদের দেশ, সমাজ এবং আপনজন ত্যাগ শ্রেয় ভেবে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্রিত নও-মুসলিমরা তখন বলেছিলেন : "হে রাজন! আমরা অজ্ঞানতা, পৌত্তলিকতা ও ব্যভিচারে কলঙ্কিত এক চরম নোংরামির জীবন-যাপন করছিলাম। আমাদের সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলছিল। এমন অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা) এসেছেন। আমরা তাঁকে তাঁর শৈশবকাল থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। তিনি সচ্চরিত্র, সত্যবাদী এবং সুনীতিনিষ্ঠ। তিনি আমাদের এক আল্লাহ্র উপাসনা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা, আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্প্রীতি রক্ষা এবং

www.pathagar.com

আতিথ্যের দায়িত্ব পালনে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের অসুন্দর, অপবিত্র ও ন্যায়নীতি বিবর্জিত সবকিছু পরিহার করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন প্রার্থনা করতে, উপবাস পালন করতে এবং দুঃখী ও আর্তের সান্ত্বনার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে। আমরা তাঁর অনুসারী হয়েছি বলে আমাদের দেশবাসী আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে এবং নতুন ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে সর্বপ্রকার জবরদস্তি শুরু করছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন?" আশ্রিত নও-মুসলিমরা সম্রাটের উদ্দেশে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশও পাঠ করেছিলেন, যাতে হযরত ঈসা ও তাঁর মা মরিয়ম সম্পর্কে সম্মান ও স্বীকৃতির কথা রয়েছে।

নাজ্জাশী তাঁর আশ্রিতদের বললেন, 'দেখছি, তোমাদের নবী তোমাদের সৎ ও সুন্দর শিক্ষাই দিয়েছেন। তোমরা তাঁর কথা শুনে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পদক্ষেপ নিয়েছ। তোমরা যতদিন প্রয়োজন নির্ভয়ে আমার রাজ্যে অবস্থান কর।" আর ক্রোধান্ধ এবং প্রতিশোধকামী মক্কাবাসীদের উদ্দেশে নাজ্জাশী বললেন, "তোমরা ফিরে যাও। এঁদের আমি আশ্রয় দিয়েছি । এঁদের আমি তোমাদের হাতে প্রত্যাবর্তন করব না" এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নবী (সা) মানুষকে এক মহত্তর জীবনের সাধনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর এই আহবান প্রথম থেকেই সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রকারে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উদ্দেশ্যমুক্ত ছিল। তাই তাঁকে অনুসারীদেরসহ ইয়াসরিবে যেতে হয়েছিল। তা না হলে, তিনি অবাধে স্বদেশ ও স্বসমাজে প্রথমে নেতৃত্ব নিয়ে নিতে পারতেন। পরে নিজের নেতৃত্বের প্রভাব প্রয়োগে মানুষকে স্বমতে আনতে সক্ষম হতেন। সে পথ তাঁর জন্যে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। ইচ্ছা করলেই তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন।

গোড়াতেই মক্কার শাসকগোষ্ঠী ব্যাপার বেশি দূর গড়াতে না দিয়ে হযরতের সাথে আপোস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে একটা বাস্তব পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে উতবা-বিন-রাবিহা হযরত (সা)-কে কাবাগৃহে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, 'বৎস, কুরায়শদের ভিতরে

www.pathagar.com

তোমার স্থান কোথায় তা তুমি নিজেই অবগত আছ। তোমার পূর্বপুরুষগণ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তোমার গোত্র শক্তিশালী ও শীর্ষস্থানীয়। তুমি তোমার স্বজনদের মনে প্রচন্ড আঘাত হেনে তাঁদের বিরক্তিভাজন হয়েছ। তুমি তাঁদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ এবং তাঁদের দেব-দেবীর অপমান করে তাঁদের ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করেছ এবং তোমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র বিশ্বাস ও ধর্মকে অস্বীকার করছ। তুমি যদি ধনসম্পদ চাও তাহলে তোমাকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনবান করবো। যদি সম্মান ও প্রতিপত্তির অভিলাষী হও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করবো। আমি স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমার অনুমোদন ছাড়া আমাদের কোনো কাজ হবে না। এমনি তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে আমাদের সম্রাট মনোনীত করবো।'

হযরত মুহাম্মদ (সা) বিনীতভাবে বললেন, 'হে অলিদের পিতা! দয়া করে আমার কথা শুনুন।' অতঃপর তাঁর নব প্রচারিত ধর্মের মূল কথা যার নিহিতার্থ কুরআন শরীফ-তা থেকে তেমন কিছু আয়াত আবৃত্তি করলেন । এভাবে মক্কাবাসীদের অভীপ্সিত আপোস-মীমাংসার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

এর কিছুকাল পরে মক্কার প্রধানগণ তাঁদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তাঁরা ভাবলেন হযরতের প্রতিপালক, অভিভাবক এবং সর্বাপেক্ষা বড় শুভানুধ্যায়ী আপন পিতৃব্য আবূ তালিবই হলেন তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের শক্তি ও সহায়তার উৎস। আবূ তালিব তখন বয়োবৃদ্ধ এবং নিজের বংশগত কারণে প্রভাবশালী। তিনি সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। নব প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসে অদীক্ষিত হলেও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি তাঁর প্রচারকার্য থেকে নিরস্ত্র করতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা তাই আবূ তালিবকে এক চরমপত্রে জানালেন যে, তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে অবিলম্বে তাঁর অবলম্বিত পথ থেকে ক্ষান্ত না করতে পারলে তাঁরা একসাথে তাঁদের উভয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন। বৃদ্ধ আবূ তালিব এতে স্বভাবতই বিচলিত বোধ করলেন। হযরতকে সবকিছু খুলে বলে তিনি তাঁকে তাঁর প্রচারকার্য থেকে

www.pathagar.com

বিরত হওয়ার জন্যে আবেদন জানালেন। তিনি অনুনয়ের সুরে বললেন, 'আরবের জনসাধারণ আজ আমার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ। তুমি নিজেকে এবং আমাকে রক্ষা কর।

বৃদ্ধ চাচার অসহায়তায় হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজেও স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত বোধ করলেন। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'আমাকে যদি ধ্বংস হয়ে যেতে হয় তবে তাই হোক। কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসে ও কর্তব্যে অটল থাকব এবং কোন মূল্যেই সত্যের পথ ত্যাগ করতে পারব না। তারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চন্দ্রও এনে দেয়, তবুও না।'

ভ্রাতুষ্পুত্রের সত্যাশ্রয়ী এবং অনমনীয় মনকে উৎসাহিত করার জন্যে বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি যা সত্য বলে বিশ্বাস কর, তা কর। আমি আর কখনো কোন অবস্থাতেই তোমাকে তা থেকে বিরত হতে বলব না।'

আলোচনার একই ধারায় অপর আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ্য। ৬২২ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে তাদের সবার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গেলেন। সুদীর্ঘ সাত বছর পর ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানদের উপর কুরায়শদের অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে মক্কার উপর অভিযান পরিচালনা করে বিজয়ী দশ সহস্র সৈন্যসহ মক্কাতে প্রবেশ করলেন। মক্কাবাসী সেদিন চূড়ান্তভাবে পরাজিত এবং প্রকৃতপক্ষে বন্দীদশায় অবনত মুখে তাঁর সম্মুখে অপেক্ষমান। তিনি তাঁদের সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আপনারা আমার কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার আশা করেন?' বন্দী মক্কাবাসীরা বলল, 'হে মুহাম্মদ, আপনি আমাদের একান্ত সহৃদয় ভ্রাতা এবং সহৃদয় ভ্রাতার সন্তান। আপনি আমাদের প্রতি আজ আপনার ইচ্ছানুসারে যে কোন রকম ব্যবহার করার অধিকারী।'

হযরত মুহাম্মদ (সা) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বসেন সেই আশংকায় হযরত উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহুর নবী, এদের জন্যে আমাদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল। এদের জন্যেই আমাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘদিন দূরে থাকতে হয়েছিল। এরা আমাদের নির্যাতন করেছে এবং অপমানিত করেছে। বিগত সাত বছরের

www.pathagar.com

অধিক কাল এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং বারবার সন্ধির শর্তসমূহ ভঙ্গ করেছে। আপনি আমাদের হুকুম দিন, আজ আমরা প্রত্যেকে নিজ হাতে যার যার আত্মীয়-স্বজনের শিরশ্ছেদ করে তার প্রতিশোধ নেব।'

বন্দীরা তখন মুহূর্ত গণনা করছিল।

হযরত তাঁদের সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা সবাই মুক্ত এবং স্বাধীন।'

প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্যে সেদিন যখন মক্কাবাসীরা বিজয়ী মুহাম্মদ (সা)-কে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন একবার তিনি ক্ষমার ন্যূনতম শর্ত হিসেবে তাঁদের ইসলামে দীক্ষিত হতেও প্রস্তাব দিলেন না। এই কথাটি মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি না করে পারেনি। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই তাই হযরতের এই ক্ষমা প্রদর্শন এবং সেই সাথে তাঁর দশ সহস্র সৈন্যের বিজিত শহরে সুনিয়ন্ত্রিত প্রবেশকে বিস্ময়পূর্ণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর অনুচরদের বাহিনী নিয়ে তায়েফের পথে অগ্রসর হলেন। সেখানে তাঁকে এক সুসংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর বিজয়ের গৌরব মুসলমানরাই অর্জন করলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজে আহত হলেন। তা সত্ত্বেও বিজিত শত্রু এবং অত্যাচারীদের প্রতি তিনি এত কোমল এবং সহৃদয় ব্যবহার করলেন যে, তাঁর অনুসারীদের অনেকে তাতে আপত্তি উত্থাপন না করে পারলেন না। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁদের শান্ত হতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাঁদের মহানুভবতা দেখাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁরা নবীর কথা মানলেন। কিন্তু অনেকে চোখের পানি না ফেলে পারলেন না। তাঁরা চোখের পানি ফেলেছিলেন দু'টি কারণে-চরম উত্তেজনার মুহূর্তে নবীর তুলনাহীন মহানুভবতা তাঁদের অভিভূত করেছিল। আর নবীর ইচ্ছা ও আদেশে তাঁরা সেসব মানুষের জন্যে তরবারি কোষমুক্ত করতে পারলেন না, যাঁরা তাদেরই চোখের সামনে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-র দেহে নির্মম আঘাত হেনেছিল।

পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুতে হযরতের চারিত্রিক শক্তির বিকাশ চিন্তাশীল মানুষকে বিস্মিত না করে পারে না। সেদিন সূর্যগ্রহণ হল। ভক্তেরা বললেন,

www.pathagar.com

'রসূল (সা)-এর পুত্র বিয়োগে সমবেদনা প্রকাশের জন্যেই আজ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ।'' হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ব্যাপারে শুধু নীরবতা অবলম্বন করে থাকলেই মানুষের মনে-অন্তত চিরদিনের জন্যে কতক মানুষের মনে তো অবশ্যই-তাঁর সম্পর্কে তেমন একটি ধারণার সৃষ্টি হতে পারত, যাকে মূলধন করে অনেক মানুষ পৃথিবীতে অসাধারণ বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন কিন্তু তিনি নীরব রইলেন না। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, 'সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এসব ব্যাপার প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর সাথে এ সবের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই।' টলেমী, কোপারনিকাস প্রমুখ যদি হযরতের সমসাময়িক হতেন তাহলে এ বৃত্তান্ত শোনার পর অবশ্যই তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে একটিবার চোখ মেলে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। সঙ্গতভাবেই তাঁরা ভাবতেন, ধর্মের বাণী প্রচারমাত্র যে মানুষকে আকাশ এমনভাবে সাহায্য করতে হাত বাড়ায়, সে সাহায্যের হাত যিনি এত সহজে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি কেমন মানুষ? এই কৌতূহল অবশ্যই তাঁদের চিন্তায় আলোড়ন এনে দিত। অবশ্যই তাঁরা ভাবতেন, বাহ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরেও তাহলে সত্য বলে আরো কিছু আছে। অনুধাবনের প্রয়োজন বোধ করতেন যে, কায়াহীন সত্যও হতে পারে এবং সে সত্য মানুষের নাগালের বাইরে নয়। সে সত্যের জন্যে সংগ্রাম করা তাই অর্থহীন নয়। সে সত্যের জন্যে আত্মত্যাগ মানবসমাজকে মহত্ত্বর লোকে উন্নীত করারই সাধনা।

মানুষের মনে একটি সহজ প্রবণতা আছে, যা তাকে অপরকে ভালবাসতে, অপরের জন্যে অভাবনীয় ত্যাগ স্বীকারে, অপরকে ভক্তি করতে এমন কি অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি বিশেষকে পূজা করতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেক বুদ্ধিমান সুচতুর এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ তাদের গুণগ্রাহীদের এই প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। এটাও আবার মানুষেরই আর একটা দুর্বলতা। এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে যিনি না উঠতে পারেন তিনি কোন ব্যাখ্যাতেই সত্যাশ্রয়ী হতে পারেন না। হযরত মুহাম্মদ (সা)-র চরিত্রের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে আমরা দেখতে পাই, তিনি একান্তভাবে এ সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর গুণগ্রাহী ভক্তরা যেন তাঁকে অতিমানব ভেবে অবনমিত আত্মা নিয়ে তাঁর পূজা না করে এই চিন্তাতেই তিনি বার বার ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই একটি কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, তিনি একজন সহজ স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন এবং নবী হওয়া

www.pathagar.com

সত্ত্বেও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারে তিনি মানুষই ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বরং আরো কিছু দূর এগিয়ে গেছেন এবং বলেছেন যে, আর সবার মত তিনিও প্রথমে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং অতঃপর তিনি তাঁর রসূল। অবিশ্বাসীরা যখন এই বলে যুক্তি দেখাল যে, তিনি যদি আল্লাহ্‌র রসূলই হবেন তাহলে আর দশজন মানুষের জীবন-যাপন আর তাঁর জীবন-যাপন প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য নেই কেন? তাঁর দৈনন্দিন জীবনও তো আর সবার মত আহার, নিদ্রা এবং আর দশটা সাংসারিক কাজকর্মের তালিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জওয়াবে নবী (সা) বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন আমাকে যেহেতু মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তস্থল করা তাঁর উদ্দেশ্য, তাই আমাকে তিনি সকল মাপকাঠিতে মানুষের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আমি যদি কোন জীবের জন্যে নবী হতাম তাহলে জীবন-যাপন প্রণালীর বিচারে আমাকে সেই জীবের পর্যায়ভুক্ত করা হতো, যেন তারা তাদের চলার পথে আমার থেকে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্তসমূহ লাভ করতে পারে।

বস্তুত জীবনে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে থাকার জন্যে মহানবীর সাধনা ও সংগ্রামের কথা ভাবতে গেলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। জীবনে বারবার বহু প্রকারে তাঁর সমাজে ও কালে প্রধানদের প্রচলিত একাধিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা-লাভের নিশ্চিত সুযোগ তাঁর জন্যে এসেছে কিন্তু প্রতিবারই তিনি সে সুযোগ একই নির্মল অনীহার সাথে নীতিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের সমাজই বৃহত্তম সমাজ। সেই সমাজের সমস্যার সমাধানই মানবজীবনের সমস্যার সমাধান। সেই সমস্যার স্বল্প পরিসর ও স্বল্পকাল স্থায়িত্বও মানব সমাজের জন্যে নিরবধি দুঃখ, বেদনা ও অশান্তির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু এই সকল সমস্যা প্রধানত জৈবিক প্রয়োজন দ্বারা সীমিত বলে তারা মোটামুটি একই প্রকারের এবং তাই তাদের সমাধান কঠিন হলেও মূলত এক এবং স্থান ও কাল নিরপেক্ষ। এই সমস্যার মুকাবিলা করার জন্যেই হযরত নিজেকে সাধারণ মানুষের জীবনের চতুঃসীমায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। সে পরিসীমায় না থাকলে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে নির্মাণ করার নজীর স্থাপন তাঁর জন্যে বোধ হয় সম্ভব হত না।

www.pathagar.com

নিরবচ্ছিন্ন, সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন সত্যিকার কঠিন সংগ্রাম, প্রাচুর্যের মাঝখানে বসে সে জীবন অব্যাহত রাখা আবার শুধু কঠিনই নয় প্রায় অসম্ভব । এই উত্তম পরীক্ষায় হযরত মুহাম্মদ (সা) পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

যৌবনের উষালগ্নে স্বদেশবাসীর অশান্তিময় জীবন তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধ, সামান্য কারণে রক্তপাত এবং গোষ্ঠীস্বার্থ আর ব্যক্তি স্বার্থের কারণে রক্তপাত সাধারণ মানুষের জন্যে সে সমাজে বসবাস দুঃসহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই চরম দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্যে মক্কায় কতিপয় শুভবুদ্ধি প্রণোদিত যুবকের সহযোগিতায় তিনি যে কল্যাণ পরিষদ গঠন করেছিলেন, তার নাম ছিল 'হিলফুল ফুযুল'। এই পরিষদের সদস্যদের সমবেত প্রতিজ্ঞাপত্রে লিপিবদ্ধ ছিল-আমরা সকলেই অত্যাচারিত ও মজলুমের সহায়তা করব। কোন অত্যাচারী মক্কায় বাস করতে পারবে না। উল্লেখ্য, নবুয়ত প্রাপ্তির পরও হযরত এই পরিষদের চুক্তিপত্রের কথা মনে করে বলতেন, আজো যদি কেউ এই ধরনের চুক্তির জন্যে আমাকে আহবান করে তাহলে আমি যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে যাব।

www.pathagar.com

মানবতার কল্যাণে প্রিয়নবী (সা)–র মহান অবদান

মোঃ মাহমুদুল হাসান

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইতিহাসের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেন। এমনি রাষ্ট্র কায়েম করার জন্যে কল্যাণবাদী সমাজ–ব্যবস্থার অস্তিত্ব পূর্বশর্ত। যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে যা নিজের জন্যে পসন্দ করে তা অন্যের জন্যেও পসন্দ করে। একে অন্যের দুঃখ নিবারণে সমভাবে সচেষ্ট হয়। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সকলেই অগ্রগামী হতে সচেষ্ট হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমনি সমাজ–ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন যা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, অনন্যসাধারণ সকলের জন্যে অনুকরণীয় এবং সর্বত্র প্রশংসনীয় । সে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যাবতীয় নৈতিক গুণে গুণান্বিত, ধৈর্য ও সহনশীলতা, পরস্পরের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আর্তের প্রতি দয়া, অনাথ, বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবা প্রত্যেকেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এমনি সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে গিয়েই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।' আর একখানি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ 'যারা দয়া করে থাকে দয়াময় আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি দয়া করেন, তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' যে আমাদের ছোটদের প্রতি মায়া করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

www.pathagar.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন : 'তোমরা মু'মিনদেরকে পরস্পরের মধ্যে দয়ামায়ায় এবং সহমর্মিতায় একটি দেহের মতো পাবে। দেহের একটি অংশে ব্যথা হলে সর্বাঙ্গে তা অনুভূত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'মুসলমান মুসলমানের ভাই, একে অন্যের প্রতি জুলুম করে না, পরস্পরের সাহায্য থেকে বিরত থাকে না, কোন মুসলমান যখন অন্য একজন মুসলমান ভাই-এর প্রয়োজনের আয়োজন করেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'

এমনি মহান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সাহাবায়ে কিরাম এবং এমনি মহান ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিলো সেদিন ইসলামী সমাজ তথা কল্যাণবাদী সমাজ এবং ইসলামী রাষ্ট্র তথা কল্যাণময় রাষ্ট্র ।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ব্যক্তি থেকেই পরিবার এবং পরিবার থেকেই সমাজ এবং সমাজ থেকেই জাতি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। অতএব ব্যক্তি জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে না তুললে উন্নততর পারিবারিক জীবনের আশা করা যায় না। অতঃপর কল্যাণকর সমাজ বা রাষ্ট্র কায়েমের কথা চিন্তাও করা যায় না। এ জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তুলবার বিধান প্রবর্তন করেছেন । তিনি পিতামাতার সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী এক কথায় প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই নির্দেশসমূহ পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হতে পারে কল্যাণময়। এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভালো ব্যবহারের সবচেয়ে বড় হকদার কে ?' তিনি ইরশাদ করলেন : 'তোমার মা'। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন : 'সে ব্যক্তি অপমানিত হোক, যে তার পিতামাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে অথচ

www.pathagar.com

তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা করেনি।' এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফে।

হযরত হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে স্ত্রীর হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করেন: 'তার হক হলো তুমি তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্য একখানি হাদীসে ইরশাদ করেছেন: 'স্ত্রীলোকের উপর সর্বাধিক অধিকার তার স্বামীর এবং পুরুষের উপর সর্বাধিক অধিকার তার মাতার।' এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা)। সন্তান-সন্ততির হক সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন: 'পিতা তার সন্তান-সন্ততিকে যা দরকার তন্মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো সুশিক্ষা এবং সঠিক তরবিয়ত।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে অতঃপর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে তবে তারা তার জন্য দোযখ থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমাজের দুস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষের সম্পর্কেও বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, আমি এবং য়াতীমের লালন-পালনকারী এবং দুস্থ মানুষের সাহায্যকারী আমরা উভয়ে এভাবে জান্নাতে থাকবো-এরপর শাহাদাত আঙ্গুল ও পাশের আঙ্গুলকে একত্র করে দেখিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মেহমানদের হক সম্পর্কেও তাকীদ করে ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস করে তার কর্তব্য হলো মেহমানদের আপ্যায়ন করা। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)।

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনের তাকীদ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয়, যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন নয়, যে উদর পূর্ণ করে আহার করে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পায়।" প্রিয়নবী

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন : "হে আবূ যর ! যখন তুমি খুরমা রান্না কর তখন পানি একটু বেশি দিও এবং তোমার প্রতিবেশীর খবর নিও।"

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমাজের দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাকীদ করে ইরশাদ করেছেন : "উত্তম সাদকা হলো, তুমি কোন ক্ষুধার্ত মানুষকে উদর পূর্ণ করে খাবার দিও।"

এমনিভাবে বিধবা বা মিসকীনদের সাহায্যের তাকীদ করে তিনি ইরশাদ করেছেন : "বিধবা ও মিসকীনদের জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে এবং সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সারারাত ইবাদত করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দন্ডায়মান হয়ে কখনও ক্লান্ত হয় না, সেই ব্যক্তি ঐ রোযাদারের ন্যায় যে সর্বদা রোযা রাখে, দিনে কিছুই খায় না।"

খাদেম বা চাকর-বাকরদের হক সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ চাকর-বাকরের হক হলো তার পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা আর তার প্রতি এতখানি বোঝা চাপান যার সাধ্য সে রাখে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রুগ্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন : 'তোমরা রুগীদেরকে দেখতে যেয়ো, ক্ষুধার্তকে খাবার দিও এবং বন্দীকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করো'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে তাকীদ করে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে ইরশাদ করেছেনঃ 'হে লোক সকল ! শোন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইয্যত আবরু আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন-যেভাবে তোমাদের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর সম্মানিত'।

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন : 'আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দস্ত মুবারকে নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার এবং প্রত্যেকটি মুসলমানের কল্যাণ সাধনের অঙ্গীকার করে বায়'আত করেছি।

www.pathagar.com

হযরত আবূ মূসা আল-আ'শআরী (রা) বর্ণনা করেন, 'একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য ইমারতের ন্যায় যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে'।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, 'মুসলমান মুসলমানের দর্পণ। মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং তার হিফাযতে সচেষ্ট হয়'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন : সেই ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা যতক্ষণ অন্য মুসলমান ভাই-এর জন্য পছন্দ না করে'। তিনি একথাও ঘোষণা করেছেন যে, 'একজন মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে :

১. যখন তুমি মুসলমান ভাই-এর সাথে মুলাকাত করো তখন তাকে সালাম করো।

২. যখন সে তোমাকে দাওয়াত করে তখন তুমি তাঁর দাওয়াত কবূল করো।

৩. যখন সে তোমার নিকট সাহায্য চায় তখন তুমি তাকে সাহায্য করো।

৪. যখন তার হাঁচি আসে এবং সে আলহাম্‌দু লিল্লাহ বলে তখন তুমি ইয়ার হামুকুমুল্লা বলে তার জবাব দিও।

৫. যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তাকে দেখতে যেও।

৬. যদি তার মৃত্যু হয় তবে তার জানাযার সাথে গমন করো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরস্পরের মমত্ববোধের প্রসারের তাকীদ করে ইরশাদ করেছেন : 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না প্রকৃত মু'মিন হও। আর প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না একে অন্যকে ভালোবাসো। আর আমি কি তোমাদেরকে সেই পন্থা বলবো না, যা অবলম্বন করলে তোমরা একে অন্যকে ভালোবাসতে শুরু করবে ? 'পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার করো'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরস্পরের মমত্ববোধের তাকীদ করে ইরশাদ করেছেন : 'তুমি তোমার মুসলমান ভাই-এর সাথে হাসিমুখে

www.pathagar.com

কথা বলো, এটিও একটি নেকী এবং তোমার বালতির পানি তোমার ভাই-এর পাত্রে ঢেলে দাও। এটিও একটি নেকী।

বস্তুত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি বাণী সাহাবায়ে কিরাম শুধু কণ্ঠস্থ করেছেন তাই নয় বরং তাঁর প্রতিটি কথার উপর অক্ষরে অক্ষরে আমল করেছেন ; ফলে তাদের মনের জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষ অন্য মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র রহমতরূপে উপস্থিত হয়েছে। এমনি কল্যাণবাদী মানুষদের সমন্বয়ে একটি বিস্ময়কর কল্যাণবাদী সমাজ কায়েম হয়েছে। সে সমাজ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে, যাঁদের আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীর অন্য মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এমনি লোকেরা যখন ব্যবসা করেছেন তখন পূর্ণ সততা এবং আমানতদারীর সাথে করেছেন, যখন বিচারালয়ে বসেছেন, তখন সুবিচার কায়েম করেছেন, যখন যুদ্ধ করেছেন তখন যুদ্ধের নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন, যখন রাজনীতি করেছেন তখন তা মানুষের কল্যাণের জন্যই করেছেন, যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তখন রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করেছেন।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইতিহাসের প্রথম কল্যাণরাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যাকে সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়।

আজ আমাদের দেশেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধু শ্লোগানের মাধ্যমে বা আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা যায় না, এ পন্থা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন গ্রহণ করেন নি। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলো নৈতিক মান উন্নীত করার, মূল্যবোধের অবক্ষয় দূরীভূত করার, কল্যাণকামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার আর এ সবের জন্যে চাই আদর্শ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সঠিক কর্মসূচী ত্যাগ-তিতিক্ষা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত ও নিবেদিত প্রাণ। আর চাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসারী।

www.pathagar.com

অন্তরঙ্গদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা)

মুহিউদ্দীন খান

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যাঁরা খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন, দৈনন্দিন সাহচর্যের মাধ্যমে তাঁর ওঠা-বসা, চলাফেরা এবং প্রতিটি আচার-আচরণ সূক্ষ্মভাবে যাচাই করার সুযোগ লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উম্মতের মা হযরত খাদীজা তাহেরা (রা) ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। খাদীজা ছিলেন আরবের এমন একজন সম্রান্ত ও বিচক্ষণ বিদুষী মহিলা, যাঁকে জাহিলিয়াত যুগের মক্কাবাসীরাও পরম শ্রদ্ধার পাত্রীরূপে জ্ঞান করতো। ওদের মুখে 'তাহেরা' বা 'পবিত্রা' ছিল খাদীজার উপাধি।

নবী করীম (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে খাদীজার সান্নিধ্যে আসেন যৌবনের প্রারম্ভে অনুমান কুড়ি-একুশ বছর বয়সে। খাদীজার সাথে তাঁর বিয়ে হয় পঁচিশ বছর বয়সে। মহানবী (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির আগে দীর্ঘ পনেরো বছর তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে মহানবী (সা) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন হযরত খাদীজা (রা)-র বয়স পঞ্চান্ন। বিচক্ষণা ব্যবসায়ী এবং প্রচুর বিত্তসম্পত্তির মালিক হযরত খাদীজা (রা) তখন আবেগতাড়িত সকল প্রকার হালকা অনুভূতির অনেক উর্ধ্বে। জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর সঞ্চয়ে। এ সময়টাতেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর মহান স্বামীর মধ্যে একটা অতি মানবীয় পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ। সে পরিবর্তনটা যে স্থূল বৈষয়িক বিচার-বুদ্ধিতে একজন সচেতন গৃহিণীর পক্ষে মোটেও কোন সুখকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী ছিল না, এতটুকু অনুভব করার মতো চিন্তা-চেতনা থেকে খাদীজার মতো বহুদর্শী নারী নিশ্চয়ই শূন্য ছিলেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণ মেধা এবং গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারিণী খাদীজা তাঁর মহান স্বামীর মানসিক পরিবর্তনকে একটা মহোত্তম ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী রূপে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য–ওহী নাযিল শুরু হওয়ার অন্যূন পাঁচ বছর আগে থেকে রসূলে আকরাম (সা) সংসার জীবনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ধ্যানমগ্নতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়ছিল এবং শেষ পর্যন্ত হেরা গুহায় দিনের পর দিন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন।

হেরা গুহার সেই নিরিবিলিতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বাণীবাহক ফেরেশতা হযরত জিব্‌রাঈলের সাক্ষাত লাভ এবং প্রথম ওহীর বাণী অবতরণ করার ঘটনা নবী করীম (সা)–এর মনে একটা ভীতি মিশ্রিত মানসিক চাপের সৃষ্টি করেছিল। তাই বাড়ি ফিরে হযরত খাদীজার নিকট তিনি সেই ভীতি ও উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম। আমি আমার জীবন সংশয়ের আলামত দেখতে পাচ্ছি।'

হযরত নবী করীম (সা)–এর উদ্বিগ্ন কণ্ঠের এ কথা শোনার পর হযরত খাদীজা (রা)–র মুখে সান্ত্বনার যে কয়টি স্বতঃস্ফূর্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, নবুয়ত প্রাপ্তির আগে মহানবীর চরিত্র কেমন ছিল এর একটা সার্বিক মূল্যায়ন সেই কটি কথার মধ্যেই পরিব্যক্ত হয়ে রয়েছে। হযরত খাদীজা (রা) বলেছিলেনঃ

"কখনও এমনটি হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ কোন অবস্থাতেই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা, আপনি আপনজনদের সাথে সদা আচরণ করেন। সত্য বলেন। অসহায়, ঋণগ্রস্ত ও বিপদে পতিতদের দায়–দায়িত্বের বোঝা স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নেন। আপনি বিশ্বস্ত আমানতদার। অতিথি সেবায় আপনার কোন ক্লান্তি নেই। সব সময় আপনি মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করেন।"

–বুখারী ও মুসলিম

ইতিহাসবিদ ইবনে জরীর তাবারী হাদীসগ্রন্থ বায়হাকীর রয়াতে আরও লিখেছেন ঃ

'আপনি কখনও কোন অশ্লীল–অশালীন বিষয়ের নিকটবর্তীও হননি। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আপনার প্রতি কল্যাণ ছাড়া আর কিছু আসতে পারে না। সুতরাং যা এসেছে সেটাকে শান্ত মনে গ্রহণ করুন। আমার মনে হয়, আপনি যা লাভ করেছেন, সেটা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যাদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।"

www.pathagar.com

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন হিজরতের আগ পর্যন্ত মহানবী (সা)-র মক্কা জীবনের প্রায় সর্বক্ষণের একান্ত সাথী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল মহানবী (সা)-র সমগ্র যৌবনকাল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কয়েকটা অমূল্য বাক্য।

মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর থেকে মহানবী (সা)-র সার্বক্ষণিক সাথীতে পরিণত হয়েছিলেন আর এক মহীয়সী নারী। ইনি উম্মত-জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)। পরবর্তী যুগের কতিপয় তরুণ তাবেয়ী তাঁকে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার আলোকে মহানবী (সা)-র জীবনচরিত মূল্যায়ন করতে বললে তিনি মাত্র একটা কথা দ্বারা প্রশ্নকারীদের সকল কৌতূহলের নিবৃত্তি করেছিলেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন-তোমরা কি কুরআন শরীফ পাঠ কর না ? মহানবী (সা) ছিলেন পবিত্র কুরআনেরই বাস্তব নমুনা।

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনকে যদি একজন মানুষরূপে কল্পনা করা যায় তবে তিনি হবেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

এ ছাড়াও রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাঁর এমন কয়েকটা মন্তব্য রয়েছে, যেগুলো সীরাত সংকলনকারিগণ বিশেষ যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। সংকলনকারিগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী মন্তব্যগুলো নিম্নরূপ :

১. দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে অবকাশ দেওয়া হলে তিনি অপেক্ষাকৃত সহজটা গ্রহণ করতেন এই শর্তে যে, এর মধ্যে অশোভন কিংবা পাপের কোন লেশগন্ধ না থাকা চাই। পাপের কোন দূরতম সম্ভাবনা থাকলেও তিনি এটি পরিহার করে চলতেন। -বুখারী

২. আল্লাহ্র রসূল নিজের ইচ্ছায় বা স্বার্থে কখনো কোন লোককে শাস্তি প্রদান করেননি। আল্লাহ্র নির্দেশ অবমাননা করার অপরাধেই শুধুমাত্র তিনি শাস্তি প্রদান করতেন। -বুখারী

৩. কারও কোন মন্দ কর্মের বদলা তিনি মন্দ দ্বারা কখনও দেননি। তাঁর কাছে কেউ অপরাধ করলে সব সময় তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

-সীরাতুন-নবী, পৃ. ৯

www.pathagar.com

৪. সব সময় অন্তর মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত রাখতেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে অথবা ঝড়ের আভাস দেখা দিলে তাঁর পবিত্র চেহারায় ভীতির লক্ষণ ফুটে উঠতো। আমি একবার আরজ করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! মেঘ দেখে লোকের চেহারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তারা বৃষ্টির আশায় উদ্বেলিত হয় আর আপনি কিনা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।"

হযূর (সা) জবাবে বলছিলেন, "আয়েশা ! কোন্ ভরসায় আমি ভয়শূন্য হবো? কে জানে এর মধ্যেও কোন আযাব লুকিয়ে আছে কিনা ! অতীতে একটা জাতিকে প্রবল ঝড়ের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। অন্য এক জাতি আকাশে মেঘ দেখে বলেছিল, বৃষ্টি আসবে। কিন্তু সে মেঘের মধ্য থেকেই ওদের ধ্বংস করার মতো আযাব নেমে এসেছিল। —বুখারী

৫. তিনি কোন দিন কারো কোন নাম নিয়ে তার প্রতি অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেননি। চাকর, বাঁদী, স্ত্রী-পুরুষ এমন কি কোন চতুষ্পদ জন্তুকেও তিনি কখনও নিজের হাতে প্রহার করেননি। —সীরাতুন্নবী, ১ম

৬. জীবনে তিনি কখনও কারো কোন বৈধ আবদার বা আবেদন প্রত্যাখ্যান করেননি। —মুসলিম, আবূ দাউদ

৭. গৃহে প্রবেশ করার সময় মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠতো, কথাবার্তা এমন ধীরে ধীরে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বলতেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে তা সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। —বুখারী

৮. একদা এক বেদুঈন তাঁকে বলেছিল, আপনি শিশুদের মুখে চুমো খান। আমি তো কখনও এমনটা করি না। তিনি এই বলে জবাব দিয়েছিলেন যে, "আল্লাহ পাক যদি হৃদয় মন থেকে স্নেহ-মমতা দূর করে দিয়ে থাকেন তবে এতে আমার করার কি আছে?" —বুখারী

৯. আসওয়াদ নামক একজন সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেনঃ রসূলে মকবুল (সা) গৃহাভ্যন্তরে থাকার সময় সব ধরনের গৃহস্থালী কাজ করতেন। অন্যের কাজও তিনি অনেক সময় করে দিতেন।—বুখারী

www.pathagar.com

১০. কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে তার নাম নিয়ে কখনও নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। সাধারণভাবে বলে দিতেন যে, এরূপ কাজ করা সমীচীন নয়। –তিরমিযী

১১. কখনও তাঁকে কেউ এমনভাবে হাসতে দেখেনি যদ্দারা তাঁর দাঁতের পাটি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

১২. রসূলুল্লাহ (সা)–এর ঘরে কোনদিন পর পর দুই ওয়াক্ত খাবার তৈরী করা হতো না। একবেলা খাবার পাওয়া গেলে অন্য বেলা শুধু খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া হতো। –বুখারী

হযরত রসূলে করীম (সা)–এর একান্ত খাদেম ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক। মা তাঁকে বাল্যকালে এনে আল্লাহর রসূল (সা)–এর খিদমতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন ঃ

আমি একটানা দশ বছর হুযূরে পাক (সা)–এর খিদমতে কাটিয়েছি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হুযূর (সা) কখনও আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কখনও এমন কথা বলেননি যে, অমুক কাজটা কেন করলে কিংবা অমুক কাজটা কেন করলে না ? –বুখারী

পবিত্র কুরআনের সূরায়ে ইউনুসে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় নবী (সা)–র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন–আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যেই জীবনের দীর্ঘ একটা অংশ অতিক্রান্ত করেছি। তা থেকে কি বোধোদয় হওয়ার মত কোন উপকরণ তোমরা খুঁজে পাও না ? –ইউনুস ঃ ২১

হযরত আলী (রা) ছিলেন বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সা)–র একজন অন্তরঙ্গ এবং সার্বক্ষণিক সাথী। বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)–ই সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। মহানবী (সা)–র ওফাতকাল পর্যন্ত আলী (রা) তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। একদা পুত্র হযরত হোসাইন (রা)–এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ হযরত নবী করীম (সা) ছিলেন হাসিমুখ, মায়াময়, নরম স্বভাব বিশিষ্ট এবং উদার প্রকৃতির। কঠোর প্রকৃতি বা সংকীর্ণ হৃদয়বিশিষ্ট তিনি ছিলেন না। কোন মন্দ কথা কখনও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। অন্যের ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর স্বভাব তাঁর ছিল

www.pathagar.com

না। রুচিবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গের অবতারণা হলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন। তিনটি বিষয় তিনি স্বীয় আচরণ থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছিলেন ঃ

ক. অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হওয়া।

খ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা।

গ. অপ্রয়োজনীয় কোন প্রসঙ্গের পিছনে লাগা।

অন্যের বেলায়ও তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতেন ঃ

ক. অন্যকে মন্দ বলা।

খ. কারও ত্রুটি তালাশ করা।

গ. কারও কোন গোপন বিষয় উদ্ধার করার জন্য আড়ি পাতা।

জীবনে তিনি এমন কোন কাজ করেননি, যেটির মধ্যে কোন উপকার নিহিত নেই। যখন তিনি কথা বলতেন তখন সাহাবীগণ নত মস্তকে এমন মনোযোগের সাথে তা শুনতেন যে, দেখলে মনে হতো তাঁদের মাথার উপর যেন এক একটা পাখী বসে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে পরই কেবল সাহাবীগণ পরস্পর কথা বলতেন। কেউ তাঁর সাথে কথা বললে যতক্ষণ তাঁর কথা শেষ না হতো, ততক্ষণ তিনি কথা বলতেন না। মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতেন। কোন বিষয়ে অন্যরা যখন হাসতো তখন তাঁর পবিত্র মুখে শুধুমাত্র মৃদু হাসির একটা রেখা ফুটে উঠতো। বাইরের কেউ এসে শক্ত কথা বললেও তিনি তা হাসিমুখে সহ্য করতেন। অন্যের মুখে প্রশংসা শোনা পছন্দ করতেন না। তবে কোন অনুগ্রহের বদলায় কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাকে বিরত করতেন না। অন্যের কথা কেটে কখনও কথা বলতেন না। সীমাহীন উদার স্পষ্টবাদী এবং নরম প্রকৃতির ছিলেন। প্রথম দর্শনে সবাই তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের সামনে হতচকিত হয়ে পড়তো। কিন্তু কিছু সময় সাহচর্যে থাকার পর তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে ভালবাসতে শুরু করত। —সীরাতুন্নবী, ২য় খন্ড

যাঁরা জীবনে অন্তত একবারও আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের কেউই প্রভাবিত না হয়ে পারেননি। সেসব ভাগ্যবান লোকেরা কবিতায়, গানে এবং সালঙ্কার বর্ণনার মাধ্যমে স্ব-স্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে গেছেন। সাহাবী (রা)-গণের মধ্যে সেসব বর্ণনাকারীর সংখ্যা সহস্রাধিক। সেগুলোর মধ্যে কোন

www.pathagar.com

কোন বর্ণনা এতই হৃদয়গ্রাহী যে, সেগুলো আরবী সাহিত্যের এক একটা অমূল্য সম্ভাররূপে গণ্য হয়ে থাকে। কালোত্তীর্ণ আরবী ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যে হাস্সান ইবনে সাবেতের অমর কাব্য, হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত আবূ বকর (রা), হযরত আব্বাস (রা) প্রমুখের কবিতাও এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত অনুপম বর্ণনা সম্বলিত বহু সংখ্যক আরবী গদ্যের মধ্যে উম্মে মা'বাদ নাম্নী একজন মরুচারিণী বেদুঈন মহিলার বর্ণনা এখনও পর্যন্ত সাহিত্যরসপিপাসু মাত্রকেই অভিভূত করে দেয়।

এই ভাগ্যবতী ভক্ত নারীর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)–এর খুব স্বল্পস্থায়ী সাক্ষাত ঘটেছিল হিজরতের সফরে মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাওয়ার পথে একটি মরূদ্যানের মধ্যে। শ্রান্তি এবং ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে নির্জন মরুর বুকে অবস্থিত একটা জীর্ণ তাঁবুর পাশে গিয়ে দু'জন সঙ্গীসহ আল্লাহ্র রসূল (সা) ক্ষণিকের জন্যে যাত্রা বিরতি করেছিলেন।

তাঁবুর পাহারায় একাকিনী ছিলেন উম্মে মা'বাদ। তাঁর স্বামী আবূ মা'বাদ গিয়েছিলেন দূরে কোথাও ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে।

মরুবাসী বেদুঈনের মেহমানদারী সর্বজনবিদিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ তিনজন ক্লান্ত মুসাফিরের মেহমানদারী করার মতো কিছুই তখন ছিল না উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে। তাই মেহমানেরা যখন মূল্যের বিনিময়ে হলেও কিছু দুধ চাইলেন, তখন উম্মে মা'বাদের আর লজ্জার অবধি রইল না।

তাঁবুবাসিনীর অপ্রস্তুত অবস্থাটা লক্ষ্য করে রসূলে মকবুল (সা) বললেন, "তাঁবুর পাশেই ঐ ঝোপটার ছায়ায় যে ছাগীটা শুয়ে আছে, তুমি অনুমতি দিলে এটি দোহন করেই কিছু দুধ সংগ্রহ করার চেষ্টা করি।"

উম্মে মা'বাদ বললেন–এটা তো মৃতপ্রায়। খেতে না পেয়ে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, পালের সাথে হেঁটে চারণভূমি পর্যন্ত যাওয়ার মতো শক্তি নেই বলেই এখানে পড়ে রয়েছে।"

রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'আমি তো এর দুরবস্থাটা নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। তবুও তুমি অনুমতি দিলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

www.pathagar.com

উম্মে মা'বাদের এবার কৌতূহল হলো। আগন্তুকের নিষ্পাপ জ্যোতির্ময় চেহারা, তাঁর কথাবার্তার ধরন, তাঁর অনুপম সৌজন্যবোধ তাঁকে আকৃষ্ট করলো। একটা পাত্র বের করে দিলেন তাঁবু থেকে। বললেন, "আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে ফল বোধ হয় আপনাদের মেহমানদারী করতে না পারার লজ্জা এবং আক্ষেপ আর একটু বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু হবে না!" রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং পাত্র হাতে নিয়ে ছাগীটির কাছে গেলেন এবং আল্লাহ্র নাম করে দোহন করতে শুরু করলেন। কি আশ্চর্যের ব্যাপার ! পবিত্র হাতের স্পর্শ পেয়ে মরণপণ কৃশ ছাগীটির শুকনা ওলান থেকেই দুধ বের হতে শুরু করল। পাত্রভর্তি দুধ এনে তিনি উম্মে মা'বাদের হাতে দিলেন। বললেন, 'প্রথম তুমি তৃপ্তির সাথে খাও। তারপর আমাদিগকেও খেতে দাও।'

সবাই মিলে পরম তৃপ্ত হয়ে খেলেন সেই দুধ। তারপর আল্লাহ্র রসূল (সা) আর একটা বড় পাত্র নিয়ে পুনরায় দুধ দোহন করতে লাগলেন। উম্মে মা'বাদ বিস্ফারিত দু'চোখে দেখলেন ; এবার বড় পাত্রটাও ভরে গেছে। সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম-এর ক্লান্তি নিবারণের উছিলায় ঘটে গেল এমন একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। মরুচারিণী হলেও উম্মে মা'বাদ ছিলেন বিচক্ষণা নারী। কঠোর জীবনাচরণের মধ্য দিয়েই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এ ক্ষুদ্র কাফেলাটি সাধারণ কোন পথিকের নয়। যাঁর পবিত্র হাতের ছোঁয়ায় মৃতপ্রায় কৃশ ছাগীর শুকনা ওলানে ফেনিল দুধের ফোয়ারা সৃষ্টি হয়, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ কেউ নন !

কাফেলাওয়ালাদের তাড়া ছিল। শত্রু পিছনে লেগে রয়েছে। একটু অসাবধানতা মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারে। তাই তাঁরা তাড়াহুড়া করেই পুনরায় রওয়ানা হয়ে গেলেন।

দিন শেষে আবূ মা'বাদ ফিরে এলেন ছাগলপাল নিয়ে। স্ত্রীর মুখে শুনলেন সেই আশ্চর্য আগন্তুকদের কথা। নিজের চোখে দেখলেন কানায় কানায় ভরা দুধের সেই বিরাট পাত্রটি। বললেন, "বোধ হয় এ আগন্তুক কুরায়শদের সেই মহান পুরুষ, যাঁর কথা গত কয়েকদিন যাবত বড় বেশি উচ্চারিত হচ্ছে মরুভূমির প্রতিটি পথচারীর মুখে মুখে। তিনি নাকি মক্কা ছেড়ে চলে এসেছেন।

www.pathagar.com

ইয়াসরাব লক্ষ্য করে নাকি তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তাই কুরায়শদের চর হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করছে মরুভূমির যত্রতত্র। একশত উটের লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করেছে মক্কাবাসীরা। যে কোন মূল্যে ওরা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চায় নিজেদের কব্জার মধ্যে।

উম্মে মা'বাদ! নিঃসন্দেহে তিনি এক মহোত্তম জ্যোতির্ময় পুরুষ। ধন্য তোমার দুই নয়ন যে, তুমি তাঁকে কাছে থেকে দেখেছ। বল, তুমি তাঁকে কেমন দেখলে ? উম্মে মা'বাদ তাঁর হৃদয়াবেগ যেন সম্বরণ করতে পারছিলেন না। স্বামীর আগ্রহ লক্ষ্য করে তা যেন বাঁধভাঙা পানির মতো প্রবাহিত হতে শুরু করলো। তাঁর যে বর্ণনা সীরাতের কিতাবগুলোতে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

> কিছুক্ষণ আগেই এখানে এমন এক ব্যক্তির আগমন হয়েছিল, যিনি ছিলেন পরিচ্ছন্নতার মূর্ত প্রতীক। উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চেহারা এবং দিব্যকান্তি বিশিষ্ট ছিলেন তিনি। দেহবল্লরীতে স্থূলতাজনিত অসামঞ্জস্য কিংবা কৃশতার ত্রুটি ছিল না। মধুর মায়াময় চেহারা, ঘন ভুরু, দীর্ঘ পালক, সোরাহীর মতো কন্ঠনালী, ঘন দাড়ি। তাঁর কন্ঠস্বর আকর্ষণীয়। তাঁর নিরবতা ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং বাক্যালাপ হৃদয়গ্রাহী। অপরূপ সুন্দর ছিলেন তিনি। দূর থেকে এমন সুন্দর দেখাতো যা বর্ণনাতীত। নিকট থেকে দৃষ্টিপাত করলেও চোখ ফেরানো যেতো না। সুমধুর ছিল তাঁর বাক্যালাপ। অপ্রয়োজনীয় কথাও তিনি বলেননি, প্রয়োজনের সময় নির্বাকও থাকেননি। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল সূতার গাঁথা মুক্তার মতো। মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট, যাঁর মধ্যে বিরক্তিকর দীর্ঘ বা তুচ্ছ করার মত বেঁটেপনা ছিল না। দু'টি বৃক্ষশাখার মধ্যখানে নতুন গজিয়ে ওঠা আর একটি তাজা ডালের মতোই তিনি ছিলেন দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাথে ছিল কয়েকজন সঙ্গী। তিনি যখন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতেন তখন তারা একেবারে চুপ হয়ে যেতো। কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতো। তিনি ছিলেন সকলের অনুসরণীয় সেবার উপযোগী। তাঁর মুখমন্ডল ছিল যেমন হাসি হাসি তেমনি প্রতিটি অভিব্যক্তিই ছিল প্রশংসনীয়। —মুজামুল কবীর

www.pathagar.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
ও
তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা)

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূতঃপবিত্র জীবনের প্রতিটি কথা বিস্ময়কর, চিরস্মরণীয়, চিরঅনুকরণীয়। তাঁর আদর্শ-অনিন্দ্যসুন্দর, সার্বজনীন। তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁরা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে আদর্শ হয়েছেন। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেনঃ 'আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়। তোমরা তাদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়ত লাভ করবে।"

সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে ভক্তি অনুরক্তি পোষণ করতেন এবং তাঁর যেভাবে আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর অনুসরণ করতেন তা শুধু যে বিস্ময়কর তাই নয়, বরং কল্পনাতীতও। পৃথিবীর কোন মানুষের প্রতি এমন ভক্তি মহব্বত এবং অনুরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে বলে ইতিহাসে কোন দৃষ্টান্ত নেই।

এক সাহাবী (রা) বর্ণনা করেন, 'আমি জীবনে কোন দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরানী চেহারা মুবারকের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারিনি'।

অন্য এক সাহাবী (রা) বলেন, 'এক চাঁদনী রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি একবার তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করি। অন্যবার আকাশের চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমার মনে হলো, তাঁর চেহারা মুবারক অধিকতর জ্যোতির্ময়'।

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্যে হযরত বিলাল (রা) ওযূর পানি নিয়ে এসেছেন। তখন সমস্ত লোক তাঁর দিকে ছুটে গেল এবং (ওযূর কারণে তাঁর দেহ মুবারক ধৌত) পানি হাতে নিয়ে নিজের চেহারায় মুছতে লাগলো। আর যে পানি পায়নি সে পানিওয়ালা ব্যক্তির ভেজা হাতই যথেষ্ট মনে করলো। হুযূর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন বের হয়ে আসলেন সকলে তাঁর দস্ত মুবারককে টেনে নিজ নিজ মুখমন্ডলে মুছতে লাগলো। আমিও তাই করলাম'। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে– তিনি বলেনঃ 'আমি দেখেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চুল মুবারক যখন কর্তন করা হতো তখন সাহাবায়ে কিরাম চারপার্শ্বে দন্ডায়মান থাকতেন। একটি চুল মাটিতে পড়া মাত্র তাঁরা দ্রুত বেগে তা তুলে নিতেন এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তা নিজের নিকট রাখতেন।'

সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনের জন্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাকে অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করতেন, প্রত্যেকের অন্তরেই এমনি আকাঙ্ক্ষা থাকতো।

একবার মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় এই গুজব রটে গেল যে, কাফিররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করেছে বা গ্রেফতার করেছে। এ কথা শ্রবণ করামাত্র জোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাসভবনে উপস্থিত হলেন। আল্লাহুর প্রিয় রসূল (সা)–কে ভাল অবস্থায় দেখে তিনি যেন স্বীয় হারানো প্রাণ ফিরে পেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কি ব্যাপার ? তুমি তরবারি হাতে নিয়ে কেন এসেছ'? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আমি শ্রবণ করেছি দুশমন আপনাকে বন্দী করেছে বা শহীদ করেছে'। তখন আল্লাহুর হাবীব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'যদি ঘটনা তাই হতো তবে তুমি কি করতে'? হযরত জোবায়ের (রা) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! এই অবস্থায় আমি মক্কাবাসীর সাথে লড়াই করে প্রাণ দিতাম'।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জিহাদ হলো বদর। এই জিহাদের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। একজন সাহাবী দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা সেসব লোক নই যে, হযরত মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের ন্যায় বলে দেব আপনি এবং আপনার রব্ গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকবো'।

আমরা তো আরজ করি-'চলুন, যে দিকে আপনার প্রতিপালক আপনাকে আদেশ করেন সেদিকেই চলুন। সেই আল্লাহ্ তা'আলার শপথ ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা ডান দিক থেকে লড়াই করবো, বাঁ দিক থেকে লড়াই করবো, সম্মুখ থেকে লড়াই করবো এবং পেছনের দিক থেকে লড়াই করবো। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, আমাদের একটি চক্ষুও উন্মুক্ত থাকতে আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না'।

এই সময় আওস গোত্রের দলপতি হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ আনসারী (রা) এভাবে স্বীয় বক্তব্য পেশ করলেন ঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ্। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনার রিসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। আপনার যা মর্জি হয় তাই করুন। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি। যিনি আপনাকে সত্য রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে আদেশ করেন তবে আমরা তাই করবো। আমাদের একটি লোকও পিছপা হবে না। ইন্‌শাআল্লাহ, আপনি আমাদেরকে রণাঙ্গনে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও অবিচল দেখতে পাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তরফ থেকে আপনার নয়ন-মনকে সুশীতল করুন। -জোকানী ঃ সীরাতুন্নবী (সা) ২য় খন্ড, হায়াতুসাহাবা তবকাতে ইবনে সাদ উসদুল গাবাহ ইবনে আসীর

ওহুদের যুদ্ধে যখন হানাদার বাহিনী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আক্রমণ করে তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ 'কে আছ, যে হামলাকারীদেরকে আমার নিকট থেকে হটিয়ে দিতে পারো'? সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসারী সাহাবী (রা) অগ্রসর হলেন এবং কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করে

www.pathagar.com

শাহাদাত লাভ করলেন । এভাবে কাফিররা তাঁর প্রতি হামলা অব্যাহত রাখে এবং সাহাবায়ে কিরাম ক্ষিপ্রগতিতে সে হামলার মুকাবিলা করেন এবং একে একে সাতজন আনসারী সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হিফাযতের জন্য লড়াই করে শাহাদাত লাভ করেন।

সাহাবী আবূ দুজানা (রা) আহত এবং রক্তাপ্লুত হয়েছেন । হযরত তালহা (রা)-র হাত অবশ হয়েছে তবুও দুশমনদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছেও আসতে দেননি।

বনিল মোস্তালিকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেয়াদবীপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করে । তখন তারই পুত্র আবদুল্লাহ (যিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন) আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দান করুন। আমি স্বহস্তে আমার পিতাকে হত্যা করি'। কিন্তু রাহমাতুল্লিল 'আলামিন হযরত আবদুল্লাহ্‌কে এর অনুমতি দিলেন না। অতঃপর মদীনা পৌছে হযরত আবদুল্লাহ (রা) স্বীয় পিতার পথ বন্ধ করে বললেন ঃ 'যে পর্যন্ত তুমি নিজেকে অপমানিত হবার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্মানিত হবার অঙ্গীকার না কর., সে পর্যন্ত তোমাকে মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুকুম লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার পথ বন্ধ করে রাখেন ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের যে অসাধারণ ভক্তি, অনুরক্তি এবং আনুগত্য ছিল তা অতুলনীয় । হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় মক্কার পৌত্তলিকদের তরফ থেকে দূত হিসেবে এসেছিল ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ মক্কী। সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান দরবারে যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছে তার বিবরণ দিয়েছে মক্কাবাসীর নিকট । তার ভাষায় লক্ষ্য করুন ঃ

বেরাদরানে কুরায়শ।

আমি দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহদের দরবারে গমন করেছি। রোমের বাদশাহ, পারস্যের রাজা, আবিসিনিয়ার বাদশাহ সহ বহু বড় বড় দরবার

www.pathagar.com

দেখেছি। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) থু-থু ফেললে তাঁর ভক্তরা তা হাতে হাতে নিয়ে নেয় এবং পায়ে ও মুখমন্ডলে মেখে দেয়। তিনি যখন ওযূ করেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির একটি ফোঁটা লাভের জন্য এমন প্রতিযোগিতা করেন যেন লড়াই করছেন। তিনি কোন আদেশ দিলে প্রত্যেকেই সবার আগে সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হয়। তাঁর সম্মুখে কোন লোক উচ্চস্বরে কথা বলে না। তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে কেউ দেখে না। -মুসলিম শরীফ

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ছেলে কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। অবশ্য পরে তিনি ইসলাম কবূল করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-কে তিনি বলছিলেনঃ 'আব্বাজান, বদরের যুদ্ধে কয়েকবারই এমন সময় এসেছিল আপনি আমার কাছে এসে গিয়েছিলেন। আমি ইচ্ছা করলে আপনার প্রতি তরবারি দ্বারা আঘাত করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আপনি আমার পিতা এজন্য আমি তা করিনি'। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন : 'আমি তোমাকে বদরের রণাঙ্গনে দেখিনি। যদি আমি তোমাকে দেখতাম তবে নিজ হাতে তোমাকে কতল করতাম। কেননা, তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলে'। ওহুদের যুদ্ধের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে দুশমনরা তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুধু এতটুকু বললেনঃ "কে আছ, যে আমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াতে পার'? একথা শ্রবণমাত্র একজন সাহাবী তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। আর দুশমনের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো নিজের বুক পেতে নিয়ে নিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তাঁর দেহে প্রায় ৮০টি তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু একটিও তাঁর পৃষ্ঠদেশে বা পাঁজরে নিক্ষিপ্ত হয়নি। বরং সবই তার দেহের সম্মুখ ভাগেই হয়েছে। এই ওহুদের যুদ্ধের আর একটি ঘটনাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন মহিলার স্বামী, পিতা এবং ভ্রাতা সকলেই শাহাদত বরণ করেন। তিনি মদীনা শরীফের এই খবর শ্রবণ করে দ্রুত ওহুদ রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে আসতে দেখে একজন সাহাবীকে এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, 'এই

www.pathagar.com

মহিলাকে বল সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনের লাশের কাছে এই মুহূর্তে না যায়। কেননা শহীদদের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে, যা দেখলে তার ক্ষতির আশংকা আছে'। এই সাহাবী দ্রুতবেগে তার নিকট হাযির হয়ে বললেনঃ 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আত্মীয়-স্বজনের লাশ দেখতে বারণ করেছেন'।

তিনি বললেন ঃ 'আমি আমার স্বামী পিতা ভ্রাতাকে দেখতে আসিনি। আমি শুনেছি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েছেন এবং তাঁর দেহ মুবারক থেকে রক্ত ঝরছে । আমি তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য এসেছি।' উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-তিনি যখন আবিসিনিয়ায় তাঁর স্বামীসহ হিজরত করেন তখন কিছুদিন পরই তাঁর স্বামীর ইন্তিকাল হয়। পরবর্তীকালে কুরায়শ সরদার আবূ সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবার বিয়ে হয় স্বয়ং প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে। সপ্তম হিজরীতে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান মদীনা শরীফে এলো। মদীনা শরীফে তার কন্যা উম্মে হাবীবা (রা) রয়েছেন। তাই আবূ সুফিয়ান সরাসরি হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-র ঘরে এলো। হযরত উম্মে হাবীবা পিতাকে দেখে ঘরে বিছানো ফরাস তুলে ফেললেন। উম্মে হাবীবাকে এই অবস্থায় দেখে তাঁর পিতা জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুমি আমাকে দেখে ফরাস কেন তুলে ফেললে'?

হযরত হাবীবা বললেনঃ এই বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম । আপনি আমার পিতা ঠিকই কিন্তু আপনি কাফির। তাই আপনাকে তাঁর পবিত্র বিছানায় বসতে দিতে পারি না।'

মক্কা বিজয়ের দিন যখন ১০ হাজার সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন কিশোর এবং যুবকরা আনন্দে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিচ্ছিলেন। এই সময় অতি আনন্দের কারণে হযরত উমর (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র তরুণ ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে চলে গিয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত উমর (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পুত্রকে সজোরে ধাক্কা দিলেন এবং বললেন ঃ 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগে যাচ্ছ? কিন্তু পিতার ধাক্কায় পুত্র

www.pathagar.com

পাথরের উপর পড়ে গেলেন এবং তার একটি পা ভেঙে গেল। এক সাহাবীর কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্র পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে খেলছিল। সেই সাহাবী বললেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই খেলার ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অতপর তুমি এই খেলা পরিত্যাগ কর।' সে কিছুক্ষণের জন্য বিরত রইল । যখন পিতৃব্যকে দেখলো তিনি তাঁর কাজে মশগুল হয়েছেন। তখন সে পুনরায় খেলতে লাগলো। তখন সাহাবী বললেনঃ 'আমি তোমাকে বলেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই খেলা নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি খেলছো ? যাও তোমার সঙ্গে আর জীবনে কথা বলবো না।' যেমন কথা তেমনি কাজ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করার কারণে ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আর তিনি কথা বলেননি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের তিন দিন পর সিরিয়া থেকে একজন ইহুদী ইসলাম কবূল করে মদীনা মুনাওয়ারায় এলেন। এখানে সকলেই ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শোকে মুহ্যমান। এই নওমুসলিম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দীদার থেকে মাহরুম হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে তাঁর এই বদনসিবী হলো। তিনি এজন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনি হযরত বিলাল (রা)-এর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কেননা তিনি ছায়ার ন্যায় সারাজীবন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু হযরত বিলাল (রা) -কে যখন ঐ ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার অনুরোধ করলেন, তখন তিনি বললেন 'আমার পক্ষে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর একটি বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়। আপনি বরং হযরত ফাতিমা (রা)-র শরণাপন্ন হোন। তিনি তাঁর মহান পিতা সম্পর্কে হয়ত কোন বিবরণ দিতে পারবেন। হযরত ফাতিমা (রা)-র নিকট আরজ করলে তিনি বললেন, আমার মহান আব্বাজানের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ

www.pathagar.com

দেয়া আমার সাধ্যাতীত। অতএব আপনি এই উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা) –র সঙ্গে দেখা করুন । তিনি হয়ত এ সম্পর্কে আপনাকে একটি বিবরণ দিতে পারবেন।' এই ব্যক্তি হযরত আলী (রা) –র নিকট গমন করে তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ণনা করলেন।

হযরত আলী (রা) বললেনঃ 'পৃথিবীতে যত কিছু আছে তার একটি বিবরণ আপনি পেশ করুন। লোকটি বললেনঃ পৃথিবীতে অগণিত দ্রব্য সম্ভার রয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র অনন্ত অসীম কুদরত হিকমতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাঁর কত বিস্ময়কর সৃষ্টি রয়েছে তা জানা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় । অতএব পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার বিবরণ পেশ করা আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে?' তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রীকে 'কালীন' বা সামান্য বলেছেন আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান চরিত্র মাধুর্যকে 'খুলকে আজীম' বা মহান শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা নগণ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন তার বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন–চরিতকে মহান শ্রেষ্ঠ বলেছেন তার বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে'?

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন ঃ তাঁর মহান চরিত্র হলো কুরআন মজীদ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা রয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূতপবিত্র জীবনে। তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন। তাঁকে বুঝতে হলে পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হবে, আর পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে।'

আমরা এ পর্যায়ে একটি পবিত্র ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যা দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম তাঁর প্রতি যে ভক্তি, অনুরক্তি পোষণ করতেন তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে। এর পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের সম্পর্কের অবস্থাও প্রকাশ পাবে।

www.pathagar.com

যখন তাঁরা প্রিয়নবী (সা)—র দুয়ারে হাযির হলেন

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে হাযির হলেন হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত আলী (রা)। হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)–কে বললেনঃ 'হুযূরের দুয়ারে সর্বপ্রথম আপনি করাঘাত করুন'। কিন্তু আবূ বকর (রা) বললেনঃ 'আপনি করাঘাত করুন'। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ 'হে আলী, আপনি অগ্রগামী হোন'। তখন হযরত আলী (রা) বলেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যার সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার পরে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যের উদয়ও হবে না, অস্তও যাবে না, যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে উত্তম।'

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি মেয়েদের মধ্যে যিনি উত্তম (হযরত ফাতিমা (রা) তাঁকে পুরুষদের মধ্যে যিনি উত্তম হযরত আলী (রা) তাঁর নিকট প্রদান করেছি ।'

তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না , যার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে হযরত ইব্রাহীম (আ)–এর বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছা করে, সে যেন আবূ বকর সিদ্দীকের বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে।'

এর জবাবে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যার ইচ্ছা হয় হযরত আদম (আ)–এর বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যে ইচ্ছা করে ইউসুফ (আ) ও তাঁর সৌন্দর্যকে দেখে, মূসা (আ) ও তাঁর নাযাত প্রত্যক্ষ করে, ঈসা (আ) ও তাঁর দুনিয়াত্যাগী ভাব লক্ষ্য করে এবং যার ইচ্ছা হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রত্যক্ষ করে তার উচিত আলী (রা)–কে দেখা।'

www.pathagar.com

তখন হযরত আলী (রা) বললেনঃ 'আমি এমন ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের ময়দানে আক্ষেপ করার এবং লজ্জা পাওয়ার দিনে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একজন আহ্বায়ক এই বলে আহবান করবে, "হে আবূ বকর আপনি আমার প্রিয়জনদের নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করুন।"

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, 'যাঁর সম্পর্কে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুনায়ন এবং খায়বরের যুদ্ধের দিনে যখন তার নিকট দুধ এবং খেজুরের হাদিয়া পেশ করা হয় তখন বলেছিলেন এই হাদিয়া হলো আলী ইবনে আবূ তালিবের জন্য।

তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের একটি যানবাহনের উপর আরোহণ করে যখন আলী আসবে, একজন মুনাদী বলবেঃ হে মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আপনার জন্য দুনিয়াতে ছিল উত্তম পিতামহ, উত্তম ভাই। উত্তম পিতামহ হলেন হযরত ইব্রাহীম (আ) এবং উত্তম ভাই হলেন হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)।

তখন হযরত আলী (রা) বললেনঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন বেহেশতের খাজেন রিযওয়ান নামক ফেরেশতা আসবেন--জান্নাত ও জাহান্নামের চাবিগুলো সংগে আনবেন এবং বলবেন, হে আবূ বকর, আল্লাহ্ তা'আলা সালাম দিচ্ছেন এবং বলেছেন, বেহেশতের ও দোযখের এই চাবিগুলো গ্রহণ করুন এবং যাকে ইচ্ছা বেহেশতে এবং দোযখে প্রেরণ করুন।'

তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন : আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এসে বলেছে, হে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং ইরশাদ

www.pathagar.com

করেছেন ঃ আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং ভালবাসি আলীকে। তখন আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদারত হলাম এবং ফাতিমা (রা)-কে আমি পছন্দ করি, তখন শোকরানার সিজদা দিলাম। এরপর ইরশাদ করেন, আমি ভালোবাসি হাসান-হুসাইনকে। তখনও শোকরগুজার হয়ে সিজদারত হলাম'।

হযরত আলী (রা) বললেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যদি আবূ বকরের ঈমান পরিমাপ করা হয় আর ঈমান পরিমাপ করা হয় সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের তবে আবূ বকরের ঈমান অধিকতর বলে প্রমাণিত হবে।'

তখন আবূ বকর (রা) বললেনঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিযনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আলী (রা) তাঁর পরিবারবর্গসহ এমনভাবে সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসবে যে, কিয়ামতের ময়দানের শান-শওকত দেখে লোকেরা বলবে, এ কোন নবী, তখন বলা হবে, ইনি আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) '।

তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কাল কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা শ্রবণ করবে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ হে হযরত আবূ বকর, বেহেশতের ৮টি দরজার মধ্যে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর '।

তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে আমার এবং ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌র ইমারতের মাঝখানে থাকবে আলী ইবনে আবূ তালিবের ইমারত।'

এর জবাবে হযরত আলী (রা) বললেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আসমানের সমস্ত ফেরেশতা প্রতিদিন হযরত আবূ বকরের দিকে চেয়ে থাকে ।'

www.pathagar.com

এরপর আবূ বকর (রা) বললেন ঃ 'আমি এমন ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে এবং যাঁর পরিবারবর্গ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ তাঁরা খাবার খাওয়ান য়াতীম, মিসকীন এবং কয়েদীকে নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও।

এরপর হযরত আলী (রা) বললেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তির আগে যেতে পারি না, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ আর যে সত্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর যে সেই সত্যকে স্বীকার করেছে তারাই হলো প্রকৃত পরহিযগার।'

এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হলেন এবং আরজ করলেন ঃ 'হে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং ইরশাদ করেছেন ঃ এই মুহূর্তে সাত আসমানের সমস্ত ফেরেশতাগণ তাকিয়ে আছেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা)-র দিকে এবং তাদের আলোচনা শ্রবণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ভাব ভক্তি, আদব এবং মধুর ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। অতএব আপনি তাঁদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ হয়ে একটা মীমাংসা করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়কে তাঁর রহমত এবং সন্তুষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে মধুর ব্যবহার এবং ঈমান ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে এলেন এবং জিবরাঈল (আ) তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উভয়ের কপালে চুম্বন করলেন, আর বললেন ঃ 'যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র কালি হয় আর সমস্ত বৃক্ষ কলমে পরিণত হয়, আর আসমান-জমীনের সমস্ত অধিবাসী লিখতে থাকে তবুও তোমাদের ফযীলত এবং সওয়াবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হবে না।'

www.pathagar.com

উসওয়াতুন হাসানা

অধ্যাপক এম. এ. রকিব

যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষের আগমনে পাপ–পঙ্কিলে নিমজ্জিত মানবজাতি সত্যের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে, যাঁদের সত্যোজ্জ্বল মহিমার আলোকচ্ছটায় বিশ্ব প্রকৃতি উৎফুল্ল হয়েছে, বিদায় নিয়েছে অন্যায় , অসত্য ও জুলুম আমাদের একমাত্র উসওয়াতুন হাসানা' মহানবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সা) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ।

ষষ্ঠ শতাব্দীর জাহিলিয়ায় সেই চরম অন্ধকার যুগে আরবের উষার মরুর বুকে শান্তির বাণী ও নূরে হিদায়াত নিয়ে আবির্ভূত হন। তিনি এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন এবং নিজে 'উসওয়াতুন হাসানা' হিসেবে উত্তম চরিত্র ও মহা আদর্শের স্বর্ণ–স্বাক্ষর রাখেন। বলা বাহুল্য, মানবেতিহাসের সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি এমন অবদান রাখা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি ।

বস্তুত তাঁর কর্মময় জীবনের ইতিহাস এক বিরামহীন শান্তি প্রচেষ্টার মহান ইতিবৃত্ত। জীবন প্রভাতে তথা কিশোর বয়সে তিনি আরবের বুকে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং সমমনা যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে কল্যাণধর্মী একটি সেবা সংস্থা গঠন করেন–এর মূল লক্ষ্য ছিল নিঃস্ব ও অসহায়দের সেবা করা। অত্যাচারীদের বাধা দান, বঞ্চিতের আশ্রয় এবং বিভিন্ন গোত্রে শান্তি এবং শৃংখলা স্থাপন এবং সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি।

ওহী নাযিল হবার সংকটময় মুহূর্তে মহানবী (সা)–কে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রা) সান্ত্বনার সুরে বলেন, 'আপনি য়াতীমবর্গের প্রতি দয়াশীল, পথের আতুর ও কাঙ্গাল এমনকি বিধর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়ার মূর্ত প্রতীক, অতিথিপরায়ণ, শান্তিপ্রিয় ও বিপদের বন্ধু। তাই আপনার ভয়ের কারণ নেই।'

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, কাবাঘর পুনঃনির্মাণে হাজরে আসওয়াদ (কালো বর্ণের পাথর) পুনঃ স্থাপনে গোত্রীয় কোন্দলের মীমাংসা ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে বাল্য বয়সেই মহানবী (সা) উত্তম চরিত্রের এবং মহাযোগ্যতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, ইতিহাসের পাতায় তা সোনালী অক্ষরে লিখিত আছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা)–এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে তিনি একত্রিত করে মদীনার বুকে সর্বপ্রথম একটি কল্যাণরাষ্ট্র কায়েম করেন। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে (মজলিসে শুরার পরামর্শ মুতাবিক) তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করে বিশ্ব–শান্তির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, এক সুন্দর শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন যা রোমান ও পারসিকদের প্রাচীন ব্যবস্থাকে ভূলুণ্ঠিত করে, যা বিশ্বের বুকে মুসলিম জাতির জন্য এক বরকতময় ও শান্তিময় সোনালী ইতিহাস সৃষ্টি করে।

তদানীন্তন বিশ্বে তিনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সৌহার্দের নীতিমালায় বিশ্বাসী হয়ে পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মক্কা বিজয়ের পর শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি ক্ষমা করে উদারতা ও মহানুভবতার নজীর স্থাপন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সংখ্যালঘুদের সাথে ভালো ব্যবহার দেখান এবং তাদের নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রত্যেক নর–নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, জ্ঞানীর ব্যবহৃত কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম হেরার গুহায় যে আয়াত নাযিল হয় তা ছিল 'ইক্‌রা' (পাঠ করো)–এ জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় অনুপ্রেরণা।

মহানবী (সা)–র উত্তম আদর্শানুযায়ী শিক্ষা হচ্ছে দীক্ষার জন্য–ভিক্ষার জন্য নয়। প্রকৃত সায়েল (প্রার্থীকে) শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না বরং ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণ্য–এ দু'টো তাঁরই অমর বাণী। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতির নামে নীতি বর্জন করলে তা ধ্বংস ডেকে আনতে বাধ্য। ইসলামে ঈমান বিল গায়ব ও তকদিরে বিশ্বাস–এর গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা, এ দু'টির ভুল ব্যাখ্যায় আদম সন্তানের

www.pathagar.com

ঈমানহারা হবার ভয় সর্বাধিক বলে তিনি জানান। মানুষকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মুসলমানের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত দু'টি আলাদা কিছু নয়–আত্মিক পারমাণবিক শক্তির বিকাশে ও আপন কর্মশক্তির দ্বারা মানুষ বুররাকের বিদ্যুৎ বাহনে সিদ্‌রাতুল মুনতাহার উচ্চমার্গে পৌঁছাতে সক্ষম এবং জগতের সকলকে দয়া ও সমগ্র বিদ্বেষ বিশ্বের মুক্তির কল্যাণের জন্য ঐতিহাসিকভাবে অমর কীর্তি ও খিদমতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন কোনটাই আশরাফুল মাখলুকাতের জন্য অসম্ভব নয়। কাজেই, শান্তি, প্রগতি, আদল এবং ইনসাফের জন্য কাজ করে'উসওয়াতুন হাসানা'–এর নমুনার অনুসরণ ও অনুকরণ জাতি হিসেবে, উম্মত হিসেবে আমাদের সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

বস্তুত আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মখলুকাতের জন্য ছিলেন শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার আদর্শ প্রতীক। তাঁর উক্ত রূপ ও গুণরাজির প্রতিফলন বিধৃত হয়েছে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁর আচার–ব্যবহারে এই রহমতস্বরূপ চরিত্রের বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করেছেন । মানব জাতির জন্য আনেন মহাকল্যাণের বাণী এবং জীবনে অশেষ দুঃখ যাতনা সহ্য করেও সে বাণী প্রচার করেন । সীমাহীন ত্যাগ–তিতিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানবতার মহাকল্যাণের বাণী বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং সত্যিকার রূপায়ণই আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ মুসলিম সমাজে। যে সমাজের একজন আমিরুল মু'মিনীন একবার ঘোষণা করেনঃ 'এখান থেকে দূরে ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায়, তবে এর জন্যও উমরকে আল্লাহ্‌র মহান দরবারে জবাবদিহি হতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা) ছিলেন মানুষের নবী এবং তিনি মানুষের মধ্য থেকেই আগত । তিনি ফেরেশতা বা জ্বিন জাতি থেকে মানুষের নবী হয়ে আসেননি, তাই মানুষের দুঃখ–বেদনা, হাসি–কান্না ও আশা–আকাঙ্ক্ষার সাথে ছিলেন গভীরভাবে পরিচিত। সে জন্যই মানুষের দুঃখ ক্লেশ দূর করার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল একজন দরদী ভুক্তভোগীর মতই আন্তরিক এবং সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে একজন মহাপ্রতিপত্তিশালী নরপতির ঘরেও জন্ম দিতে পারতেন , কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ্র মহাসম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । বাল্যকাল থেকেই তাঁকে সকল দুঃখ মুসিবত হতে দূরে রেখে শান্তি ও সমৃদ্ধির জীবনেও লালন করতে পারতেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব মানবতার মহান দরদীকে দশজন দুঃখী মানুষের মাঝেই প্রেরণ করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি দুঃখ-দারিদ্র্য আর সমস্যা-সংকটের মধ্যে প্রতিপালিত হন। ফলে মানুষের সকল দুঃখ-কষ্ট তিনি প্রথমে নিজে সহ্য করে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং কর্মজীবনে দুঃখী মানুষের কষ্ট যে কত গভীরে বিস্তৃত থাকে, এক বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি সেসবের মুকাবিলা করেন । যে অন্ধকার যুগে মহানবী (সা)-র আগমন হয়েছিল, তাকে যুদ্ধের যমানা (আইয়ামুল হরব)-ও বলা হতো। সে যুগের যুদ্ধ বিধ্বস্ত আরবের করুণ দৃশ্য দেখে কিশোর নবীর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে । মক্কার কয়েকজন উন্নতমনা যুবককে নিয়ে তাই তিনি গঠন করেন 'হিলফুল ফুযুল' নামক সেবাসংস্থা । যুবকরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেন।

ক. আমরা নিঃস্ব ও অসহায় দুর্গতদের সেবা করবো ।

খ. দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করবো ।

গ. দেশের দুঃখী মানুষের সেবা করবো।

ঘ. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেবো।

ঙ. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবো।

উল্লেখিত সংস্থা নৃশংস বর্বর জীবনে অভ্যস্ত আরবের বেদুইনদের মধ্যে কল্যাণ প্রচেষ্টার যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে আরবের জনগণ কিশোর মুহম্মদ (সা)-কে আল-আমীন বা বিশ্বস্ত জন খিতাব দিয়েছিল- যা বিশ্বমানব মনের মণি কোঠায় সশ্রদ্ধভাবে সংরক্ষিত।

বস্তুত মানবতার কল্যাণে মহানবী (সা)-র প্রচেষ্টা যে কতটুকু আন্তরিকতাপূর্ণ ছিলো তা হযরত খাদীজা (রা)-র ঐতিহাসিক বাণী থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, যা তিনি ওহী নাযিলের সময় বলেছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত নবী (সা)-কে

www.pathagar.com

লক্ষ্য করে ঃ 'আল্লাহ্, আপনাকে কখনও বিপন্ন করবেন না । কেননা আপনি য়াতীম, বিধবা, পংগু অসহায়ের সেবা করেন। প্রতিবেশীর খবর নেন। কারো কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কামনা করেন না। আপনার ভীত হ'বার কোন কারণ নেই ।' আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারেও মুহাজিরদের 'রসূল পরিচিতির' সময় তাঁরা মুক্তকণ্ঠে মহানবী (সা)-র মানব কল্যাণ ও জনসেবার কথাই প্রকাশ করেন। মক্কার জীবনে অত্যন্ত সংকটজনক দিনগুলোতেও তিনি রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে দেখতেন কা'বা প্রাঙ্গণে কোন বিদেশী মুসাফির না খেয়ে আছে কিনা, কোন গৃহহারা ছিন্নমূল, অসহায় য়াতীম নিরাশ্রয়ে কষ্ট পাচ্ছে কিনা । তারপর তিনি নিজের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, আর্থিকভাবে অভাব-অনটনের ভেতরেও দুর্গত জনমানবের সাধ্যমত সেবা করতেন। একবার এমনি এক রাত্রি যাপন অভিযানে ত্যাগী সাহাবী আবূ যর গিফারী (রা)-র সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় কা'বা প্রাঙ্গণে। পরে উক্ত সাহাবীকে নিয়ে তিনি গৃহে ফেরেন এবং তাঁর মারফত সর্বহারার প্রতি দরদী নবীর খিদমতের অনেক গোপন তথ্য জানা যায়। হযরত খাদীজা (রা)-র সাথে মহানবী (সা)-র শাদীর পর উম্মুল মু'মিনীন তাঁর যাবতীয় সম্পদ স্বামীর হাতে তুলে দেন। মহানবী (সা) সম্পদের প্রায় সবটুকু দুস্থ মানুষের কল্যাণে দান করেন। মক্কার বহু মজলুম ক্রীতদাস তাঁর অর্থানুকূল্যে মুক্ত হন, বহু দরিদ্র ও বেকার শ্রমিক বিপুলভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আসহাবে সুফফার শতাধিক লোকের ভরণ-পোষণের ভার ছিল মহানবী (সা)-র উপর। ফলকথা, তিনি যখন যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থার মধ্য থেকেই আর্তের সেবা ও দুস্থ মানবতার কল্যাণ করে গেছেন। মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য তিনি ছয়টি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেন ঃ ১. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য খাদ্য, ২. বাসস্থান, ৩. বস্ত্র, ৪. শিক্ষা, ৫. চিকিৎসা এবং ৬. বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা । উক্ত ছয়টি অধিকার সুনিশ্চিত করে মহানবী (সা) মুসলিম জনতাকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করার আহবান জানান। আর এতে শুধু মুসলমান নয়, মুসলিম-অমুসলিম সবাই এসব অধিকার সমানভাবে ভোগ করত। মানবতার কল্যাণের মহান দূত হিসেবেই হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। তাঁর দেয়া জীবন বিধান মতে মানব হত্যা

www.pathagar.com

তো দূরের কথা, অকারণে একটি পিপঁড়াকেও কোন কষ্ট দেয়া যাবে না, কোন ডাল ভাঙ্গা যাবে না। নিজের সামান্য সুবিধার জন্য হলেও অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করা চলবে না। যবেহ্ করার সময়ও কোন প্রাণীকে অযথা কষ্ট দিয়ে যবেহ্ করা অন্যায় বলে তিনি উম্মতদের সতর্ক করে গেছেন। অহেতুক অন্যায়ভাবে জীব হত্যা মহাপাপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নির্বাচিত অবহেলিত নারী জাতিকে মাতৃত্বের অলংকারে ভূষিত করেন । তিনি পরিবারে ও সমাজে নারীর অধিকার ঘোষণা করেন। বিদায়কালে তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ সাবধান! 'নারীদের উপর তোমরা অন্যায়ভাবে প্রভুত্ব করার চেষ্টা করো না'। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে-'আমি কাকে সম্মান প্রদর্শন করবো'। তার উত্তরে তিনি বলেছেনঃ 'তোমার মাকে'। এরূপ তিনবার উত্তর দেয়ার পরে বলেছেন ঃ 'তোমার বাবাকে'। তিনি বলেন ঃ বেহেশতের স্থিতি মায়েদের পায়ের তলে'। কোন মতেই নারীর অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেজন্য তিনি উম্মতদের বারবার বলে গেছেন। ক্রীতদাস ও দাসীদের ব্যাপারে তিনি যে মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন বিশ্বের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই। যদিও আকস্মিকভাবে তিনি দাস প্রথা তুলে দেননি। কিন্তু দাসদের দুরাবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। তিনি বলেনঃ 'তোমাদের দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই-বোন। তাদের উপর শক্তি বহির্ভূত কাজ চাপিয়ে দিও না বরং কাজের সময় তোমরা নিজেরাও তাদের সাহায্য করবে। তোমরা যা খাবে এদেরও তা খেতে দেবে। যা পরবে এদেরও তা পরতে দেবে। চিরবিদায় মুহূর্তেও মানবতার দরদী মহানবী (সা)-র যবান মুবারক হতে দু'টি কথাই উচ্চারিত হচ্ছিলো ঃ ১. সালাত! সালাত! ২. 'তোমাদের দাস-দাসী-এদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একদিনের ঘোষণায় তিনি দাসপ্রথা আকস্মিকভাবে তুলে দেননি বরং তাঁর দেয়া বিধান (যা তিনি পরবর্তীদের জন্যে রেখে গিয়েছেন) অনুযায়ী দাসপ্রথা ইসলামী সমাজ থেকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। হঠাৎ তুলে দিলে তদানীন্তন সমাজ কাঠামোতে ছিন্নমূল মানুষের আর একটি সমস্যা সৃষ্টি হতো এবং সামাজিক দিক দিয়ে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করত। তাই, তিনি এমন এক ব্যবস্থা রেখে যান যার ফলে প্রতি ঘরে ঘরে দাসদের জীবন যাত্রার

www.pathagar.com

মানোন্নয়ন হয় এবং তারা উন্নত ও রুচিশীল জীবনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে অনিবার্যভাবে মুক্ত হতে পারে এবং মুক্ত জীবনে যাতে তারা সহজভাবে অন্যান্য নাগরিকের সাথে একাত্ম হবার সুযোগ লাভ করে। ফলে, পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীনের যমানাতেই যেমন দাসপ্রথা অবলুপ্ত হয়ে আসে, তেমনি ইসলামী সমাজে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আমেরিকার মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মতো একটি পৃথক সমাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেননি ! তাঁরা শুধু সম্মানিত জীবনই পাননি–সমাজের সর্বস্তরে এমনকি কেউ কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হন। স্লেভ ডাইনেস্টিগুলোই এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করেছে যুগে যুগে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত সমাজে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণ বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ইউরোপ, আমেরিকার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী শ্বেতকায় সমাজে ও ভারতের বর্ণশ্রী সমাজে পূর্ণভাবে কার্যকরী হবার কোন লক্ষণ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (সা) মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক মানবীয় অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধে আরাফাতের উন্মুক্ত প্রান্তরে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন, ইসলামী সমাজে আজও তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হচ্ছে। বিদায় হজ্বের অবিস্মরণীয় খুতবায় তিনি বলেন ঃ 'হে জনতা, তোমাদের সবার প্রভু এক, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান এবং আদম তৈরি হয়েছে মাটি থেকে। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্র নিকট বেশি সম্মানিত, যে তাকওয়ার অধিকারী'।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ নজর রেখে ইসলাম ধন বন্টনের ক্ষেত্রে সুষম বন্টনের বিধান করেছে এবং এভাবেই অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করেছে। জীবিকা অর্জনে স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হলেও ইসলামে ভোগ বিলাসী পুঁজিবাদ ও মুনাফাখোরী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জনসাধারণকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সুদ-ঘুষ, জুয়া, মজুদদারি ও কালোবাজারিকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে। মানব দরদী মহানবী (সা) ঘোষণা করেন ঃ

www.pathagar.com

১. খাদ্যশস্য দুর্মূল্যের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত গুদামজাত করে জনগণের অশেষ দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি করে, সে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলো এবং আল্লাহ্‌রও তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। –আল-হাদীস

২. পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি রহমশীল (সদয়) হও, আল্লাহ্‌ও তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। –আল-হাদীস

৩. পরোপকারী ব্যক্তি হলেন মহান ব্যক্তি। –আল-হাদীস

৪. সে মু'মিন নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশের বাড়ির লোক উপোস করে। –মিশকাত শরীফ

৫. প্রত্যেক মুসলিমের উপরেই দান করা ওয়াজিব। –আল-হাদীস

৬. যাকাত ছাড়াও তো তোমাদের মালে গরীবদের হক রয়েছে।

–বুখারী শরীফ

উল্লেখ্য অভাবীদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের অবশ্য কর্তব্য। সরকার অক্ষম হলে তা জনগণের বিরাট দায়িত্ব। কিন্তু যদি কেউ দায়িত্ব পালন না করে, তবে সকলকেই আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি হতে হবে।

www.pathagar.com

য়াতীম-মিসকীনের বন্ধু হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মুস্তাফীজ বিন শিহাব

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটা গুণবাচক নাম নবীউর রহমাত-দয়া ও করুণার নবী। পবিত্র কুরআনে এ নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্ বলেন, ('হে রসূল) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি রাহমাতুললিল আলামীন করে।' —সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রহমত ও অনুগ্রহ ছিলো সুদূরপ্রসারী ও অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যই তাঁকে য়াতীম-মিসকীনের বন্ধু ও একান্ত আপন করে তোলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজেও ছিলেন য়াতীম। মিসকীনের সাহচর্য ছিলো তাঁর একান্ত কাম্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

'(হে রসূল) তিনি কি তোমাকে য়াতীম অবস্থায় পাননি ? আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব (মিসকীন), অতঃপর অভাবমুক্ত করেন। সুতরাং তুমি য়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না আর ভর্ৎসনা করো না কোন প্রার্থীকে। আর তুমি তোমার প্রভুর অনুগ্রহের কথা অবহিত করিও।' —সূরা দুহা ঃ ৬-১১

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম য়াতীম-মিসকীনদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মূলত আল্লাহ্র নিকটেও য়াতীম-মিসকীন অধিকতর প্রিয়।

www.pathagar.com

অভাবী ও য়াতীমদের পরিচর্যা করা, তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, ভালোবাসার পরশে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তুমি কি তাকে দেখেছো, যে কর্মফল দিবস অস্বীকার করে ? সে তো য়াতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে (রূঢ়ভাবে) ফিরিয়ে দেয় আর উৎসাহিত করে না (নিজেকে বা অন্যকে) মিসকীনদের অন্ন দানে।' –সূরা মাউন

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের এ সতর্ক বাণীর অর্থ দাঁড়ায়–যে ব্যক্তি য়াতীম-মিসকীনকে বিমুখ করে ও তাদের একান্ত আপনরূপে গ্রহণ করে না তারা প্রকারান্তরে কিয়ামতকে অস্বীকার করে। অন্য কথায় কিয়ামতের উপর ঈমান আনার অপরিহার্য ফল হলো দুঃখী ও অভাবীদের ভালোবাসা। যে ব্যক্তি মনে করে যে, ধন-সম্পত্তির মালিক আল্লাহ্, সুতরাং তা আল্লাহ্র নির্দেশেই ব্যয় করতে হবে। অন্য কথায় কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে, তার পক্ষে য়াতীম-মিসকীনকে ভালো না বেসে উপায় নেই। কুরআন মজীদে য়াতীমের ধন-সম্পদ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'য়াতীম বালিগ না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং ওয়াদা পালন করবে। ওয়াদা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। –সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩৪

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র এই বাণী শুধু প্রচারই করেননি। বরং প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন সর্বাগ্রে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করতেন, 'হে আল্লাহ্, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপেই আমার মৃত্যু ঘটাও আর হাশর-নশরও কর মিসকীনদের সঙ্গে।'

–কিতাবুয যুহদ ঃ তিরমিযী শরীফ

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিসকীনদের প্রতি যে কতোখানি দরদী ছিলেন, য়াতীম-মিসকীনদেরকে কতোখানি মর্যাদা দিতেন তা তাঁর উক্ত মুনাজাতে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

একবার এক সদ্য পিতা হারোনো য়াতীম এসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জানালেন যে, তার পিতার যাবতীয় সম্পত্তি আবূ

www.pathagar.com

জেহেলের কাছে গচ্ছিত, অথচ সে এখন তা তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করছে। য়াতীমের বন্ধু দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ অভিযোগ শোনামাত্রই আবূ জেহেলের কাছে গিয়ে বললেন–'ওর আব্বার সহায় সম্পত্তি এখনই এই মুহূর্তে ওর হাতে সমর্পণ করুন। ওর অভাব কি আপনার হৃদয় নাড়া দেয় না?' অমনি আবূ জেহেল য়াতীমটির পিতার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলো।

একবার এক ঈদের দিনে এক অসহায় ছেলে রাস্তার পাশে কাঁদতে থাকলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গিয়ে তার অবস্থাদি জানলেন এবং তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে আপন ছেলের মতো তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলেন।

মূলত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সারাটা জীবনই য়াতীম-মিসকীন ও অসহায়দের সাথে এরূপ ব্যবহার করে আসছেন। তিনি তাঁর নিজের ও য়াতীম-মিসকীনের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। তিনি বলতেনঃ 'আমি ও য়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণকারী জান্নাতে একসংগে থাকবো।'

–বুখারী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন, 'আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে জান্নাতের কড়া নাড়া দেবে। এবং আমার সঙ্গে থাকবে দরিদ্র মু'মিনগণ। [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ঃ মিশকাত শরীফ।] অন্য একটি হাদীসে আছে, প্রিয়নবী (সা) বলেছেনঃ মু'মিনদের মধ্যে কেউ যদি কোন য়াতীমকে লালন-পালনের জন্যে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সে যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ্ না করে তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।'

–তিরমিযী শরীফ

য়াতীম-মিসকীনেরা আমাদের ধন-সম্পদ স্বরূপ। সে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন নয়। বরং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'তোমরা দরিদ্র লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো এবং তাদের প্রতি সাধ্যানুযায়ী অনুগ্রহ ও উপকার কর। আখিরাতের পথে তারা তোমাদের জন্যে সংগৃহীত ধন

www.pathagar.com

এবং প্রধান সম্বল।' উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা আমাদের জন্য কি প্রকার ধন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'কিয়ামতের দিন দরিদ্রের প্রতি আদেশ করা হবে যে, যারা পৃথিবীতে তোমাদেরকে এক লোকমা অন্ন, এক ঢোক পানি কিংবা এক খণ্ড বস্ত্র দান করেছে, আজ তোমরা তাদের হাত ধরে টেনে বেহেশতে চলে যাও।'

–কিমিয়ায়ে সা'আদাত : ইমাম গাজ্জালী (র)

য়াতীম–মিসকীন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্‌র নিকট তাদের মর্যাদা অভাবনীয়। সে কথা রসূলে করীম (সা)–এর হাদীসে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন : 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, দেখো তো, আমার বিশেষ প্রিয় বান্দারা কোথায়?' ফেরেশতারা নিবেদন করবে, 'হে আল্লাহ্, কারা আপনার বিশেষ প্রিয় বান্দা, আল্লাহ্ উত্তর দিবেন : 'তারা মুসলমান দরিদ্র লোক। যা কিছু আমি পৃথিবীতে তাদেরকে দান করেছি, তাতে তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিলো। তাদের সকলকেই জান্নাতে নিয়ে যাও।' আদেশ পাওয়ামাত্র ফেরেশতারা তাদেরকে সর্বাগ্রে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এদিকে অন্য সব মানুষ হিসাব–নিকাশের দায়ে আবদ্ধ থাকবে।

–কিমিয়ায়ে সা'আদাত : ইমাম গাজ্জালী (র)

য়াতীম–মিসকীনের বন্ধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন ছিল পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : 'যারা য়াতীমের ধন–সম্পদ জুলুম করে খায় তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের পেটে আগুনের খাদ্য ভরে আর অতিশীঘ্র তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।'

–সূরা নিসা : ১০

আল্লাহ্‌র এ ঘোষণা মহানবী (সা) তাঁর কর্মজীবনে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সবাইকে নির্দেশ করেন : 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাক : ১. আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জীব হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. য়াতীমের মাল খাওয়া, ৬. জিহাদ থেকে

www.pathagar.com

পালিয়ে যাওয়া, ৭. সতী-সাধ্বী মুসলিম রমণীর উপর ব্যভিচারের দোষ আরোপ করা।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃকিতাবুল আসায়া ঃ বুখারী

কুরআনে মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেন ঃ 'তোমরা য়াতীমদেরকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত দেখাশুনা করো এবং যোগ্য মনে করলে তাদের অর্থ সম্পদ ফেরত দাও আর বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের অর্থ সম্পদ তাড়াতাড়ি অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না এবং ধনী (অভিভাবক) ব্যক্তি য়াতীমের মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং গরীব (অভিভাবক) নিয়ম মাফিক খেতে পারবে। তাদের অর্থ-সম্পদ ফেরত দেয়ার সময় সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ্ হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।' -সূরা নিসা ঃ ৬

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মালেও নির্দিষ্ট করেছেন য়াতীমের অংশ। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের চার-পঞ্চমাংশ তিনি ব্যয় করে দিতেন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল বা জাতীয় ধন-ভান্ডারের মাধ্যমে মাতৃ-পিতৃহীন নাবালক মিসকীন, অসহায় পথিক এবং আল্লাহ্র রসূল ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কেননা, পবিত্র কুরআন নির্দেশ করেছে ঃ 'তোমরা যেসব সম্পদ গনীমত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রেখো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল, তার নিকটাত্মীয়-স্বজন, য়াতীম মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।' -সূরা আনফাল ঃ ৪১

য়াতীম-মিসকীন এবং অসহায়েরা না খেয়ে থাকবে আর তার পাশেই কেউ খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, এটা ইসলামের বিধান নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে নিজে পেট ভরে খায়, আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।'

-বায়হাকী, মিশকাত শরীফ

য়াতীম-মিসকীনদের লালন-পালন করার ফযীলত অনেক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আমি এবং য়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী

www.pathagar.com

জান্নাতে এরূপ (নিকটবর্তী) থাকবো। হুযূর (সা) তাঁর শাহাদত ও মধ্যম আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে (দু'জনের) দূরত্বটা দেখালেন।

-কিতাবুল আদাব ঃ বুখারী শরীফ

এখানে স্পষ্ট দেখা যায় যে, য়াতীম-মিসকীনের লালন-পালনকারী আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জান্নাতে অবস্থানের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকবে না।

য়াতীম-মিসকীনের পরিচর্যাকারী একজন মুজাহিদ কিংবা রাতভর সালাত আদায়কারী একজন আবিদের মতোই মর্যাদাবান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'বিধবা এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য সহায়তার চেষ্টাকারী সেই ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী, অথবা যে লোক (একাধারে) দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর সালাতে দাঁড়িয়ে কাটায়। -কিতাবুল আদাব ঃ বুখারী শরীফ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ ঐটি, যেখানে একজন য়াতীম বসবাস করে এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয় ; এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঐ গৃহ, যেখানে একজন য়াতীম বসবাস করে, কিন্তু তার প্রতি অসৎ ব্যবহার করা হয়। -ইবনে মাজাহ্ শরীফ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম য়াতীমের সাথে হাশর-নশর ও য়াতীম হিসেবেই জীবন-মরণ প্রত্যাশা করার কারণে হযরত আয়িশা (রা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা), আপনি কি জন্যে এমন দু'আ করেছেন?' হুযুর (সা) বললেন ঃ 'মিসকীনেরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়িশা, যদি অন্তত একটা খেজুর দানার দ্বারা সম্ভব হয়, তা দিয়েই মিসকীনদের খিদমত করো। হে আয়িশা, গরীব-মিসকীনকে ভালোবাসো এবং তাদেরকে নিকটে স্থান দাও। কারণ এরূপ করলে আল্লাহ্ কিয়ামতে তোমাকে নিকটে স্থান দিবেন।'

-তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, বায়হাকী শরীফ

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় শুধু দারিদ্র্যের হাহাকার। অথচ যে পরিমাণ সম্পদ পৃথিবীতে উপার্জিত হয়, তা সুন্দর সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করলে আর দারিদ্র্য থাকতে পারে না। কেউ কেউ শুধু সম্পদের পাহাড়ই গড়ে তুলছে। অথচ নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 'মানুষের জন্যে ঠিক ততোটুকু খাবারই যথেষ্ট, যা তাকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।

-তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ

শুধুমাত্র এ কথাটির প্রতি দৃষ্টি দিলেই বিশ্বে আর কোন খাদ্য সমস্যা থাকতে পারে না। থাকতে পারে না য়াতীম-মিসকীনের আহাজারী।

য়াতীম-মিসকীনের বন্ধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন ঃ 'এই ওহুদ পর্বত পরিমাণ আমার স্বর্ণ হোক তা আমি চাই না।'

-কিতাবুত তামান্না ঃ বুখারী শরীফ

প্রিয়নবী (সা)-র জীবনে তাঁর হাতে যতো ধন-সম্পদ এসেছে, সবই তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন য়াতীম-মিসকীনদের উদ্দেশ্যে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম না খেয়েও অনেক সময় অভাবীদের সাহায্য করেছেন। সেই মহান দরদী নবী (সা)-র উম্মত হিসেবে আমাদের উচিত তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে য়াতীম-মিসকীনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা, তাদের সার্বিক সহযোগিতা করা।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সা) - র প্রশাসনিক কাঠামো

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (সা) হচ্ছেন সমস্ত সুন্দর গুণের অধিকারী, কুরআনের ভাষায় 'উসওয়াতুন হাসানা'। তিনি পৃথিবীতে তশরিফ এনেছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্যে। সত্য ও সুন্দরের পথে মানুষকে আহবান জানানোর জন্যে এবং সুখী সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্যে। তিনি শুনিয়েছেন তওহিদের বাণী। মানুষকে আহবান করেছেন সাম্য, মৈত্রী ও ভালোবাসার সুপ্রশস্ত রাজপথে চলার জন্যে। আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা আল-ইসলামকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাননি, সেই সঙ্গে ইসলামের সার্বজনীন কাঠামো মানুষের সামনে তুলে ধরে গেছেন।

আমরা জানি প্রিয়নবী হযরত মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৬২২ খৃস্টাব্দে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে মদীনা মনওয়ারায় হিজরত করে যান। মদীনা মনওয়ারায় তশরিফ এনে তিনি এখানে গড়ে তোলেন একটি মসজিদ-মসজিদুন নববী। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনি একটি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের। প্রথমে তিনিই এই রাষ্ট্রের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র দেন যা 'মদীনা সনদ' নামে খ্যাত। এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষকে নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়। এই শাসনতন্ত্রই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।

এই শাসনতন্ত্রের প্রায় সাতচল্লিশটি ধারা ছিল। এর একটি ধারাতে মদীনার ইহুদি-খৃস্টান, মুসলমান সবাই একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। সবারই ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়। ঘোষণা করা হয় ঃ কেউ কারোর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

নাশকতামূলক বা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। যদি কেউ নাশকতামূলক বা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্য না করে তাহলে সম্মানজনক ব্যবহার পাবে। আরও ঘোষিত হয় এই যে, জনগোষ্ঠীর কেউ হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (রাষ্ট্রপতি)–এর বিনা অনুমতিতে কোন যুদ্ধযাত্রা করতে পারবে না। এই সনদে মদীনা রাষ্ট্রকে সবার অত্যন্ত পবিত্র স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই পবিত্র রাষ্ট্রটিকে হিফাযত করার দায়িত্ব সবার উপরে সমানভাবে বর্তাবে বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, যদি মদীনা কখনো আক্রান্ত হয় তাহলে এই সনদের আওতাভুক্ত সবাই শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। যদি কেউ এই সনদের পরিপন্থী কিছু করে তাহলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত হবে। বলা হয়, আল্লাহ্ এই সনদের সত্যিকার বাস্তবায়নকারী। অন্যায়কারীকে ও বিশ্বাসঘাতককে এই সনদ প্রশ্রয় দেয় না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দশ বছরকাল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এই সময়ে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন তা সর্বকালের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি। তিনি আধুনিকতম রাষ্ট্র–ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব মানবতার সামনে এক অনুসরণীয় অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেন। সামন্ত কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে একটি ইনসাফ ও আদল ভিত্তিক আর্থ–সামাজিক কাঠামো স্থাপন করেন। ক্রীতদাস প্রথা রহিত করেন। নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করেন। ঘোষিত হয়, সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান অনুসারে যাবতীয় কিছু পরিচালিত হবে। মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে তার জীবন নির্বাহ করার, রাষ্ট্র পরিচালনা করার, সুখী–সুন্দর পৃথিবী নির্মাণের দায়িত্ব মানুষের। সূরা আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ তিনি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তোমাদের দিয়েছেন সে সম্পর্কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বের যাবতীয় কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন। মানুষ তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবী পরিচালনা করবে তাঁরই দেয়া বিধান অনুসারে। ইসলামের যখন আবির্ভাব হয় তখন আরব দেশ ছিলো শতধা বিভক্ত। শায়খ, গোত্রীয় প্রধান ও কোন কোন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভু ছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই শতধা বিভক্ত আরবকে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসেন। আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসেন। পুরাতন রীতিনীতির শেকড় উপড়ে দেয়া হয়, শিরকের শেকড় উৎপাটন করা হয় এবং অস্থিরমনা দুর্ধর্ষ বেদুঈন সামাজিক কাঠামোকে একটি সুখী-সুন্দর স্থিতিশীল কাঠামোতে আনয়ন করা হয়। জীবন্ত হয়ে ওঠে আর্থ-সামাজিক কাঠামো। এক আল্লাহ্র দীনের বন্ধনে আবদ্ধ হয় গোটা জাতি। টমাস কার্লাইলের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'এই আরব জাতি, একটি মানুষ নাম তাঁর মুহাম্মদ (সা) আর সেই একটি শতাব্দী-এটা কি তাই নয় যে, যেন একটি মাত্র আগুনের ফুলকি, শুধুমাত্র একটি স্ফুলিঙ্গ যা পড়লো এমন একটি যমীনে যা ছিলো কালো ও অপরিচিত বালুকণা। দেখ দেখ সেই বালুকণা বারুদ হয়ে বিস্ফোরিত হলো আকাশ সমান আর তার আলোয় আলোকিত হলো দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত।

সচিবালয়

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সচিবালয় ছিলো মসজিদুন নববীতেই। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন প্রধান ওহী লেখক। তাঁদের অনুপস্থিতিতে হযরত উবায় ইবনে কা'ব (রা), হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) প্রমুখ এই দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীতে ওহী লেখকদের তালিকা আরো দীর্ঘ হয়।

www.pathagar.com

যাকাত ও সাদাকা থেকে লব্ধ ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্যে প্রধান সচিব হিসেবে একাধিক সাহাবী দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) ও হযরত জুহায়ম ইবনুস সালত (রা)-এর নাম জানা যায়।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রা) খেজুর গাছ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করতেন।

হযরত মুগিরা ইবনে শু'বাহ্ (রা) এবং হযরত হাসান ইবনে নামির (রা) জনগণের সংগে লেন-দেনের খতিয়ান সংরক্ষণ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ আরকাম (রা) ও হযরত 'আলা ইবনে উকবাহ্ (রা) বিভিন্ন উপজাতির খতিয়ান সংরক্ষণ করতেন এবং পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা আনসার নর-নারীদের খতিয়ানও সংরক্ষণ করতেন।

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও গোত্রীয় প্রধানদের বরাবর প্রেরিতব্য পত্রাদির খসড়া তৈরির দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো কখনো হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম (রা)-ও এই দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত মু'আয়কিব ইবনে আবী ফাতিমা (রা) রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতেন। হযরত হানযালাহ্ ইবনুর রাবী (রা)-কে বলা হতো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রধান সচিব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীলমোহর তাঁর কাছেই সংরক্ষিত থাকতো।

ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনাকে রাজধানী করে যে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন, এর প্রধান কার্যালয় ছিলো মসজিদুন নববীতে। অল্পদিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের সীমারেখা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি এই রাষ্ট্রকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন, যথা, ১. আল-মদীনা, ২. তায়ামা, ৩. আল-জানাদ, ৪. বনু কিন্দাহ্, ৫. মক্কা, ৬. নাজরান, ৭. আল-য়ামান, ৮. হাদরা মাউত, ৯. উমান এবং ১০. আল-বাহরায়ন। প্রতিটি

www.pathagar.com

প্রদেশেই তিনি একজন করে ওয়ালী বা শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। এসব ওয়ালীদের উপর প্রদেশের আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা, প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। প্রত্যেক গভর্নরকে স্ব-স্ব কর্মস্থলে পাঠানোর সময় তিনি তাঁদেরকে শপথ পাঠ করাতেন এবং তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দিতেন। এসব নিয়োগ প্রদান করা হতো কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে, তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনাকেও বিবেচনা করা হতো। তিরমিযী ও আবূ দাউদ সংকলিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মা'আয রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে য়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তাঁর য়ামন প্রদেশে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মা'আয রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

হে মা'আয, য়ামনের শাসনকার্য তুমি কোন্ বিধান অনুসারে চালাবে ? তিনি বললেন, কুরআনের বিধান অনুসারে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিন্তু কুরআন মজীদে যদি কোন বিশেষ বিষয়ের সমাধান না থাকে তাহলে কি করবে ?

উত্তরে হযরত মা'আয রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহলে আমি আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সুন্নাহ্কে অনুসরণ করবো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নতে তার সমাধান না পাও তাহলে কি করবে ?

হযরত মা'আয রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা সমাধান বের করবো।'

হযরত মা'আয রাদি আল্লাহু তা'আলার জবাব শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, সেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা যিনি তাঁর রসূলের সাহাবীকে এমন একটি কাজের তৌফিক দান করেছেন যে, কাজটি তাঁর রসূল নিজে পছন্দ করেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়া সাল্লামও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর শাসনকার্য নিজেই পরিচালনা করতেন। মদীনা মনওয়ারা থেকে তিনি যখন কোন যুদ্ধে যেতেন তখন মদীনার শাসনভার তিনি কোন সাহাবী (রা)-র উপর অর্পণ করে যেতেন, যেমন, বদরের যুদ্ধের সময় মদীনা মনওয়ারার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আসিম ইবনে আদি রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু। বনু সুলাইমের যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার ন্যস্ত ছিলো হযরত সেবা ইবনে উরফুতাত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর, বনু কায়নুকার যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার ন্যস্ত ছিলো হযরত আবূ লুবাবা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর, সাবিক যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার হযরত বাশীর ইবনে আবদুল মুনযির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর ন্যস্ত ছিলো, কারকারাতুল কুদুর যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার ন্যস্ত ছিলো হযরত ইবনে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর, জিআমার যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার ন্যস্ত ছিলো হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর, বারান যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার লাভ করেছিলেন হযরত ইবনে মাকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, ওহুদের যুদ্ধের সময় মদীনার শাসনভার ছিলো হযরত ইবনে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর, হামরাউল আসাদ যুদ্ধের সময় মদীনার অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, বনু নযীর যুদ্ধের সময় ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধের সময় হযরত সেবা ইবনে উরফুতাত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, বনী মুস্তালাক যুদ্ধের সময় হযরত আবূ যর গিফারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, বনী কুরায়যা যুদ্ধের সময় হযরত ইবনে উম্মে মকতুম রাদিআল্লাহু আনহু, যাতুর রাকা যুদ্ধের সময় হযরত আবূ যর গিফারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, বনী লিহিয়ান যুদ্ধের সময় হযরত ইবনে উম্মে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, গযওয়ায়ে হুদায়বিয়ার সময় হযরত

www.pathagar.com

নুমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু অথবা হযরত ইবনে উম্মে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, মক্কা বিজয়কালে হযরত আবূ রুহম কুলসুম গিফারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, তবুক অভিযানকালে মদীনার অস্থায়ী শাসনকর্তা ছিলেন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি কোন প্রশাসনিক শাসনকর্তা নিয়োগের সময় তাঁদের উপদেশ দিয়ে বলতেন ঃ মানুষের সংগে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করবে, সব সময় সহজ সরল পথে চলবে, কোন কিছু জটিলতার সৃষ্টি করবে না, লোকজনকে উৎসাহ দেবে, সুসংবাদ দেবে, কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে না , ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখবে। বিভেদ সৃষ্টি করবে না। তিনি শাসনকর্তা কিম্বা প্রশাসক নিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যোগ্যতর ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন। কেউ যদি কোন পদপ্রার্থী হতো সে অযোগ্য বলে বিবেচিত হতো, তিনি বলতেন আল্লাহ্ তা'আলার কসম আমি সে সব ব্যক্তিদের নিয়োগ করবো না যারা নিজ থেকে প্রার্থী হবে। —বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

আল—'আমীল বা রাজস্ব প্রশাসক

প্রতিটি প্রদেশে শাসনকর্তা (ওয়ালী) যেমন নিয়োগ করা হতো তেমনি একজন 'আমীলও নিয়োগ করা হতো। 'আমীলগণের উপর অর্পিত হতো যাকাত, সাদকাহ্ প্রভৃতি বিধি মাফিক আদায় করার দায়িত্ব। 'আমীল নিয়োগের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে দিতেন। 'আমীলগণ সবাই ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রেরে অধিকারী ও ন্যায়পরায়ণ। মদীনা মনওয়ারার জন্য 'আমীল নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, নাজরানের জন্য হযরত আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, অন্যান্য অঞ্চলের 'আমীলগণের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায়, তাঁরা হচ্ছেন, হযরত আমর ইবনুল 'আস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত আদি ইবনে হাতিম রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে লায়তাই রাদিয়াল্লাহু তা'আলা

www.pathagar.com

আনহু, হযরত উব্বাদ ইবনে বিশর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবূ জাহম ইবনে হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত দাহহাক ইবনে সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত বশর ইবনে সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

বিচারক

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। বিভিন্ন প্রদেশের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য একজন করে বিচারক নিযুক্ত করা হতো। সাধারণত তিনি নিজেই বিচারক নিযুক্ত করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করতেন। বিচারক নিয়োগ করা হতো জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে। জ্ঞানের সংগে সংগে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিচারক হতেন।

রাজস্ব

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি রাজস্ব বিভাগেরও পত্তন করেন। রাজস্বের উৎস ছিল ৫টি, যথা ঃ ১. আল গানীমাহ, ২. (ক) আয্-যাকাত, ৩. (খ) আস্-সাদাকাহ, ৩. আল জিযিয়া, ৪. আল-খারাজ, ৫. আল-ফায়।

১.আল গানীমাহ্

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে কাফিরদের যা কিছু হস্তগত হয় তাকে গানীমাহ বলে। যুদ্ধের হাতিয়ার সামগ্রী, ঘোড়া ও অন্যান্য পশু, অন্যান্য সকল অস্থাবর সম্পত্তি গনীমতের অন্তর্ভুক্ত। বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী কাফির মুশরিকদের পরাজিত করে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উট, ঘোড়া প্রভৃতি অস্থাবর সম্পদ লাভ করে। ৭০ জন শত্রুসেনা বন্দীও হয় । তখন গানীমাহ্ কিভাবে বন্টন করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বন্টন নীতি নির্ধারণ করে দেন। নাযিল হয় সূরা আনফালের ৪১ নম্বর আয়াত। তাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা জেনে

www.pathagar.com

রাখো, তোমরা যা কিছু গানীমাহ্ হিসেবে লাভ করেছো, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং য়াতীম, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য। এই বিধান অনুযায়ীই প্রিয়নবী (সা) বদর যুদ্ধে লব্ধ গানীমাহ্ সামগ্রীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের মধ্যে বিলি-বন্টন করেন এবং বাকী এক ভাগ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে বন্টন করেন। এটা একটি নীতিতে পরিণত হয়।

২. (ক) যাকাত

যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। কুরআন মজীদে সালাতের পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ রয়েছে।

যাকাত মুসলমানদের জন্য ফরয। ফসল, ফল, খেজুর , আংগুর প্রভৃতি, পশু, (উট গৃহপালিত গবাদি পশু), সোনা, রূপা প্রভৃতি থেকে যাকাত আদায় করা হতো। যাকাত ফরয তাদের জন্য, যাদের নিকট শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ ধনসম্পদ থাকবে। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ ধনসম্পদ থাকলেই যাকাত ফরয হয়, যেমন-সোনার নিসাব সাড়ে সাত তোলা, রূপার নিসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা।

যাকাত বন্টন করা হতো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত খাতসমূহে। আর তা হচ্ছেঃ

১. ফকীর, ২. মিসকীন, ৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারীবৃন্দ, ৪. যাদের ঈমানের দিকে চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের, ৫. দাসমুক্তি, ৬. ঋণভারাক্রান্তদের, ৭. আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী, ৮. ইবনুস্ সাবীল অর্থাৎ মুসাফির।

খ. সাদাকা

সাদাকা যাকাত অর্থেও ব্যবহৃত হলেও স্বতঃস্ফূর্ত দানকেও সাদাকা বলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে রাজস্ব আদায় হতো সাদাকা থেকে। সাহাবায়ে কিরাম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দান করতেন। বিলিয়ে দিতেন যথাসর্বস্ব ইসলামের খিদমতে।

www.pathagar.com

৩. আল–জিযিয়া

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমের উপর মাথাপিছু ধার্য করকে জিযিয়া বলা হয়। মূলত জিযিয়া হচ্ছে নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। অমুসলিমদেরকে সেনাবাহিনী থেকে রেহাই দেয়া হতো, তাদের যুদ্ধ করতে হতো না। অন্যদিকে মদীনা রাষ্ট্র তাদের জানমালের নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর নিরাপত্তার জন্য তাদের কর নেয়া হতো তবে অমুসলিম গরীবদের কাছ থেকে কোনরূপ কর নেয়া হতো না। মেয়েলোক, শিশু, পংগু, অসহায়দের কাছ থেকেও জিযিয়া নেয়া হতো না। প্রতি বছর সামর্থ্যবান পুরুষদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১ দিনার আদায় করা হতো। জিযিয়ার সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হতো সৈন্যদের কল্যাণে।

৪.আল–খারাজ

অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা ভূমিকর। অমুসলিমদের তাদের উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক খারাজ দিতে হতো। খারাজ আদায় করার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। প্রতিবছর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ আল–খারাজ আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন।

৫. আল–ফায়

বিনাযুদ্ধে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের দখলে আসে এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূসম্পত্তি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাকেই বলা হয় ফায়। বেশ কিছু ফায় ভূখন্ড ছিলো যেমন ঃ ফাদাক। ফায় বন্টনের খাতও আল্লাহ জাল্লা শানুহু নির্ধারণ করে দেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ এই জনপদবাসীদের (আহলিল কুরা) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসূলের, তাঁর রসূলের স্বজনগণের এবং য়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। –সূরা হাশর ঃ ৭

www.pathagar.com

৬. দীনী সংগঠন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বেশ কিছু সাহাবী (রা)-কে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেবার জন্য প্রেরণ করেন। যাঁদেরকে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে পাঠাতেন পূর্বাহ্নে তাঁদেরকে তিনি নিজে অথবা তাঁর নির্দেশে কোন সাহাবী (রা) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দিতেন। বহু সংখ্যক হাফিজ ও কারীকে বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন শরীফ শেখানোর জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে মদীনা শরীফেই দশটি মসজিদ ছিলো। এছাড়াও আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিটি গোত্রে মসজিদ নির্মিত হয়।

৭. সেনা সংগঠন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনা রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলমানকে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করেন। প্রতিটি মুসলমানই ছিলেন মর্দে-মু'মিন, মর্দে-মুজাহিদ। তাঁরা সবাই ছিলেন এক-একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় যে অমিততেজা সেনা-সংগঠন তার নাম হিযবুল্লাহ-আল্লাহ্‌র দল। কালাম মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দল সফলকাম হবে। -সূরা মুজাদালা ঃ ২২

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এই সেনা সংগঠনের প্রধান সেনাপতি। সমগ্র বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন জংগে বদর, জংগে ওহুদ, জংগে হুনায়ন, মক্কা বিজয়, তাবুক অভিযান প্রভৃতি। সাধারণত তিনি নিজে যে সমস্ত অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন , তাঁর সেনাপতিত্বে অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া। গাযওয়ার সংখ্যা প্রায় ২৯টি। আর যে সমস্ত অভিযান তাঁর নির্দেশে কোন সাহাবী (রা)-এর সেনাপতিত্বে পরিচালিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সারীয়া। সারীয়ার নেতাকে বলা হত আমীরুল আসকার-মিলিটারী কমান্ডার। সাহাবায়ে কিরাম (রা) সদা জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত

www.pathagar.com

থাকতেন। কখন জিহাদের ডাক আসে সেজন্য কান খাড়া করে থাকতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওযা সাল্লামের নির্দেশে জিহাদে শরীক হবার জন্য মদীনাবাসীকে আহ্বান জানাতেন মসজিদুন-নববীর মুয়ায্যিন হযরত বিলাল (রা)। দূরবর্তী অঞ্চলে এ দায়িত্ব পালন করতেন অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম। জিহাদের ব্যয় নির্বাহ করা হত সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে প্রদত্ত অর্থ ও সম্পদ দ্বারা। একবার তো হযরত আবূ বক্র (রা) তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় ধনসম্পদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কদম মুবারকে এনে সোপর্দ করেন।

মসজিদুন নববীর চত্বরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে জিহাদের জন্য লোক সংগ্রহ করা হত। তাঁরা সবাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করে দিতেন কে নিশানবরদার হবেন, কারা তীরন্দাজ হবেন, কারা অশ্বারোহী হবেন, কারা পদাতিক হবেন আর কারা হবেন বল্লমধারী। তিনি যুদ্ধ কৌশলও তাঁদের বাতলিয়ে দিতেন। রওনা হবার প্রাক্কালে মুজাহিদ বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদর প্রান্তরে ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ মুতাবিক ২য় হিজরীর ১৭ই রমযান। বদর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এই যুদ্ধে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পতাকার রং ছিলো সাদা। আর এই পতাকাটি বহন করেছিলেন হযরত নুসায়র (রা)। মুহাজির ও আনসারদের পৃথক দু'টি পতাকা ছিলো। দু'টির রংই ছিলো কালো। মুহাজিরদের পক্ষে পতাকা বহন করেন হযরত আলী (রা) এবং আনসারদের পক্ষে পতাকা বহন করেন হযরত সা'দ ইবনে মায়ায (রা)। সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন। এবং সবাই ছিলেন রোযাদার। অস্ত্রশস্ত্র ছিলো খুবই নগণ্য। উটের সংখ্যা ছিলো ৭০, ঘোড়া ছিলো ২টি। অন্যদিকে কাফিরদের ছিলো প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী ও সহস্রাধিক সৈন্য। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদেরে উদ্দেশে একটি নাতিদীর্ঘ খুতবা দেন। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ মুসীবত দূরে সরিয়ে দেন এবং চিন্তা দূর করে দেন।

বদরের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক অপূর্ব রণকৌশল প্রয়োগ করেন এবং সৈন্য সারিবিন্যাসে নিপুণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রথম কাতারে ছিলেন বল্লমধারী মুজাহিদগণ। তাঁরা দীর্ঘ বল্লম ও ঢাল ব্যবহার করেন। তাঁদের দুই ধারে বর্মধারী মুজাহিদরা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় কাতারটি ছিলো তীরন্দাজ বাহিনীর। এমনিভাবে সমগ্র মুজাহিদ দলটিকে বিন্যাসিত করা হয় যাতে সুদৃঢ় প্রাচীরের কাজ করে। কালামে মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ্ তাঁদের ভালবাসেন। —সূরা সাফ্‌ফা ঃ ৪

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করেন তা সর্বযুগে যে কোন রণনীতি ও রণকৌশলের চেয়ে সর্বাধুনিক। হুনায়নের যুদ্ধে তিনি মানজানাক কামান ব্যবহার করেন এবং সেনাবাহিনীর একটি দলকে দারবাবা পোশাক দ্বারা সজ্জিত করান। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরিচালিত প্রতিটি অভিযান, প্রতিটি যুদ্ধ বিজয়ের সৌরভে সুরভিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদূরপ্রসারী নজীর স্থাপন করে। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারেই যাবতীয় নীতিমালা প্রয়োগ করতেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেনঃ আর তিনি তো মনগড়া কথা বলেন না, এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। —সূরা নাজম ঃ ৩, ৪

www.pathagar.com

সমাজ সংস্কারক মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

হাসিনা আখতার

"মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বকে উৎখাত করে এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের ভিত্তিতে এক নয়া সমাজ ব্যবস্থা কায়েম কর"–এটাই ছিল বিশ্বনবী (সা)–র বিপ্লবের অন্যতম শ্লোগান।

বস্তুত বিশ্বনবী (সা) ছিলেন ঐতিহাসিক যুগের বিশ্ববিখ্যাত সমাজ সংস্কারক। দুনিয়ার এক নিকৃষ্ট সমাজে জন্মগ্রহণ করে সে সমাজকে তিনি কিভাবে শ্রেষ্ঠতম সমাজে পরিণত করলেন তা আজও মানুষের বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে তাঁর এ সাফল্যকে কিছুতেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। কারণ সমাজ জীবনে তিনি যে মহাবিপ্লব সৃষ্টি করলেন, তা সম্পূর্ণ মানবিক পদ্ধতিতে এবং জনগণের সহযোগিতায়ই করেছিলেন।

মানুষ সামাজিক জীব। তার জন্ম ও প্রতিপালন সমাজের বাইরে সম্ভব নয়। একটি পুরুষ ও নারীকে নিয়ে প্রথমে ক্ষুদ্রতম সমাজ গঠিত হয়। ঐ ক্ষুদ্রতম সমাজ থেকেই বর্তমান বিশাল সমাজ গড়ে উঠেছে। মহানবী (সা) প্রচলিত অর্থে নিছক কোন ধর্মনেতা বা সমাজের আংশিক সংস্কারক মাত্র ছিলেন না। তিনি শতগোত্রে বিভক্ত আরব জাতিকে সুসংগঠিত করেন। রাষ্ট্রানুগত্যে

www.pathagar.com

অনভ্যস্ত এক বিচ্ছিন্ন মানব গোষ্ঠীকে সুসংহত করেন এবং বিশৃংখল জীবনধারাকে সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন।

রসূল (সা) অনুকরণযোগ্য সব নিয়ম পদ্ধতি ও রীতিনীতিকেই সুন্নত বলে। সুন্নতে রসূল একটি বিশেষ পরিভাষা। সুন্নতের অনুসরণই মুসলিম জীবনের কর্তব্য। কিন্তু রসূলের আসল সুন্নতকেই অবহেলা করা হচ্ছে। তাঁর শ্রেষ্ঠতম সুন্নত হলো সুন্দরতম সমাজ গঠন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বেইনসাফীপূর্ণ ও মানবতাবিরোধী আরব সমাজকে মানব জাতির জন্য এক শাশ্বত আদর্শ হিসেবে পুনর্গঠিত করে তিনি যে শিক্ষা রেখে গেলেন সেটাই মুসলিম জাতির জন্য প্রধান সুন্নত। আর তিনি কোন্ পদ্ধতিতে এ বিপ্লব সাধন করলেন সেটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত।

রসূলে করীম (সা)–এর সমাজ গঠনের ভিত্তি কি ছিল, কোথা থেকে তিনি কাজ শুরু করলেন, তাঁর কাজের প্রতিক্রিয়ায় সমাজপতিরা যখন চরম বিরোধিতা ও নির্যাতন চালালো তখন তিনি কিভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিলেন, কিভাবে তিনি ক্রমশ সফলতার দিকে এগিয়ে গেলেন, এর জন্য তাঁকে কিরূপ ভয়ংকর ও সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হলো এবং রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে তিনি কিভাবে ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তবায়িত করে সমাজ গঠনের দায়িত্ব পালন করলেন,–এসবই হলো রসূলে করীম (সা)–এর আসল সুন্নত বা আদর্শ। এসব মূল সুন্নতের দিকে অগ্রসর না হয়ে রসূলের বাকী সুন্নতের অনুসরণ পূর্ণরূপে অসম্ভব। আর যেটুকু সম্ভব, তা দ্বারা মুসলিম হিসেবে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব কিছুতেই পালন করা হয় না।

যুগে যুগে নবী–রসূল ও তাঁদের অনুসারীরা তখনি সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যখন জুলুম ও বেইনসাফীর দরুন মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। কুরআনের মতে, মানব সমাজের যাবতীয় অশান্তি ও জুলুমের মূল কারণ হলো মানুষের উপর মানুষের মনগড়া আইন। সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো

www.pathagar.com

যখনি মানুষ নিজ হাতে গড়ে, তখনই কতক মানুষ বাকী সবার উপর প্রভুত্বের বন্দোবস্ত করে। আর এরই ফলে মানুষ মানুষের প্রভু হয়ে বসে।

নবী ও রসূলের সমাজ গঠনের ভিত্তি হলো–মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে সকল মানুষের উপর এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফ কায়েম করা। এ কারণে প্রত্যেক রসূলের সাথেই তদানীন্তন সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের সংঘর্ষ বেঁধেছে। রসূল যে ধরনের ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়তে চেয়েছেন, তা ঐসব লোক কেমন করে পছন্দ করতে পারে, যারা নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ইনসাফের বিপরীত ব্যবস্থা সমাজে চালু করে রেখেছে। তাই কোন নমরূদই কোন ইব্রাহীম (আ)–কে সহ্য করেনি। ফেরাউনও মূসা (আ)–কে বরদাশত করতে পারেনি এবং বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)–কেও আরবের নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে, তারা ঐ ব্যবস্থা দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হয়। তারা ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমেই গোটা সমাজকে সর্বদিক দিয়ে শোষণ করার সুযোগ পায়। তাই তারা ঐ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তারা ঐ সমাজের কায়েমী স্বার্থ। সমাজ ব্যবস্থা ঐরূপ অবস্থায় বহাল থাকার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত। যখনি কেউ সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, তখনই ঐ কায়েমী স্বার্থের আঁতে ঘা লাগে এবং তারা সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ (সা)–র সাথেও এ কারণেই আরবের সর্বশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বাঁধে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তাতে কায়েমী স্বার্থের সাথে তাঁর লড়াই অনিবার্য ছিল। সংগ্রামের পথ ছাড়া তাঁর সে দায়িত্ব পালন করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সে

www.pathagar.com

দায়িত্বকে বারবার সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সূরা ফত্হ–এ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

"তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও একমাত্র সত্যবিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি আর সব বিধানের উপর এ বিধানকে বিজয়ী করেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট"। এ আয়াতের মর্ম এই যে, শুধু দীনের প্রচার করা তাবলীগ বা ওয়াজ করা পর্যন্ত রসূলের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রচার শুধু তাঁর প্রাথমিক কাজ ছিল। আল্লাহ্র দেয়া বিধানের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী শক্তিতে পরিণত করাই রসূলের মূল দায়িত্ব ছিল। নবী ও রসূলগণের জীবন এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তারা নিজ নিজ যুগের সিংহপুরুষ ও বিপ্লবী নেতা ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় মনোবল নিয়ে এ সংগ্রামের পথে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন। হযরত মুহম্মদ (সা)–এর জীবন এমনি এক অগ্নিপুরুষের সংগ্রামমুখর আলেখ্য।

দুনিয়ার কোন মহৎ কাজই প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। বিশেষ করে সমাজের মৌল পরিবর্তন আনা এমনি জটিল কাজ যে, এর জন্য সুসংবদ্ধ আন্দোলন অপরিহার্য। সমাজ গঠন বা সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনের প্রধান দুটো স্তর রয়েছে। সংগ্রাম যুগ ও বিজয় যুগ। সংগ্রাম যুগে আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি গঠন করা হয় আর বিজয় যুগে ঐ ব্যক্তিদের দ্বারাই নতুন নেতৃত্ব কায়েম করে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। সংগ্রাম যুগে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সাথে সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যুক্তির পরিবর্তে তখন তারা শক্তি প্রয়োগ শুরু করে।

সমাজ গঠনের আন্দোলনের সংগ্রাম যুগে যেসব লোক তৈরি হয়, তাঁরা যখন সমাজ পরিচালনার সুযোগ পায় তখন বিজয় যুগ শুরু হয়। তখন কায়েমী স্বার্থের নেতৃত্ব খতম হয়ে তাদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই হল বিজয় যুগ

www.pathagar.com

এবং এ যুগেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সমাজ নতুনভাবে গঠিত হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবে যেসব স্তর ও অবস্থা দেখা দেয় বলে উপরে আলোচনা করা হলো, সেসব অবস্থা রাসূল (সা)-এর আন্দোলনেও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করতেই কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা শুরু হলো এবং বিদ্রূপ থেকে শুরু করে চরম নির্যাতন পর্যন্ত সকল স্তরই তাঁকে অতিক্রম করতে হলো। মক্কায় ১৩ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম যুগে তিনি ধৈর্যের সাথে এ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে মদীনায় যখন বিজয় যুগে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি রসূল হিসাবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করতে সক্ষম হলেন। মদীনার একটি ক্ষুদ্র ইসলামী সমাজ কায়েম করার মাধ্যমেই তাঁর বিজয় যুগের সূচনা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর তিনি সমাজ গঠন কার্য সমাধা করার সুযোগ পান। এভাবে তিনি ইসলামী সমাজ বিধানকে বিজয়ীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

সমাজ গঠনের জন্য প্রধানত তিনটি উপাদান প্রয়োজন। যথা, ১. একটি আদর্শ, ২. সে আদর্শভিত্তিক মজবুত সংগঠন ও ব্যক্তি গঠন এবং ৩. সে আদর্শ বাস্তবায়নের উপযোগী নেতৃত্ব।

রসূলে করীম (সা) পরিচালিত আন্দোলনের ঐ তিনটি উপাদান অতি সন্তোষজনকভাবে বর্তমান ছিল। সমাজকে নতুনভাবে গড়ার জন্য তিনি এমন এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শের অধিকারী ছিলেন, যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য এক ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দেয়। দ্বিতীয়ত, তিনি ঐ আদর্শ গ্রহণকারীদেরকে এমন মজবুতভাবে সংগঠিত করেন যে, কুরআনের ভাষায় তা যেন 'বুনিয়ানুম মারসুস্'-সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ছিল। তৃতীয়ত, তিনি ঐ আদর্শের অনুসারীদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, তারা প্রচলিত কায়েমী স্বার্থের নেতৃত্বকে অপসারিত করে সমাজকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন।

সমাজ গঠনের এ তিনটি উপাদানের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমেই আদর্শের প্রচার দ্বারা তাঁর

www.pathagar.com

কাজ শুরু করেন। যারা সে আদর্শ গ্রহণ করেত রাযী হলেন, তিনি মজবুত সংগঠনের মাধ্যমে তাদের মনমগজ ও চরিত্র সে আদর্শ মোতাবেক গঠন করলেন। এরপর সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁর তৈরি লোকদের দ্বারা মদীনায় এ আদর্শের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধের রক্ত পিচ্ছল সিঁড়ি বেয়ে হিজরতের সুদীর্ঘ আট বছর পর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর সেই মহান নেতৃত্ব গোটা আরবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, নেতৃত্ব যে ধরনের হয় সমাজও সেই অনুপাতে গড়ে ওঠে। এক ধরনের নেতৃত্ব দ্বারা অন্য ধরনের সমাজ গঠন সম্ভব নয়। তাই সমাজ গঠনের আন্দোলনে ব্যক্তি গঠনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোন আদর্শ যতই সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ হোক না কেন , সে আদর্শে ব্যক্তি গঠন করা না হলে তার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের কোন সম্ভাবনা নেই। রসূলের জীবনে রাষ্ট্র গঠন সমাজ গঠনের উপায় মাত্র। তাই তিনি রাষ্ট্রনায়ক হয়ে শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দিকেই তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং রাষ্ট্রক্ষমতাকে তিনি সমাজের ব্যাপক সংশোধন ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করেন। বস্তুত যে কালিমালিপ্ত সমাজে আমাদের মহানবী (সা) আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সমাজ ছিল আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থাৎ অন্ধকার যুগের বর্বর সমাজ। বিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে যেমন অত্যাধুনিকতা ও প্রগতির মুখরোচক শ্লোগানের লোভনীয় আড়ালে নির্দ্বিধায় অনাচার লালিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি ৬ষ্ঠ শতকের আরব ছিল পাপের কলুষ কালিমায় আচ্ছন্ন। সেই পাপের কালিমায় আচ্ছন্ন ঘুণেধরা সমাজ উন্নয়নের জন্য মহানবী (সা) ব্যক্তি মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

রসূলে করীম (সা)–এর সমাজ সংস্কারের অন্যতম দর্শন হলো এই যে, তিনি কুকাজ এবং কু–প্রবৃত্তির উৎসমূল খুঁজে বের করেন। তিনি দেখলেন, সমাজে যে ব্যভিচার, শ্লীলতাহানি এবং নারী সম্প্রদায়ের প্রতি যে গর্হিত আচরণ চলছে, তা রোধ করতে হলে সমাজে তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করতে হবে। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় শুধু আরবেই নারী জাতির দুরবস্থা ছিল না, সারা বিশ্বেই এ

www.pathagar.com

শ্রেণীর প্রতি চলছিল অবিচার। ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মে নারীকে 'পাপের উৎস-'Origin of the devil' বলে ধারণা করা হতো। আরবের যে সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করতে পিতার হৃদয় এতটুকুও কাঁপত না, সে সমাজে নারীকে পৈতৃক সম্পত্তি দানের কথা কেউ কল্পনা করতে পারত না। মহানবী (সা) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, নারীর উপর পুরুষের যে রকম অধিকার রয়েছে, পুরুষের উপর নারীরও ঠিক একই অধিকার রয়েছে।

"নারীরে প্রথম দিয়াছে মুক্তি নর সম অধিকার ;
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছে একাকার।"

রসূলুল্লাহ নারীকে দ্বিবিধ সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রদান করলেন। একটি হলো পৈতৃক সম্পত্তি। আর দ্বিতীয়টি স্বামীর সম্পত্তি। ন্যায়সঙ্গত দেনমোহরের পরিবর্তে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি মেয়েদের বিবাহে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেন। পুরুষদেরকে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হলো। তবে এও বলে দেয়া হলো যে, "সবার প্রতি সুবিচারে সক্ষম না হওয়ার আশংকা থাকলে এক বিয়েই যথেষ্ট।" স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ ইসলাম স্বীকার করে না। কোন এক পর্যায়ে মহানবী (সা) বলেছেন, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী বেহেশতে পদার্পণ করতে পারবে না। তিনি ঘোষণা করেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে শ্রেষ্ঠ।" স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ পাক সেই স্ত্রীলোককে পছন্দ করেন, যে তার স্বামীকে ভালবাসে এবং নিজকে পর পুরুষ থেকে হিফাযত করে।" তিনি বিবাহ এবং পরিবার আইন তৈরি করে নারীদের ভোগের সামগ্রীর পরিবর্তে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলাম ধর্মে আরো বলা হয়েছে, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।" এভাবে মহানবী (সা) নারী জাতিকে এক অভূতপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব মর্যাদা দান করেছেন।

সমকালীন আরব সমাজে যৌনতার বাঁধভাঙ্গা নারকীয় স্রোত উদ্দাম গতিতে ভাসিয়ে নিচ্ছিল শ্লীল-শালীনতার সর্বশেষ বন্ধনটুকুও। হজ্জের সময় নারী-

www.pathagar.com

পুরুষেরা নগ্নাবস্থায় কাবা ঘরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করত। পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি ছিল নিত্যদিনের মামুলী ব্যাপার। মানবতার এ হীন অপমান প্রত্যক্ষ করে রহমতের নবী কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলেন। যিনা বা যৌন অপরাধের জন্য চরম পর্যায়ে মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা নেয়া হলো। ফলে ক্লেদাক্ত ও পতিত সমাজ স্বল্প সময়ে কলুষতামুক্ত উন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো।

পর্দাপ্রথা মহানবীর এক অনন্য সাধারণ অবদান। এর মাধ্যমে একদিকে নারী জাতি অবরোধের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে অন্যদিকে নিজ সম্মান ও সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়েছে।

সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীজীর যে সংস্কার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হলো দাসত্ব প্রথার সংস্কার সাধন। ইসলামপূর্ব যুগে সমাজে দাসশ্রেণী ছিল সবচেয়ে নিগৃহীত। সমাজে তাদের মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। বরং তাদের উপর চলত অমানবিক নির্যাতন। মহানবী (সা) এসে ক্রীতদাসদের কঠোর জীবনকে নমনীয় করলেন। শুধু তাই নয়, ক্রীতদাস জায়েদকে হযরত মুক্তি দিয়ে আপন পুত্র হিসেবে লালন-পালন করেছেন। নিজ ফুফাতো বোনের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। অবশেষে তাকে মুতা অভিযানের প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। হযরত আবূ বকর, উমর ও আলী (রা)-র মত বিশিষ্ট সাহাবীরা ক্রীতদাস জায়েদের অধীনে সাধারণ সৈনিকবেশে যুদ্ধ করেছেন। এভাবে সব মানুষই যে আল্লাহ্র চোখে সমান, সব মানুষেরই ধর্মীয় ও কর্মীয় অধিকার যে সমান, সব মানুষই যে পরস্পর ভাই ভাই একথা শুধু তিনি মুখে বলেন নি, আপন জীবন দ্বারা কার্যতও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত স্বয়ং তার সাহাবীদের সাথে 'পরিখা খনন' কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দীন ও দুনিয়ার বাদশাহ সেদিন কুলি মজুর সেজে ধূলি-ধূসরিত দেহে মাটি কেটেছেন এবং সকলের সাথে মাটির ঝুড়ি মাথায় করে যথাস্থানে তা ফেলে এসেছেন। এভাবে সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে তিনি সমাজের লোকদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন।

www.pathagar.com

মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব করার পথ বন্ধ করার জন্য কৃত্রিম শ্রেষ্ঠত্বের যাবতীয় ধারণাকে তিনি মানবতাবিরোধী বলেই ঘোষণা করেননি–ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা বংশ ইত্যাদির প্রাধান্য মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তিতেই মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্বকে তিনি স্বীকার করেননি। তাই তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থায় উন্নত চরিত্রই ছিল নেতৃত্বের অধিকারী। মানবজাতির ইতিহাসও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করেছে যে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো যেমনই হোক মহৎ চরিত্রের নেতৃত্বই নাগরিকদের জীবনকে শান্তিময় করতে সার্বিক সক্ষম।

অর্থনৈতিক দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) এমন সুষ্ঠু বিধান দিয়েছেন যে, শোষণের যাবতীয় পথই সেখানে রুদ্ধ। সেখানে অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনের যেমন উপায় নেই, অন্যায় ও অবৈধ পথে অর্থ ব্যয় করারও সুযোগ নেই। তদানীন্তন আরব সমাজে দুষ্টক্ষতের মত যে অর্থনৈতিক অভিশাপ চেপে বসেছিল তা হচ্ছে সুদ। বর্তমান সভ্যতার ন্যায় তখনও আপামর মানুষ সাততলা আর গাছতলার দুঃসহ ব্যবধানে মানবেতর জীবন যাপন করত। মহানবী (সা) সুদকে উৎখাত করে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কায়েম করেন। যাকাত দরিদ্রের জন্য ধনীর দান নয় বরং ধনীর সম্পদে দরিদ্র পীড়িত জনতার ন্যায্য অধিকার। মদীনার ইসলামী প্রজাতন্ত্রে কর্জে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ প্রথা ব্যাপকাকারে চালু ছিল। এভাবে মহানবী (সা) তদানীন্তন আরব সমাজে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা কায়েম করেন, যেখানে ব্যক্তি মালিকানা ছিল আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের দ্বারা সীমিত। এর ফলে সমাজে ইসলাম রূপ সোনার কাঠির পরশে নবযুগের সূচনা হলো। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব সর্বপ্রকার নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে এক অতুল স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করল। এভাবেই রসূল (সা) সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

রসূলের সমাজ সংস্কারের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল–

প্রথমত, কেবল সমাজ সেবাই লক্ষ্য নয়। সমাজের নিয়ন্ত্রণ শক্তিও তিনি হাত করেছিলেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে এ সংস্কার হয়েছিল।

তৃতীয়ত, সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানে তিনি স্থায়ী মূলনীতি পেশ করেছিলেন এবং তাঁর সেই সংস্কার সমাজের কোন আংশিক নয়, পূর্ণাঙ্গ সংস্কার।

বস্তুত, রসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তিনি বেদুঈন আরবের শিরে শাহী তাজ তুলে দিয়েছিলেন আর নিরক্ষর উটের রাখালদেরকে বানিয়েছিলেন দুনিয়ার ওস্তাদ। তাই সমাজ গঠনে রসূলের মহান অবদান চিরদিন মানব জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। রসূলে করীম (সা)-এর ঐ সমাজ গঠনের পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তাঁর দেয়া সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করাই মুসলিম জীবনের অন্যতম দায়িত্ব।

www.pathagar.com

সমাজ–সংস্কারের শাশ্বত ধারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

শেখ ফজলুল রহমান

আজকের যুগজিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় নিরসনের লক্ষ্যে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের মানুষ যখন বিভিন্ন দর্পণের গোলক ধাঁধায় বিভ্রান্ত তখন সুসম সমাজব্যবস্থার সন্ধিৎসায় অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথাই বারবার মনে পড়ে। বিশেষ করে ঈদ–ই–মিলাদুন্নবী আমাদের মন মানসিকতাকে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশো বছর আগেকার মহানবী (সা)–র তদানীন্তন প্রচলিত সমাজ–ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মসূচীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধের সেই ভয়াবহ সমাজচিত্র নিয়মতান্ত্রিকতা তথা শান্তি–স্বস্তির জিগীষায় যখন উন্মুখ, সেই যুগসন্ধিক্ষণেই ৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরবী চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ্সাদিকের শুভক্ষণে মহানবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা) জাজিরাতুল আরবের মক্কা নগরে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আরবের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিধিবিধান অনুযায়ীই তিনি লালিত–পালিত হন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বিবেকের উন্মেষ লাভের পরবর্তী চেতনায় প্রচলিত সামাজিক প্রথা–পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেন এবং বিরাজিত কুসংস্কার ও অবক্ষয়ী সমাজ–ব্যবস্থা দেখে শুধু যে অন্তরে ব্যথা অনুভব করতেন তাই নয়, সেই অবক্ষয়ী সমাজ–ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে সব সময় চিন্তাযুক্ত থাকতেন।

www.pathagar.com

পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব : 'হিলফুল ফুযুল' গঠন

অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সে সময়কার মানুষের একটা রক্তের তাসিরগত মানসিক রোগ ছিল। কারো বিপদ-আপদে পারস্পরিক সমবেদনার উন্মেষ ছিল না। একজনের দুরবস্থায় আর একজন কৌতুক অনুভবকারী তামাশাদর্শীর ভূমিকা অবলম্বন করতো। মহানবী (সা)-র কিশোরকালেই মানুষের মনে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত করে তোলার মানসে কতিপয় সমবয়সীদের সমভিব্যাহারে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটা সমাজ-সেবা সংঘ কায়েম করেন। উক্ত সংঘের কর্মসূচী ছিল মানুষের বিপন্ন অবস্থায় তাদের সার্বিক দুরবস্থা থেকে তাদেরকে যতোদূর সম্ভব উদ্ধার করার সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং সক্রিয়ভাবে খিদমতগারের ভূমিকা পালন করা। পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবী (সা)-র কিশোরকালে গঠিত 'হিলফুল ফুযুল'ই প্রথম সমাজকল্যাণ সংস্থা।

সহায় সম্বলহীন-কিশোর হিসেবে তাঁকে জীবিকার তাকীদে জীবনের শুরুতেই কায়িক পরিশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজের বিনিময়ে আহার্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে বণিক শ্রেণীর অধীনে ব্যবসাসূত্রে তাঁকে অনেক দূরদেশেও সফর করতে হয়। নানান ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করতে হলেও অন্তরের মূল জিজ্ঞাসা থেকে তিনি দূরে সরে যাননি।

পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়স্কা হযরত খাদীজা বিনতে খোওয়ায়লাদ (রা)-কে বিয়ে করার পরেও দীর্ঘ পনেরো বছর যাবত মক্কার উপকণ্ঠস্থ হেরা গুহায় প্রায়শ নির্জনে আত্মজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন থাকতেন। চল্লিশ বছর বয়সে ৬১০ খৃস্টাব্দে আরবী চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী রমযান মাসে 'লাইলাতুল কদর'-এ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নবুয়ত লাভের পর মহানবী (সা) তাঁর দীর্ঘদিনের অনন্ত জিজ্ঞাসার জবাব পান এবং পরবর্তী পর্যায়ে গঠনমূলক তথা সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

সামাজিক ভেদনীতির অবসান : ঐক্যের দাওয়াত

মানুষে মানুষে প্রচলিত ভেদনীতি মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বিশ্বাসগত ও আকিদাগত ঐক্য না থাকায় তাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা বোধ ছিল না। একের দুরবস্থা অন্যের উপভোগের বিষয় ছিল। প্রচলিত এই বিচ্ছিন্ন মনোভাবই তদানীন্তন আরববাসীদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দ্বন্দ্বমুখর করে রাখতে সহায়তা করে। মহানবী (সা) তাদের সকলকে মৌলিক এক বিশ্বাসে একত্রীভূত করার অভীপ্সায় ঐক্যের এক অভিনব দাওয়াত জানান–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্। একনিষ্ঠ এক অনন্ত ঐক্যে গ্রথিত করার এই অভূতপূর্ব দাওয়াত মানুষকে এক নবতর চেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলতে সক্ষম হয়। যারাই এই দাওয়াত কবূল করেন, তাদের মন থেকে প্রচলিত সর্বপ্রকার স্বকীয়তাবোধ নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে পারস্পরিক আত্মবোধে তারা সবাই জাগ্রত হয়ে ওঠে। এটা আজও অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপর যে, এই অভিনব ঐক্যের দাওয়াত ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন সকলের উর্ধ্বে বিশ্বের এক প্রান্তের মুসলিমকে কেমন অপর আর এক প্রান্তের মুসলিমের ঐক্য–চেতনায় আজও বেঁধে রেখেছে। মহানবী (সা)–র উক্ত কালিমায়ে তাইয়েবার দাওয়াতকেই তাঁর সর্ব পর্যায়ের সংস্কারের মূল পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

স্বকীয়তাবোধের অবসান

ঐক্যের এই মূল দাওয়াত কালিমায়ে তাইয়েবায় বিশ্বাসী হয়ে আন্তরিক আকীদা কায়েম করার সাথে সাথে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে যে স্বতন্ত্র ধারণাবোধ পোষণ করতো এক নিমেষেই সে স্বাতন্ত্র্যবোধ তার মন থেকে মুছে নিয়ে সে নিজেকে আল্লাহ্র বান্দাহ্ বলে ভাবতে শেখে। বিশ্বাসীরা সবাই যখন নিজেদেরকে আল্লাহ্র বান্দা বলে ভাবতে শুরু করে, সবাই যখন নিজেদেরকে আদি পিতা–মাতা হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়ার সন্তান বলে ভাবতে শেখে তখন তাদের মন থেকে গোত্র, ধন–দৌলত, আভিজাত্য ইত্যাদি যাবতীয় স্বকীয়তাবোধ মুছে সবাই আল্লাহ্র বান্দাহ্ হিসেবে পরস্পরে সমান হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মাত্র তেইশ বছরের সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচীতে সমগ্র জাজিরাতুল আরবে স্বতন্ত্র এক কওম গড়ে ওঠে।

কৌলীন্য প্রথার বিলোপ–সাধন

এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, মহানবী (সা)–র সংস্কার আন্দোলনে চাকর–মনিব সমান হয়ে যায়। ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদীজা বিন্‌তে খোওয়ায়লাদ (রা)–কে বিয়ে করার পর হযরত খাদীজা তাঁর ক্রীতদাস জায়েদ বিন–হারেসকে তাঁর স্বামীর খিদমত করার জন্যে উপঢৌকন হিসেবে স্বামীর কাছে পেশ করেন। স্বামী মহানবী (সা) ক্রীতদাস জায়েদ বিন হারেসকে মুক্তি দান করে আযাদ করে দেন। কিন্তু জায়েদ বিন হারেস তাঁর ক্রীতদাস জীবনে মনিবের ব্যবহারজনিত এই অভাবনীয় ঘটনায় এমনই বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন যে তিনি তাঁর মনিবের পরবর্তীকালের মহানবী (সা)–র সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং তাঁরই কাছে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এখানেই শেষ নয়, পরবর্তী পর্যায়ে হযরত (সা) ক্রীতদাস হযরত জায়েদ (রা)–এর সাথে তাঁর ফুফাতো বোন জয়নাবের বিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। কুরায়শ কুলের মোত্তালিব–তনয়া ও মায়মার কন্যা জয়নাব বিশেষ কৌলীন্যের অধিকারিণী থাকা সত্ত্বেও কালিমায়ে তাইয়েবায় আকীদা পোষণ করার সাথে সাথে তাঁর কৌলীন্যবোধের অবসান হয়ে যায় এবং ক্রীতদাস হযরত জায়েদ বিন হারেস (রা)–এর হাতে তুলে দিতেও হযরত (সা)–এর কোন দ্বিধাবোধ ছিল না। সেই বিশ্বাস ও আকীদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই ভারত বিজেতা শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীও ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীনকে সেনাপতি পদে বরণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি, তাঁকে দিল্লীর মসনদে অভিষিক্ত করতেও তাঁর কোন কুণ্ঠা দেখা দেয়নি। এমনকি ক্রীতদাস থেকে সুলতান কুতুবউদ্দীনও তাঁর ক্রীতদাস ইলতুতমিসকে জামাতা করতে দ্বিধা করেননি, তাকে সিংহাসনে বসাতেও তাঁর কোন রকম কুণ্ঠাবোধ ছিল না।

www.pathagar.com

নারী সমাজের মানবিক অধিকার কায়েম

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানা আছে যে, মহানবী (সা)-র আবির্ভাবকালে তদানীন্তন আরবে নারী জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নারীজাতির সামাজিক মর্যাদা তো দূরের কথা, তাদের মানবিক মর্যাদাটুকুও ছিল না। নারী জাতি ছিল পণ্যদ্রব্যের মতো পুরুষের ভোগের ও উপভোগের বস্তুর মতো। তাদের ভবিষ্যত জীবনের কোন নিশ্চয়তা, কোন নিরাপত্তা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তাদেরকে একাদিক্রমে পুরুষের শয্যাশায়িনী হয়ে ব্যবহার্যরূপে জীবন কাটাতে হতো।

মহানবী (সা) 'কাবিন' ও 'মোহরানা' প্রথার প্রবর্তন করে বৈবাহিক জীবনে তাদের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করেন। 'একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষে নিরপেক্ষ ইনসাফ রক্ষা করে চলার সম্ভাবনা কম থাকায় একজন স্ত্রী গ্রহণ করাই উত্তম।'-আল্লাহ্ তা'আলার এই শাশ্বত ঘোষণার মাধ্যমে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে পুরুষ সমাজকে নিরুৎসাহিত করেন, 'জননীর পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত' এই মহান ঘোষণায় নারীজাতির মর্যাদা উন্নততর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতা ও পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য নির্ধারণে মহানবী (সা) মায়ের দাবীকে পিতার তুলনায় তিনগুণ ধার্য করে জননীকে মহীয়সীরূপে চিহ্নিত করেন। মায়ের খিদমত করার মাধ্যমে সন্তানের ছোটখাটো গোনাহ্ মাফ হওয়ার আশ্বাস দিয়ে মায়ের মর্যাদাকে সন্তানের অন্তরে বদ্ধমূল করার প্রয়াস পান। শুধু তাই নয়, হাশরের বিচারে স্বামীর জান্নাত লাভের সিদ্ধান্তে স্ত্রীর আপত্তি দেওয়ার ক্ষমতা ঘোষণা করে স্বামী সমাজকে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন।

জ্ঞান অর্জনের পটভূমিতে পুরুষের সাথে সাথে নারীর জ্ঞান অর্জন করা ফরয বলে ঘোষণা করে মহানবী (সা) তাদের বিকাশের পথ সুগম করেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা পর্দার মাধ্যমে প্রমাণিত করার সুযোগ দান করেন। এইভাবে এক কালের অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী জাতির উদ্ধার সাধন করেন।

www.pathagar.com

গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান

মহানবী (সা)-র আবির্ভাবকালে আরবের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গোত্রীয় প্রাধান্যবোধ এমন ভয়াবহরূপে বিদ্যমান ছিল যে, সামান্য কারণে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো এবং সেই যুদ্ধ-বিগ্রহ বংশ পরম্পরায় উজ্জীবিত থাকতো। এক পক্ষ একেবারে নিস্তেজ ও ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সেই ভয়াবহ গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান আশা করা যেতো না। মহানবী (সা) সেই ভয়ঙ্কর জিঘাংসু জাতিকে কালিমায়ে তাইয়েবায় বিশ্বাসী করে মুসলিম হিসেবে আর একজন মুসলিমের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করেন। যারা একদিন পরস্পরের প্রতি সহিংস ও হিংস্র মনোভাব পোষণ করতো মহানবী (সা)-র উপদেশে পরস্পরে সহনশীল, সহযোগী, সহধর্মী ও সমমর্মী হয়ে উঠতে বেশী বিলম্ব হয়নি। এইভাবে আরব ভূখন্ডে সমমর্মী এমনই এক অখন্ড জাতিসত্তা গড়ে ওঠে, যারা পরবর্তী পর্যায়ে ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রে 'যার পিপাসা অধিক তাকে আগে পানি পান না করিয়ে নিজে পানি পান করবে না'-এই সমমর্মিতাবোধে সবাই একে একে শাহাদাতবরণ করার মতো মানসিকতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

ইনসাফপন্থী নির্লোভ জাতিসত্তার বিকাশ

জাজিরাতুল আরবে তদানীন্তন যুগে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসাসূত্রে মালামাল বেচাকেনা করাই ব্যবসায়ী সমাজের কাজ। কিন্তু লেনদেন-এর ক্ষেত্রে ইনসাফ রক্ষা করা তখনকার যুগে দুরাশা ছিল। পথিকের গলায় ফাঁস দিয়ে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করাই ছিল তাদের কাজ। গায়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে অন্যের মালামাল হস্তগত করাই ছিল তাদের উপজীবিকা। এই দুর্ধর্ষ জাতির সামনে মহানবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ : 'ওজন ঠিকমত দিও' ঘোষণা করে এমনই এক ইনসাফপন্থী নির্লোভ জাতিসত্তা কায়েম করতে সক্ষম হন যে, যারাই একদিন পরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করাকেই বাহাদুরি ও বীরত্ব বলে মনে করতো তারাই আত্মদর্শী , সমমর্মী ও ইনসাফপন্থী হিসাবে রাস্তার ধারে মালামাল অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে নিশ্চিন্তে সালাত আদায় করতে

www.pathagar.com

নির্দ্বিধায় চলে যাওয়ার মতো নির্মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে ওঠে। একটা দুর্দম জাতির এই মনোবিপ্লব সাধন বিভিন্ন ঐতিহাসিকের কাছে আজও বিস্ময়কর বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

মদ্যপান প্রথার অবসান

তদানীন্তন যুগে মদ্যপান ছিল এক ধরনের ফ্যাশন। প্রায় ঘরে ঘরেই মদের পাত্র বিদ্যমান ছিল। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নির্বিশেষে মদ্যপান করা তেমন অশোভন অশালীন ছিল না। মদ্যপান প্রথা সমাজের এমনি গভীরে শিকড় চালিয়ে দিয়েছিলে যে, মহানবী (সা)-র প্রাথমিক যুগে কেউ কেউ মদ্যপানজনিত কারণে নেশাতুর অবস্থাতেই মসজিদে গিয়ে সালাতে সামিল হতেন কিন্তু মহানবী (সা)-র মুখে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা ঃ 'মদ্যপান করা হারাম' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সকলেই যার যতো পাত্র ছিল সব রাস্তায় ফেলে দেয়, পথে পথে সেদিন মদের স্রোত বয়ে যায়। প্রাণ নিধনের ভয় দেখিয়েও আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি জনগণকে মদ্যপান করা থেকে এমনভাবে বিরত করতে সক্ষম হয়নি, যা সেদিন মহানবী (সা)-র মুখের মাত্র একটা কথাতেই সংঘটিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর নেই।

মহানবী (সা) বিশেষ এক যুগের বর্বরোচিত সমাজে আবির্ভূত হয়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সামাজিক সংস্কার সাধন করে গেছেন, তাঁর সেই সংস্কারের স্বরূপ আজও সারা বিশ্ব শ্রদ্ধানত মস্তকে স্মরণ করে। মহান আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কুরআনই সেই সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সেই চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ আজও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, যার যথার্থতা সম্পর্কে W. Muir স্বীকারোক্তি করেছেন ঃ There is probably in the world no other book which has remained twelve centuries with so pure a text. সেই শাশ্বত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নির্দেশনাতেই মহানবী (সা) একটা উচ্ছৃঙ্খল জাতিকেই শুধু নিয়ম-কানুনের বিধানে সুনিয়ন্ত্রিত করে যান নি তার আলোকে সর্বযুগের, সর্বকালের মানুষের জন্যে সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে অনুপম পথ নির্দেশ সংরক্ষণ করে গেছেন। মহানবী (সা)-র সংস্কার

www.pathagar.com

আন্দোলনের সফলতা লাভে বিস্ময় প্রকাশ করে Bosworth Smith মন্তব্য করেছেনঃ 'By a fortune absolutely unique in history, Muhammad is the threefold founder of a nation, of an empire, and of religion. পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত আজও মহানবী (সা)–র কায়েমকৃত নীতি নিয়মের প্রতি সবাই আনুগত্য জ্ঞাপন করে।

বিজয় নীতির পরিবর্তন

দুশমনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাই ছিল সে যুগের চিরাচরিত রীতি। দুশমনের ওপর বিজয়ী হলে বেপরোয়া প্রতিশোধ নেওয়াই মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। আজও জীবজগত বিশেষ করে মানুষ তার এই মানসিক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। অথচ, মক্কাবাসীরা মহানবী (সা)–র উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করার পরেও তিনি যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন যুগের প্রচলিত প্রথাকে অবরুদ্ধ করে, জীবজগতের তথা মানুষের মনের স্বাভাবিক বৃত্তির সংস্কার সাধন করে তাদেরকে কেমন ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেছিলেন, ঐতিহাসিক গীবন মহানবী (সা)–র মানুষের স্বাভাবিক মননশীলতার সেই ব্যাপক সংস্কার সাধনের চিত্র কী সুন্দর ভাষায় তুলে ধরেছেন ঃ At the height of his temporal power Muhammad forgave even his most deadly enemies-he forgave the woman who poisoned him, he forgave the woman who had taken out the liver of his valiant uncle and eater it, he forgave the man who had dragged one of his own family relatives to death and above all, he forgave all his countryman who had tortured his adherents, and had almost filled him. In the long history of the world there is no instance of magnanimity and forgiveness which can approach those of Muhammad when all his enemies lay at his feet and he forgive them one and

www.pathagar.com

all. বিজিত দুশমনকেও যে মতে উদারতা ও মহানুভবতার জোর থাকলে ক্ষমা করা যায় মহানবী (সা) তারই বাস্তবায়ন করে সারা দুনিয়ার জন্যে অনুশীলনীয় এক শিক্ষা কোর্স রেখে গেছেন। এটাও তাঁর বিজয়নীতির একটা অন্যতম সংস্কার বলে গণ্য করে নেওয়া যায়। জেনেভা কনভেনশনে তাঁরই সংস্কারকৃত নীতির কিয়দংশ ছায়া আজ আমরা দেখতে পাই।

অতীতের প্রবর্তিত সমস্ত কিছু নীতি-নিয়মকে প্রয়োজনবোধে বাতিল করে মানবজাতির কল্যাণার্থে একটা স্থায়ী বিধি-বিধানের প্রবর্তন করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আল-কুরআনে 'রহমাতুল্লিল আলামিন' বা 'বিশ্বজগতের কল্যাণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাস্তবিক পক্ষেই তিনি 'রহমাতুল্লিল আলামিন ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কার্যকলাপে ও প্রবর্তিত বিধি-বিধানে মানুষের জন্যে চিরকল্যাণকর নিয়ম-কানুনই প্রচলিত করে গেছেন। সেই মহানবী (সা)-র অনুসৃত কর্মকান্ড বিশ্বমানবের জন্যে আজ সুফলদায়ক আদর্শ হয়ে রয়েছে। তিনি মানবজাতির কল্যাণকামিতায় যা কিছু কার্যকরী করে গেছেন সে সবই সর্বযুগের সর্বকালের মানব জাতির জন্যেই কল্যাণকর। তিনি কেবল তাঁর যুগের সমস্যার সমাধানেই সচেষ্ট ছিলেন না, তাঁর সংস্কার আন্দোলন চিরযুগদর্শী। মহানবী (স)-এর সংস্কার সাধন ও চির কল্যাণকর নীতি-নিয়মসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে মেজর আর্থার গ্লিন লিওনার্ড তাঁর Islam, Her Moral and Spiritual Value' পুস্তকে অকপটে স্বীকার করেছেন ঃ Muhammad without a shadow of doubt was centuries before his age. He was a thinker and worker not only for his own, but for all times. He was essentialy a modern, a modern of the twentieth century.

আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মহানবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কুরআন-এর দিকনির্দেশনায় যে সব সংস্কার সাধন করে বিশ্বমানবের জন্যে যে শান্তিময় জীবন চেতনার পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন, শত চেষ্টা করেও তার বাইরে যাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। সুতরাং অহেতুক সীমিত জ্ঞান-গরিমায় অন্ধ না হয়ে দিন থাকতে তাঁর অনুসরণ করাই শ্রেয়।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পররাষ্ট্র নীতি

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করেন। তিনিই ছিলেন এই কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। আর তিনিই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছেন পৃথিবীর সকল দেশ ও যুগের সকল রাষ্ট্রনায়কের জন্য আদর্শ ও দিশারীরূপে।

যদিও ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরব জাহানের উপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর রাজনৈতিক বিজয় ও প্রাধান্য সাধিত হয়েছিল কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর মদীনা আগমনের দিন থেকেই। হিজরতের পূর্বে নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে মক্কার অদূরের এক নিভৃত পার্বত্য উপত্যকায় কিছু সংখ্যক ঈমানদার ব্যক্তির সংগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যাকে 'বাইয়াতে আকাবা' বলা হয়, ঐ চুক্তির বাস্তবায়নই ছিলো ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। মদীনার মু'মিন ব্যক্তিরা অঙ্গীকার করেছিলেন যে তারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নিজেদের জানমাল এবং এক কথায় জীবনের সর্বস্ব ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ-অনুকরণ ও সাহায্য-সহযোগিতায় উৎসর্গ করবে। এর জবাবে প্রিয়নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তাদেরকে পরকালীন জীবনের চিরশান্তি তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন, তিনি নিজে সুখে-দুঃখে যুদ্ধে-সন্ধিতে

www.pathagar.com

জীবনে-মরণে সর্বদা তাদের সংগেই অবস্থান করবেন বলে নিশ্চয়তা দান করেন।

এ চুক্তির ভিত্তিতেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের সংগে সংগে মদীনা মোনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতএব মদীনা মোনাওয়ারায় তিনি যেমন আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে আগমন করেন, তেমনিভাবে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

হিজরতের পরদিন থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ইয়ামান, বাহরাইন ও আম্মানসহ সমগ্র আরবভূমিই ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হলো। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিকে ইসলামের প্রচার-প্রসার, মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নতি ও পরিশুদ্ধির শিক্ষা দান করতেন, অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে একটি বাস্তবধর্মী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এ সমস্ত কার্যাবলীর জন্য তিনি কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করতেন।

পররাষ্ট্র নীতি

পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ছিলো ঃ

১. আরব দেশের সীমান্তগুলোকে বাইরের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করেছিলেন।

২. ইয়ামান, আম্মান, বাহরাইন, ইরানী দখলকারী থেকে মুক্ত করে ছিলেন।

৩. সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা দূমাতাল জুনদুল জরবা ও আজরা হতে রুমীদের কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

৪. পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ আবিসিনিয়া, ইরান ও মিসরের রাষ্ট্রনায়কের নিকট পত্রযোগে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং সংগে সংগে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে সতর্কও করেছিলেন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের দেশের জনগণের যাবতীয় ক্ষতির জন্যও তাদেরকে দায়ী থাকতে হবে।

৫. শত্রু কখনো আক্রমণ করতে চাইলে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়ে সীমান্তেই তাদের মোকাবেলা করা। তবুকের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

৬. রাষ্ট্রদূতের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেহ এর লংঘন করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেন। মুসায়লামা কাজ্জাব দু'জন দূত প্রেরণ করেছিল। তারা অমর্যাদাকর উক্তি করেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শুধুমাত্র এতটুকু বলেছিলেন যদি দূত হত্যা বৈধ হতো তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম।

হযরত হারেস বিন উমাইল ইজদী (রা) নামক একজন দূতকে বসরার গভর্নর হত্যা করায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। মুতার যুদ্ধ এজন্য সংঘটিত হয়।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি সারা বিশ্বের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী নিয়ে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই ঘোষণা শুধু মুখেই করেননি, বরং এ কথাগুলোকে ইসলামী জীবনের রীতি-নীতি হিসেবে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি মানবতার মান উন্নয়নের সবচেয়ে বড় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ সত্যকেও মানুষের অন্তরে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন যে, মানব জাতির ঐক্য তওহীদে বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব সকলে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করো, এক আল্লাহ্ পাকই সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সব মানুষ একই মূলের শাখা-প্রশাখা এবং একই বাপ-মায়ের সন্তান। এ প্রকৃত ভিত্তির উপর বিশ্ব মানবের ঐক্য হতে পারে এবং বিবাদ ও বিভিন্নতার ভিত্তি বিনষ্ট হতে পারে। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তওহীদে বিশ্বাসের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানবজাতির ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে বিশ্ব মানবের রক্ষাকল্পে, বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করার নিমিত্তে এবং শান্তি কায়েমের জন্যই আবির্ভাব হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি মহত্তম আদর্শের অধিকারী, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, বিশ্ব সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই, মহান আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে পরম শান্তি, পরিপূর্ণ সাফল্য। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা, দয়ামায়া, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, দানশীলতা, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, অঙ্গীকার রক্ষা, আমানতদারী, ক্ষমা ও ঔদার্য, সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণের প্রচেষ্টা-এর প্রত্যেকটি বিশ্বশান্তি স্থাপনের মূল উপাদান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছেন, সকল মানুষ এক আদম সন্তান। অতএব তারা পরস্পর ভাই। এই ভ্রাতৃত্ববোধই মানুষকে একে অন্যের নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় মমতা এবং একতা, তারই ফলশ্রুতি হলো বিশ্বশান্তি। এটিই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। মানুষের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধ ও মমত্ববোধ জাগ্রত করে তোলার আহবান জানিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ হে মানব জাতি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারীর অর্থাৎ আদম (আ) ও হাওয়া থেকে আর তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে এই জন্য বিভক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা একে অন্যের পরিচয় পাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তিই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহিযগার।

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। পবিত্র কুরআনের এই চিরন্তন ঘোষণা মানব মনে মানবতাবোধ তথা ভ্রাতৃত্ববোধ ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ শান্তির দিকে, কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়। কল্যাণকামী মানুষ মাত্রের মনেই পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর এই মহান আদর্শ রেখাপাত করে। এভাবে অশান্তি ও অকল্যাণ দূরীভূত হয় কিন্তু তাই বলে যুদ্ধবিগ্রহ এবং শান্তির সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, তাহলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয় যা আদৌ সম্ভব নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই পর্যায়ে তাঁর নীতিমালা ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ করতে হলে তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হতে হবে পূর্বাহ্নে।

শান্তির প্রয়োজনেই যুদ্ধ

মূলত শান্তি ইসলামের কাম্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদর্শ শান্তিই সকল মানুষের প্রাপ্য। কিন্ত তবুও যদি যুদ্ধ করতে হয় তবে শান্তি স্থাপনের বৃহত্তর প্রয়োজনেই যুদ্ধ করতে হয়। যেমন মানব দেহে ফোঁড়া দেখা দিলে দেহের ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্যেই অপারেশন করতে হয়। দরকার হলে দেহের একটা অংশ কর্তন করে ফেলে দিতে হয়, যাতে করে অবশিষ্টাংশে শান্তি বিরাজমান থাকে। মানব দেহের ন্যায় মানব সমাজেও যখন ব্যথা-বেদনা বা অশান্তির কারণ হয় তখন তার জন্য প্রতিকারস্বরূপ তথা অশান্তির কারণ এবং উপকরণসমূহ দূরীভূত করার প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়। শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য সফল হলে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা দুশমনের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত অশান্তি দূরীভূত না হয়। আর যেন দীন বা জীবন বিধান একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জন্যই হয়। আর যখন তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তখন জালিম ব্যতীত আর কারো বিরুদ্ধে কোন প্রকার কর্মতৎপরতার অনুমতি নেই। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে শান্তি স্থাপনের পথ নির্দেশ করে আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

আর যখন কাফিরগণ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নিকট শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করে তখন তোমরাও তাতে সম্মতি জানাও এবং এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা কর, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেন, জানেন। কিন্তু যদি তারা চুক্তির প্রস্তাব করে তোমাদিগকে ধোঁকা দিতে চায় তবে একথা মনে–প্রাণে বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। যদি তিনি সহায় থাকেন তবে কেউই তোমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কুরআনে বিশ্ব শান্তি স্থাপনের অন্যান্য উপায় অবলম্বনেরও তাকীদ করা হয়েছে। যেমন যখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় একে অন্যকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন সেই প্রতিশ্রুতি যাতে করে অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হয় এর তাকীদ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। নিশ্চয় ওয়াদা অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক পরস্পরের ওয়াদা অঙ্গীকার রক্ষা করার তাকীদ করেছেন। কেননা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তথা বিশ্ব শান্তির জন্য এর প্রয়োজনীতা অত্যন্ত বেশি।

তাই পবিত্র কুরআন তাকীদ করে যাতে করে প্রতিপক্ষকে কোন অবস্থাতেই প্রতারণা না করা হয়।

আজকের বিশ্বে শান্তি চুক্তি করা হয় এবং গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতিও চলতে থাকে। শন্তি চুক্তিকে যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় অবকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অঙ্গীকার রক্ষার তাকীদ করেছেন, ত্যাগ–তিতিক্ষার তালিম দিয়েছেন। বিশ্ব শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ত্যাগ–তিতিক্ষার যে মহান আদর্শ পেশ করেছেন তার একটি উদাহরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ায় মক্কাবাসীর সংগে যে শান্তি চুক্তি হলো হযরত আলী (রা) তার শিরোনামে লিখেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

'এই চুক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কুরায়শদের মধ্যে'।

তখন কাফিররা আপত্তি করলো যে, আমরা যদি তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল মেনে নেই তাহলে তো কোন ঝগড়াই থাকে না। অতএব এখানে তাঁর নামের পরে রসূলুল্লাহ্র স্থলে ইবনে আবদুল্লাহ্ লিখতে হবে। অন্যথায় আমরা শান্তি চুক্তিতে দস্তখত করবো না। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শান্তির বৃহত্তর প্রয়োজনে হযরত আলী (রা)-কে বললেন, "ঠিক আছে, তাদের দাবী মেনে নাও, আমার নামের পর 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি কেটে এখানে ইবনে আবদুল্লাহ লেখ।"

তাঁর উদ্দেশ্য হলো যে -কোন অবস্থায় শান্তি স্থাপিত হোক। আমাকে তারা রাসূল স্বীকার করে না, না করুক। হযরত আলী (রা) বিনীতভাবে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এই শব্দটি কর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে এই শব্দটি কেটে দিলেন। ঠিক এমন সময় পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল। যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর আর পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত মেহেরবান। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হে রাসূল যদিও এই পৌত্তলিকগণ আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলে স্বীকার করে না তাতে কিছু যায় আসে না কেননা, আমি ঘোষণা করছি, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল।

প্রিয় পাঠক, ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করুন বিশ্ব শান্তির আহবায়ক শান্তির খাতিরে এবং মানবতার কল্যাণের খাতিরে যে কুরবানী এবং ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন, এর দৃষ্টান্ত কি পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে?

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিলো বিশ্ব শান্তি স্থাপন। তাঁর মদীনায় আগমনের পর তথা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি সেখানের

www.pathagar.com

ইহুদী নাসারা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে শান্তি চুক্তি করেছিলেন তাকে ইতিহাসের সর্বপ্রথম শান্তি চুক্তি বলা হয়।

বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ইবনে ইসহাক ইবনে হিসাব প্রখ্যাত ফকীহ্ আল্লামা আবু ওয়াইদ আল কাসেম ইবনে সালাম এই শান্তি চুক্তির বিস্তারিত পেশ করেছেন। ওয়াকিদী তার কিতাবুল ম্যাগাজিতে এই শান্তি চুক্তির কয়েকটি দফার উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে এই শান্তি চুক্তি সর্বকালের মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও আদর্শ হয়ে রয়েছে এবং এর গুরুত্ব যে সমধিক একথা ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিকগণও তাদের গ্রন্থাবলীতে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ইরাকের বিখ্যাত খৃস্টান ঐতিহাসিক মজিদ খাদ্যুরী তার "War and peace ; In the law of Islam" গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক চুক্তির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

এতদ্বারা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠাতা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষত পাশ্চাত্যের অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কত বেশী তাও সহজে অনুমেয়।

www.pathagar.com

সশস্ত্র সংগ্রামে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

আমরা যুদ্ধ বলতে বুঝি ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ। কিন্তু ইসলামের জিহাদ তা নয়। ইসলামের জিহাদের গতিপথ দ্বিবিধ। একটি হলো তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কুফরের বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াই সশস্ত্রও হতে পারে কিম্বা প্রতিরোধের মাধ্যমেও হতে পারে। অন্যটি হলো নফসের সাথে জিহাদ। অবশ্য দ্বিতীয় জিহাদটিকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'জিহাদে আকবর' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। ইসলাম উভয়বিধ জিহাদের ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়। কারণ আমরা জানি মস্তিষ্কজাত কোন চিন্তাধারা মানুষকে প্রকৃত সুখ ও শান্তি দিতে পারে না। দিতে পারে না মুক্তির আস্বাদন কিংবা স্বাধীনতার নির্ভেজাল অভিজ্ঞতা। আল্লাহ্‌র দেয়া সহজ সরল পথই কেবল মানুষের মনজিলে মকসুদে উত্তরণ ঘটাতে পারে। আর আল্লাহ্‌র পথে চলতে যেয়ে বাধা এলে সে বাধা অতিক্রম করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবতার সত্যিকার সার্থকতা।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ আসেনি। তখন জিহাদ বিষয়ক যে সব ওহী এসেছে, তা ছিলো আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা, কাফিরদের আনুগত্য না করা, উন্নত নফস গড়ে তোলার জন্য সাধনা করা, আল্লাহ্‌র কুরবত ও রিযামন্দী হাসিলের জন্য হিজরত, ইবাদত ও সবরের মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সুকৌশলে ও সদুপদেশ প্রদান করে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করা [দ্র. কুরআন মজিদ : সূরা আনকাবূত : আয়াত ৬৯, সূরা ফুরকান : আয়াত ৫২, আনকাবূত : আয়াত ৬, সূরা নহল :

www.pathagar.com

আয়াত ১২৫ ইত্যাদি]। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাদানী জীবনে যখন কাফিরদের সশস্ত্র আক্রমণ বিষম আকার ধারণ করলো তখনই আমরা লক্ষ্য করি আল্লাহ্ তা'আলা সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই সব নির্দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সর্ব প্রথম যে ওহীটি নাযিল হয় তা এখানে প্রণিধানযোগ্য : "উযিনা লিল্লাযীনা য়ুকাতালূনা বি আন্নাহুম জু'লিমূ, ওয়া ইন্নাল্লাহা 'আলা নাস্'রিহীম লাকাদীর।"–

তাদেরকে যুদ্ধের (কিতাল) অনুমতি দেওয়া হলো যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে ; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সর্বতোভাবে সক্ষম (সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৯)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : "ওয়া কাতিলূ ফী সাবীলিল্লাহিল্লাযীনা ইউকাতিলূনাকুম ওয়া লা তা'তাদূ, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন।"–

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না –সূরা বাকারা : ১৯০

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে মদীনা মনওয়ারায় হিজরত করেন ৬২২ খৃষ্টাব্দে। হিজরতের পর তিনি মদীনা মনওয়ারায় একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের পত্তন করেন। মসজিদুন নববী-কেন্দ্রিক সেই কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য তিনি একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার জন্য একটি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মদীনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরাট সাফল্য মক্কার কাফিরদেরকে অস্থির করে তুললো। মদীনা মনওয়ারার জনগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে–এ খবরে তাদের রোষ ও হিংসা চরমে উঠলো। তারা নানাভাবে মুসলমানদের উপর জুলুম করতে লাগলো, এমন কি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা মদীনার সীমান্তে এসে লুটপাট, অপহরণ ইত্যাদি

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলো। আর সে কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। অস্ত্রের বদলা অস্ত্রে গ্রহণ করার জন্য তিনি সংঘবদ্ধ করলেন তাঁর সংগী–সাথীদেরকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযান পরিচালিত হয়। হাদীস শরীফে দেখা যায় কাফিরদের বিরুদ্ধে এইসব অভিযানকে দুইটি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছেঃ ১. গাযওয়া ২. সারীয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযান নিজে পরিচালনা করেছেন তাকে বলা হয় গাযওয়া। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য যে সব ছোট ছোট দল বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়েছিলো তাকে বলা হয় সারীয়া। গাযওয়া থেকেই 'গাযী' শব্দটি এসেছে।

জানা যায় গাযওয়ার সংখ্যা ২৭টি। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে গাযওয়াসমূহের বিবরণ দেওয়া গেল এবং সেই সংগে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ফতেহ মক্কার বিবরণও যথাস্থানে সংযুক্ত করা হলো ঃ

১. গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান

এটাই প্রথম গাযওয়া। সংঘটিত হয় সফর ২ হিজরী। সেনাপতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০ জন মুহাজির। নিশানবরদার ছিলেন হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। নিশানের রং ছিলো সাদা এবং তাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লেখা ছিলো। ওয়াদ্দান নামক স্থানে বনী জামরার উদ্দেশ্যে এই গাযওয়া পরিচালিত হয় বলে এর নাম গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান। কোন সংঘর্ষ হয়নি । বনী জামরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই অভিযানে ১৫ রাত অতিবাহিত (অর্থাৎ ১২ সফর–২৬ সফর) হয়। এর আর এক নাম গাযওয়ায়ে আবওয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুপস্থিতিতে এই সময় মদীনার শাসনভার ন্যস্ত ছিলো হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু–এর উপর।

www.pathagar.com

২. গাযওয়ায়ে বুওয়াত

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল মাসের প্রথম ভাগ। সেনাপতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। সৈন্য সংখ্যা ছিলো ২০০ জন মুহাজির। নিশানবরদার ছিলেন হযরত সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু। শত্রুদের সংখ্যা ছিলো ১০০। সংগে আড়াই হাজার উটও ছিলো। কোন সংঘর্ষ হয়নি। এই সময় মদীনার অস্থায়ী শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

৩. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান

গাযওয়ায়ে বুওয়াতের কয়েকদিন পর কুরয বিন জাবের ফেহ্রী চারণভূমি আক্রমণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেনাপতিত্বে তাদের দমনার্থে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন নিশানবরদার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনবার্তা পেয়ে শত্রুরা পলায়ন করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বদরের নিকটবর্তী সাফওয়ান ওয়াদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময় মদীনার অস্থায়ী শাসক নিযুক্ত হন হযরত জায়েদ ইবনে হারিসা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

৪. গাযওয়ায়ে ওশায়রা

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস। কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ানের সিরিয়ার পথ রুদ্ধ করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। সৈন্য ছিলো ২০০ মুহাজির। নিশানবরদার ছিলেন হযরত হামযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু। আর আবূ সুফিয়ান অন্য পথ ধরে সিরিয়া গমন করে। আবূ সুফিয়ানের সিরিয়া গমনের উদ্দেশ্য ছিলো অস্ত্র খরিদ। আবূ সুফিয়ানের এই কাফেলাটি ফেরার পথে বদরের যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অভিযানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওশায়রা নামক স্থানে জমাদিউস সানী মাস পর্যন্ত সসৈন্যে অবস্থান করেন। এই সময় মদীনার শাসনভার ন্যস্ত ছিলো হযরত আবূ সালামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু–এর উপর।

www.pathagar.com

৫. গাযওয়ায়ে বদর

ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ গাযওয়ায়ে বদর। সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান। সেনাপতি ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। সৈন্যসংখ্যা ছিলো মোট ৩১৩ জন। মুহাজির ৬৪ এবং আনসার ২৪৯ জন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পতাকার রং ছিলো সাদা যার বাহক ছিলেন হযরত মুসআব (রা)। এ পতাকার পুরোভাগে ছিলো মুহাজির ও আনসারগণের আলাদা দুটি কালো রংয়ের পতাকা। মুহাজিরগণের পতাকাবাহক ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং আনসারগণের হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)। মাত্র সত্তরটি উট ও দুটি ঘোড়া ছিলো বাহন। এই যুদ্ধে শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো এক হাজার। আর মুজাহিদদের চেয়ে তাদের যুদ্ধোপকরণ ছিলো অনেক বেশি। কিন্তু এ যুদ্ধে মুজাহিদগণ এক অবর্ণনীয় বিজয় লাভ করেন। শত্রু নেতা আবূ জাহেলসহ ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। মুজাহিদগণের মধ্যে চৌদ্দজন শাহাদাত লাভ করেন।

৬. গাযওয়ায়ে বনী সুলাইম

গাযওয়ায়ে বদর থেকে মদীনায় ফিরে এসে কয়েক দিন পর বনী সুলায়মের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই সময় মদীনার শাসনভার হযরত সিবা ইবনে উরফুতাত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর অর্পিত হয়। এই অভিযানে হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু পতাকা বহন করেন। শত্রুরা পলায়ন করে। তিন দিন অবস্থান করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সসৈন্যে মদীনায় ফিরে আসেন।

৭. গাযওয়ায়ে বনী কায়নুকা

বদরের যুদ্ধের পর থেকে মদীনার কায়নুকা নামক ইহুদী গোত্র মদীনার সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। তারা একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকার বিরুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ শওয়াল একটি অভিযান পরিচালিত

www.pathagar.com

হয়। এই অভিযানে পতাকা বহন করেন হযরত আমীর হামযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু । হযরত আবূ লুবাবা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর মদীনা শরীফের শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। বনী কায়নুকার দুর্গগুলোকে ১৫ রাত অবরোধ করে রাখা হয়। ইহুদীরা সংখ্যায় ছিলো ৭ শত। ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করে এবং পরে তারা নির্বাসিত হয়ে সিরিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

৮. গাযওয়ায়ে সাবীক

দ্বিতীয় হিজরীর ৫ জিলহজ্জ। বদর যুদ্ধে পরাজিত কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ান ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলে এবং কয়েকটি খেজুর বাগান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নামক এক আনসার সাহাবীকে হত্যা করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনার শাসনভার হযরত বাশীর বিন আবুল মুনজির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর ন্যস্ত করে সসৈন্যে অগ্রসর হন। মুজাহিদদের সংখ্যা আনসার ও মুহাজির সমন্বয়ে ২০০ জন ছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের সংবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। দ্রুত পলায়নকালে তারা বেশ কিছু ছাতুর বস্তা ফেলে রেখে যায়। আরবীতে ছাতুকে সাবীক বলে, যার থেকে এই অভিযানের নাম হয়েছে গাযওয়ায়ে সাবীক।

৯. গাযওয়ায়ে কারকারাতুল কুদুর

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কারকারাতুল কুদুর অভিমুখে ২০০ মুজাহিদ নিয়ে এক অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় মদীনা শরীফের শাসনভার অর্পিত ছিলো হযরত উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর। নিশানবরদার ছিলেন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

১০. গাযওয়ায়ে জি আমার বা গাযওয়ায়ে গাতফান

মদীনা অঞ্চলে উপদ্রব দমন করার জন্য প্রিয়নবী (সা) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে গাতফান কবিলার বনী সায়লাবা ও বনী মাহরিবের বিরুদ্ধে ৪৫০ জন সাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে বহির্গত হন। মদীনার শাসনভার

www.pathagar.com

অর্পিত হয় হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর। শত্রুরা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

১১. গাযওয়ায়ে বাহ্‌রান

তৃতীয় হিজরীর ৬ জমাদিউল উলা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, বনী সুলাইম এক বিরাট সৈন্য বাহিনী ঐক্যবদ্ধ করে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই খবর পেয়ে তিনি তিন শত সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। মদীনার দায়িত্বভার থাকলো হযরত ইবনে উম্মে মকতুম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর। শত্রুদল পলায়ন করে।

১২. গাযওয়ায়ে ওহুদ

বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরায়শ ও অন্যান্য মুশরিক গোত্রের তিন হাজার সৈন্য মদীনা আক্রমণ করে। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাস তখন। প্রিয়নবী (সা) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে তাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে শত্রুর মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। ওহুদ পাহাড় পিছনে রেখে প্রিয়নবী (সা) সৈন্য মোতায়েন করলেন। পিছনের পাহাড় অতিক্রম করে শত্রুরা পিছন দিক থেকে হামলা যাতে করতে না পারে সেজন্য প্রিয়নবী (সা) ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী সেদিকে নিযুক্ত করলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা)–এর হাতে পতাকা দেওয়া হলো। হযরত আমীর হামযা (রা)–র নেতৃত্বে থাকলো বর্মহীন সৈন্য বাহিনী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর (রা)–এর দায়িত্বে থাকলো তীরন্দাজ বাহিনী। এই লড়াইয়ে ৭০ জন সাহাবা শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। হযরত আমীর হামযা (রা) শহীদ হন। হুযূর (সা)–এর দান্দান শহীদ হয়। এতদসত্ত্বেও শেষে কাফিররা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কাফিরদের মদীনা মনওয়ারা দখলের অপপ্রয়াস মুজাহিদগণ ব্যর্থ করেন। এই লড়াই সংঘটিত হয় ৩ হিজরীর ১১ শাওয়াল।

www.pathagar.com

১৩. গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

আবূ সুফিয়ান পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৭০ জনের মুজাহিদ দল নিয়ে রাওহারের দিকে অগ্রস হন। আট মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি হামরাউল আসাদে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান মুজাহিদদের কথা শুনেই দ্রুত পলায়ন করে।

১৪. গাযওয়ায়ে বনু নযীর

মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নযীর মদীনার সনদের নীতি ভঙ্গ করে এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিয়ে হত্যা করারও চেষ্টা করে। তিনি কয়েকজন সাহাবা নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে গমন করেন। ৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ১৫ দিন তাদের অবরোধ করে রাখেন। পরে তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে এই শর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং মদীনা ছেড়ে চলে যায়।

১৫. গাযওয়ায়ে বদরুল আখির (দ্বিতীয় বদর)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন ওহুদ প্রান্তরে সাফল্যহীনতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবূ সুফিয়ান মদীনা আক্রমণ করার জন্য দুই হাজার সৈন্য ও পঞ্চাশটি অশ্ব সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। তিনি অতি দ্রুত দেড়শত মুজাহিদ ও দশটি অশ্বসহ আবূ সুফিয়ানের গতিরোধের জন্য বদর উপত্যকায় উপস্থিত হন। ওদিকে আবূ সুফিয়ান এ খবর পেয়ে মুজাহিদদের সম্মুখীন হতে সাহসী হলো না। আট মাইল এগিয়ে এসেও সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে অবস্থান করে মদীনা ফিরে আসেন। এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৪ হিজরীর শা'বান মাসে মতান্তরে যিলকদ মাসে। এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়া সাল্লামের বদর–এ দ্বিতীয় অভিযান, তাই একে বদরুল আখির বলা হয়।

১৬. গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর মুহররম মাসে খবর পেলেন আম্মার ও সালাবা নামক গোত্রের যোদ্ধারা মদীনা আক্রমণের আয়োজন করছে। ১০ মুহররম আশুরার দিন তিনি চারশত মুজাহিদ সংগে নিয়ে বের হলেন। 'যাতুররিকা' পৌছে তিনি শুনতে পেলেন শত্রুরা ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

১৭. গাযওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল

দুমাতুল জানদালের খৃস্টান বেদুঈনরা মদীনার সমীপবর্তী এলাকা লুটপাট করতে থাকে এবং তারা মদীনা আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার মুজাহিদ সংগে নিয়ে দুমাতুল জানদালের পথে অগ্রসর হন। কাফিররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে।

১৮. গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক বা মুরায়সী

মদীনা থেকে ৮ মনযিল দূরে অবস্থিত মুরায়সী নামক স্থানে বসবাসরত বনু মুস্তালিক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে হযরত যায়িদ ইবনে খুসাইবা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত যায়িদ ইবনে খুসাইবা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ফিরে এসে বললেন যে, প্রাপ্ত খবর সত্য। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর শা'বান মাসের প্রথম সপ্তাহে মুরায়সীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। খবর পেয়ে শত্রু নেতা হারিস পলায়ন করে। কিন্তু অন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো। কিন্তু মুজাহিদদের প্রতিঘাতে তারা

www.pathagar.com

দিশেহারা হয়ে পলায়ন করলো। শত্রুদের দশজন নিহত হলো এবং ছয়শত বন্দী হলো।

এই অভিযানে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সফর সঙ্গিনী ছিলেন। ফেরার পথে মুনাফিকগণ তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন করে এবং মিথ্যা অপবাদে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মর্মান্তিক আঘাত পান। কিছুদিন পর সূরা নূর-এর ১১-২০ আয়াতসমূহ নাযিল হলে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়।

১৯. গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দক

৫ম হিজরীর যিলকদ মাসে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সম্মিলিত কাফিরদল মদীনা আক্রমণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতিরোধকল্পে মদীনা শরীফের অরক্ষিত দিকে পরিখা খনন করেন। এই পরিখা দৈর্ঘ্যে ছিলো প্রায় দেড় মাইল, গভীর ৯-১০ হাত এবং প্রস্থে ৭-১০ হাত। পরিখা খনন করতে তিন হাজার মুজাহিদের কুড়ি দিন সময় লাগে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেও এই পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন। কাফিরদল মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু পরিখা পাড়ি দিতে অপারগ হওয়ায় প্রায় একমাস অবস্থান করার পর প্রচন্ড শীত, প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ে তারা পর্যুদস্ত হয়ে প্রচুর মালমাত্তা ও অস্ত্র-সরঞ্জাম রেখে পলায়ন করে। উল্লেখ্য যে, পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

২০. গাযওয়ায়ে বনু কুরায়যা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আহযাব বা খন্দক রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে বিজয়ী মুজাহিদগণকে নিয়ে মদীনার সনদ ভঙ্গকারী বিদ্রোহী বনু কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করলেন। ২৫ দিন অবরোধ অবস্থায় থাকার পর বনু কুরায়যা আত্মসমর্পণ করে।

www.pathagar.com

২১. গাযওয়ায়ে গাবা বা জিকারাদ

গাবা মদীনা শরীফের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম এবং জিকারাদ একটি পুকুরের নাম। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে উয়াইনা গোত্র এখানে চারণরত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ২০টি উট লুণ্ঠন করে নেয় এবং চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবূ যর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্রকে হত্যা করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খবর পেয়ে কয়েকজন সাহাবীসহ দস্যুদের আটকের জন্য দ্রুত তাদের পিছনে ধাওয়া করেন। শত্রুরা লুণ্ঠিত উটগুলো রেখে পলায়ন করে।

২২. গাযওয়ায়ে বনু লেহ্ইয়ান

বনূ লেহ্ইয়ানের বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু শত্রুরা মুজাহিদ বাহিনীর আগমন বার্তা শুনে পার্বত্য এলাকায় পলায়ন করে।

২৩. গাযওয়ায়ে হুদায়বিয়া এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি

মক্কা মুয়াযযামার অদূরে হুদায়বিয়া কূপের নামে গ্রামটির নামকরণ হয় হুদায়বিয়া। হিজরী ৮ম সনের শাওয়াল মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উমরা পালনার্থে ১৪০০ সাহাবা-ই-কিরাম সংগে নিয়ে মক্কা মুয়াযযমার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কোনরূপ যুদ্ধের নিয়তে তিনি রওয়ানা হননি। আরবদের প্রথানুযায়ী একখানি খাপবদ্ধ তলওয়ার ছাড়া কারো সাথে কোনোরূপ অস্ত্র ছিলো না। কিন্তু পথিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন মক্কার কাফিররা তাঁদের মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মারফত কুরায়শ নেতাদের কাছে খবর পাঠালেন যে, এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উমরা পালন করা। কিন্তু হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ফিরতে দেরী হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে গুজব রটে গেলো হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাফিররা হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

সাহাবা-ই-কিরাম ভীষণ বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে উঠলেন। তাঁরা একটি বাবলা গাছের তলায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, কুরায়শরা যদি হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে হত্যা করেই থাকে তাহলে তাঁরা আপ্রাণ যুদ্ধ করে যাবেন। একেই বলা হয় বায়আত-ই-রিদওয়ান।

কিন্তু হযরত উসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলেন। কাফির কুরায়শরা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সংগে সংগে সন্ধির সম্মতি দান করলেন এবং সন্ধিপত্রে উভয় দল স্বাক্ষর করলেন। সন্ধির শর্তসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ ছিলো ঃ

১. এই চুক্তি দশ বছরকাল বলবৎ হবে।

২. মুসলমানগণ এবার ফিরে যাবেন।

৩. পরবর্তী বছর মাত্র তিন দিনের জন্য মুসলমানগণ মক্কায় এসে অবস্থান করতে পারবেন।

৪. খাপবদ্ধ একটি তলোয়ার ছাড়া মুসলমানরা অন্য কোন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না।

৫. মক্কা থেকে মুসলিম অমুসলিম কাউকেই তারা সংগে নিয়ে যেতে পারবেন না।

৬. মক্কা থেকে কেউ পালিয়ে তাদের নিকট গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. মদীনা থেকে কেউ মক্কায় আসলে কুরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না।

৮. কোন গোত্র কোন পক্ষের সাথে মৈত্রী চুক্তি করলে তাদের বিরুদ্ধে অপর পক্ষ প্রকাশ্যে বা গোপনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না ইত্যাদি।

সন্ধির পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিনদিন হুদায়বিয়ায় অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় ওহী নাযিল হয়ঃ ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম্ মুবীন-নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম (সূরা ফাত্হ)।

www.pathagar.com

২৪. গাযওয়ায়ে খাইবার

৭ম হিজরীর যিলহজ মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাইবারের য়াহূদীদের বিরুদ্ধে ১৪০০ পদাতিক এবং ২শত অশ্বারোহী মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। য়াহূদীরা সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান নেয়। তাদের সাতটি দুর্গ একে একে বিজিত হয়। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত অজেয় কামূস দুর্গটি জয় করতে বেশ সময় নেয়। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বীরত্বে অবশেষে দুর্গটির পতন ঘটে। বীরত্বের জন্য হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'আসাদুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই যুদ্ধে ৯৩ জন য়াহূদী নিহত হয়। ১৫ জন মুজাহিদ শহীদ হন।

২৫. গাযওয়ায়ে ওয়াদিউল কুরা

খাইবার বিজয়ের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়াদিউল কুরা অভিমুখে রওয়ানা হন। এখানে পৌঁছা মাত্রই য়াহূদীরা মুজাহিদদের প্রতি শর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিছুক্ষণ শত্রুদের মুকাবিলা করার পর য়াহূদীরা পরাজিত হয়।

২৬. ফতেহ্ মক্কা বা মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধি মুতাবিক আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বনূ খুযা'আ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ওদিকে বনূ বকর কাফির কুরায়শদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বনূ বকর গোত্র পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বনূ খুযা'আ গোত্রের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করলো এবং কাফির কুরায়শ নেতৃবর্গ প্রকাশ্যভাবে এ আক্রমণে বনূ বকরকে সাহায্য করলো। স্বাভাবিকভাবে তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভংগ করলো। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগলো। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিমুখে ৮ম হিজরীর ১০ তারিখে দশ হাজার সাহাবী নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আরব গোত্রসমূহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

বাহিনীতে এসে যোগ দিতে লাগলো। তিনি মক্কা শরীফের নিকটবর্তী মাররুয জাহ্‌রান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। রাতে আবূ সুফিয়ান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। ২১ শে রমযান, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীবেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সেদিন ছিলো শুক্রবার।

২৭. গাযওয়ায়ে হুনায়ন

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, একদল কাফির বিশেষ করে হাওয়াযান গোত্র যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হচ্ছে। বারো হাজার মুজাহিদ নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন। কাফিররা হুনায়ন প্রান্তরে অতর্কিতে মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুদক্ষ নেতৃত্বে সেদিন কাফিররা অতর্কিত হামলার দাঁতভাংগা জবাব পায়। তারা পরাজিত হয়। তাদের ৭০ জন নিহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে মাত্র ৫ জন শাহাদতপ্রাপ্ত হন। বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬ হাজার, হস্তগত হওয়া সম্পদের মধ্যে ছিলো ২৪,০০০ উট, প্রায় ৪০,০০০ ছাগ-মেষ এবং ৪,০০০ উকিয়া পরিমাণ রৌপ্য। এই সময় ছিল শওয়াল মাসের ১০ তারিখ।

২৮. গাযওয়ায়ে তায়েফ

কিছুদিন পর হুনায়ন ও আওতাস থেকে পলায়নকারী কিছু সংখ্যক কাফির এক বিরাট শক্তি সংগ্রহ করে এক বৎসরের রসদসহ তায়েফের সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এদের অধিকাংশই ছিল সাকীফ গোত্রের। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদ বাহিনীসহ তায়েফ গমন করলেন এবং দুর্গ অবরোধ করলেন। যেহেতু এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন বুঝলেন শত্রু কাবু হয়ে গেছে তখন অবরোধ তুলে নিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবরোধ তুলে নিয়ে হাত তুলে

www.pathagar.com

বললেন ঃ আয় আল্লাহ্, তুমি সাকীফ গোত্রের লোকজনকে হিদায়ত কর এবং তাদেরকে আমার কাছে আসার তওফিক দাও।

বলা বাহুল্য, অল্প কিছু দিনের মধ্যে দুশমন পক্ষ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বায়'আত করে মুসলমান হয়ে যায়। উল্লেখ্য এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথম দুর্গ বিধ্বংসী যন্ত্র 'দুবাব' ও 'মিনজানিক' ব্যবহৃত হয়।

২৯. গাযওয়ায়ে তাবুক

তাবুক অভিযান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শেষ অভিযান। সংঘটিত হয় ৯ম হিজরীর রজব মাসে। এ অভিযানটি ছিলো রোমানদের বিরুদ্ধে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, রোমানরা মদীনা আক্রমণের জন্য বিপুল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাই তিনি ত্রিশ হাজার বীর মুজাহিদ নিয়ে সিরিয়ার নিকটবর্তী তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হন। রোমান বাহিনী মুসলমানদের বিরাট আয়োজন দেখে যুদ্ধ করতে সাহসী হলো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কয়েক দিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন।

বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধি ও ফতেহ্ মক্কা বাদে মোট সাতাশটি গাযওয়া স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন ষাটটি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ হয়নি। সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতো সাফল্য পৃথিবীর কারো পক্ষে কখনই সম্ভব হয়নি। এতোগুলো অভিযানের ফলে পক্ষ-বিপক্ষ যোগ করে সর্বমোট নিহতের সংখ্যা মাত্র ১০১৮ জন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে একটি লোককেও হত্যা করেন নি। তাঁর করুণা ও ক্ষমার মাহাত্ম্যই তাঁকে বিজয়ের শীর্ষে নিয়ে যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানব সমাজের বিপর্যয় দূরীভূত করাই ছিলো তাঁর অভিযানগুলোর লক্ষ্য। সেই মহান নবী সরদারে দু' আলম হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম।

www.pathagar.com

রসূলে করীম (সা) যখন রণাঙ্গনে

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

প্রিয়নবী রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়েছে। রণাঙ্গনে উপস্থিত হতে হয়েছে এবং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। হিজরতের পর মাত্র ১০ বছর সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ৮০টি যুদ্ধ করতে হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭টি যুদ্ধে তিনি সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ওহুদ যুদ্ধে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। তাঁর মাথা ফেটেছে, দেহ মোবারক রক্তাক্ত হয়েছে। আর ৫৩টি যুদ্ধে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রেরণ করেছেন। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ৮০টি যুদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো প্রতি বছর গড়ে ৮টি করে যুদ্ধ করতে হয়েছে মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। প্রশ্ন হলো, কেন?

এই প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে ইসলামের জিহাদনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তিই তার মূল কথা। ইসলাম বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের আহ্বান জানায়। বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামের যাবতীয় বিধিনিষেধ প্রণীত হয়েছে। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্ববন্ধুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানায়। ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি ঘোষণা করে। মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরতের পর মদীনাবাসী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে যে শান্তি চুক্তি করেছিলেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার পৌত্তলিকদের সঙ্গে মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত

www.pathagar.com

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সন্ধি করেছিলেন তা আমাদের পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যের প্রমাণ।

কিন্তু যদি কেহ অশান্তি সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়, মুসলমানদের জানমালের প্রতি হামলা করে, দুনিয়াতে অত্যাচার-অনাচার, উৎপাত, উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করে, ইসলামের প্রচারে বাধা দেয়, মানবতার এমন দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরায়ে হজ্জে এই সম্পর্কে যে ঘোষণা করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

"যাদের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে উদ্যত হয় তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা তারা অত্যাচারিত।"

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং অত্যাচারীকে তার সমুচিত শাস্তি বিধান করা সত্যসৈনিক মাত্রেরই কর্তব্য। আর এই জিহাদে সে একা থাকবে না ; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের সাহায্যও তার সঙ্গে থাকবে। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের অপরাধ বলতে শুধু এই ছিল যে, তারা বলছে, "আমাদের পরওয়ারদিগার হলেন এক আল্লাহ্" অর্থাৎ তারা মুসলমান-এ অপরাধেই তাদের উপর বর্ণনাতীত অত্যাচার উৎপীড়ন করা হয়েছে। অতএব, অত্যাচারীকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে, কেননা জুলুম-অত্যাচার মানবতাবিরোধী কাজ। মানবতার দুশমনদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই নির্দেশ স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখার তাকীদ করেছেন। জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্র দীন কায়েম হবে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ "হে নবী! কাফির এবং

www.pathagar.com

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অভিযান করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করুন এবং তাদের আশ্রয়স্থল হলো দোযখ।"

জিহাদের শাব্দিক অর্থ হলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। যেহেতু মানুষ অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী হামলাকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্যে সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে, তাই এই প্রচেষ্টাকে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। তবে এর উদ্দেশ্য এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ সাধন এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনের প্রয়োজন। তাই জিহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানব দেহে কোন দুষ্ট ক্ষত হলে তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেমন দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে মানবতার দুশমনেরা যখন জুলুম, অত্যাচার, অন্যায় ও অবিচারে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে তখনই ইসলাম অস্ত্রোপচারের তথা অস্ত্র ধারণের তালিম দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে। জিহাদ প্রথার মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বমানবের যে মহান উপকার সাধন করেছে তা কল্পনাতীত। অতএব জিহাদের নাম শ্রবণ করে আঁতকে উঠলে চলবে না। বরং এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এর পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। এবং যে পরিবেশে সর্বপ্রথম জিহাদের বিধান প্রবর্তন করা হয়, যে অবস্থায় সর্বপ্রথম জিহাদ অভিযান করা হয় তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করতে হবে।

মূলত এই কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের তাকীদ করেছেন। বিশেষ করে যখন মুসলিম জাতি সামগ্রিকভাবে আক্রান্ত হয়, যখন কোন মুসলিম দেশের উপর শত্রুদের হামলা হয়, তখন শত্রুদের চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করার মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের উপর। প্রয়োজনের তাকীদে প্রতিটি মুসলমানকে তার জানমাল এক কথায় সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। তাই জিহাদের জন্য যথাসাধ্য সময়োচিত প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : ''এবং

www.pathagar.com

তোমরা শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চার কর। অশ্ব পোষণ ও অন্যান্য সময়োচিত এবং যুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কর, যাতে তোমরা তা দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুর প্রতি আঘাত হানতে পার, তাদের পর্যুদস্ত ও প্রভাবিত করতে পার। প্রকাশ্য শত্রু ব্যতীত গোপন 'শত্রুও' রয়েছে অর্থাৎ মুনাফিক, তাদেরকে তোমরা জান না,আল্লাহ্‌ পাক জানেন।"

মূলত মুসলমান মাত্রই মুজাহিদ, আল্লাহ্‌র রাহের বীর সৈনিক, সত্য-সৈনিক, তাকে মানবতার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, মানবতার দুশমনকে দমন করতে হবে। কেননা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যাকান্ড থেকেও মারাত্মক এবং জঘন্য কাজ বলে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ ''অতএব, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে দমন করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।'' কেননা, মুসলিম জাতির আবির্ভাব হয়েছে বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। পবিত্র কুনআনে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ ''হে মুসলিম জাতি ! তোমরা উত্তম উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে। তোমরা সত্যের নির্দেশ দিতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখ। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর।" দুনিয়াতে অশান্তি, উৎপাত এবং ফিৎনা-ফাসাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মুসলিম জাতিকে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ ''এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখ যতক্ষণ না অশান্তি, উৎপাত, ফিৎনা-ফাসাদ বন্ধ হয় আর আল্লাহ্‌র দীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

এতদ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম জাতির উপর। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তাকীদ করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"হে মুসলিম জাতি! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তাদের উপর চরম আঘাত হান যেন তারা তোমাদের আঘাতে কঠোরতা দেখতে পায়।"

www.pathagar.com

এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, মক্কা মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ ১৩টি বছর অত্যাচারিত উৎপীড়িত হওয়ার পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন তখনও ইসলাম এবং মানবতার দুশমনরা মুসলমানদের শান্তিতে বসবাস করতে দিল না, বরং প্রাণের মদীনার উপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে পাঁয়তারা করতে লাগল। এমন সময় যখন তারা উৎপীড়িত মুসলমানদের বাড়িঘর, স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ দখল করে নিয়েছিল, তাদেরকে অসহায় নিরুপায় অবস্থায় আশ্রয় নিতে হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিন্নমূল মুজাহিদদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, এমন সময় মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল পৌত্তলিকরা। শুরু হলো জিহাদের কার্যক্রম।

এখানে একথাও স্মরণযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত লাভের ১৩তম বছরের ১২ রবিউল আউয়াল রোজ শুক্রবার মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে আগমন করেন এবং হিজরী সনের প্রথম বছরের প্রথম রমযানের অর্থাৎ হিজরতের মাত্র ৫ মাস ১৮ দিন পরই জিহাদের কার্যক্রম শুরু হয়। মদীনা শরীফ আগমনের পরে মক্কার কুরায়শদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জঙ্গী বাহিনী প্রেরিত হয়। তার নেতৃত্ব দেন হযরত আমীর হামযা (রা)। এই দলে ৩০০ মুজাহিদ ছিল। অপরদিকে আবূ জেহেলের নেতৃত্বে পৌত্তলিকের ৩০০ লোকের একটি দল মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছিল। মুসলমানদের প্রস্তুতি দেখে আবূ জেহেল ও তার সংগীরা যুদ্ধ না করেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম পৌত্তলিক শক্তি উপলব্ধি করলো যে, নির্যাতিত মুসলমানগণ তাদের দুশমনদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে বুদ্যান নামক স্থানে অভিযান করা হয়। এই অভিযানে ৭০ জন মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেন। এই দলের নেতৃত্ব করেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এই অভিযানেও যুদ্ধ হয়নি। তবে বনূ হামযা গোত্রের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ভাষা ছিল এই , "এটি হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর পক্ষ থেকে বনু হামযা গোত্রের জন্য শান্তিচুক্তি। এই গোত্রের লোকদের জানমাল সংরক্ষিত থাকবে। যদি তাদের প্রতি কেউ হামলা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। আর আল্লাহ্র রসূল যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান জানাবেন তখন তারা এই আহ্বানে সাড়া দিবে।"

এই চুক্তির মাধ্যমে পৌত্তলিকদের একটি বন্ধু গোত্রকে মুসলমানদের পক্ষে আনা হলো। জিহাদের কার্যক্রম এভাবে শুরু হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা রাব্বুল আলামীন এই পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ "হে নবী ! মু'মিনদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করুন।"

তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "বেহেশ্‌ত হলো তরবারির ছায়াতলে।" একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি ইরশাদ করলেনঃ "যে মু'মিন তার জানমাল নিয়ে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে। দুশমনদের মুকাবিলা করে, সত্য ও ন্যায়ের অভিযান চালায়।" যদিও সেদিন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ঈমানের বলে বলীয়ান। তাই যে কোন শক্তির মুকাবিলা করায় তারা পিছ–পা হয়নি। পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছে। অর্থাৎ "নিশ্চয় আমাদের সৈন্যদল বিজয়ী হতে থাকবে।" এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের নিজের সৈন্য বলে ঘোষণা করেছেন। এবং তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব মুসলমানদের শক্তির মূল উৎসই ছিল স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান। এই ঈমানী শক্তিতেই মুসলমানরা ছিল শক্তিমান আর এই শক্তির প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয় বদরের যুদ্ধে, যা দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান অনুষ্ঠিত হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেদিন সর্বপ্রথম অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। মাত্র ৩১৩ জন

www.pathagar.com

নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানকে নিয়ে তিনি বদরের ঐতিহাসিক ময়দানে দুশমনদের মুকাবিলা করেন। মুসলমানগণ সংখ্যায় কম ছিলেন, অস্ত্রবল বলতে কিছুই ছিল না। একখানি তরবারিতে ৯ জন মুজাহিদ শরীক হন। মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল মুসলিম বাহিনীর কাছে। কিন্তু তাঁদের অন্তরে ঈমানের তেজ ছিল, ছিল সত্যের বল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শক্তিতে তাঁরা ছিলেন শক্তিমান। তাই ১০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত শত্রু বাহিনীর মুকাবিলা করেছেন তাঁরা বীরবিক্রমে এবং শত্রুকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে তাদের অন্যায় আচরণের সমুচিত শাস্তি দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে একটি শর্তে বিজয়ের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। তাহলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না , আর চিন্তিতও হয়ো না, তোমরাই হবে অবশেষে বিজয়ী, যদি প্রকৃত মু'মিন হও।" প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়েছিলেন তাঁরা সাহাবায়ে কিরাম। এইজন্য হানাদার দুশমনদের সংখ্যা যত বেশিই হোকনা কেন এবং তারা যত অস্ত্রশস্ত্রেই সজ্জিত হোকনা কেন মুসলমানদের সম্মুখে এই বিষয়টি কোন গুরুত্ব লাভ করতো না বরং মুসলমানরা সিংহশাবকের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তো হামলাকারী কাফিরদের উপর। যারা ঈমানী শক্তির অধিকারী তারা আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হয়েই যুদ্ধ করে। দুশমনের সংখ্যা যত বেশিই হোকনা কেন মুসলমানদের তাতে কিছু যায় আসে না। পবিত্র কুরআনে এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "মুষ্টিমেয় সংখ্যক (মু'মিন) দল কত বিরাট (কাফির) বাহিনীকে পরাজিত করেছে।" পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণার সত্যতার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে। প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের সাথে যত যুদ্ধ হয়েছে, তাতে কোন দিনই মুসলমানদের সংখ্যা শত্রুসৈন্য থেকে

www.pathagar.com

অধিক ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বিজয়মালা শোভা পেয়েছে মুসলমানদের কন্ঠে। এ পর্যায়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা অপ্রাসংগিক হবে না।

যুদ্ধ	মুসলমানদের সংখ্যা	শত্রুসৈন্য	বিজয় মুসলমানদের
বদর	৩১৩	১,০০০	,,
ওহুদ	৭০০	৩,০০০	,,
খন্দক	৩,০০০	২৪,০০০	,,
মুতা	৩,০০০	১০,০০০	,,
ইয়ারমুক	৪০,০০০	২,৪০,০০০	,,
কাদেসিয়া	৮,০০০	৬০,০০০	,,
স্পেন	৭,০০০	১,০০,০০০	,,
সিন্ধু	৬,০০০	৫০,০০০	,,

এতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমান কোনদিন জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে লড়াই করে না, বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে তাই কাম্য। আর যদি শাহাদত বরণের দুর্লভ সুযোগ লাভ হয় তবে তা আরও বড় সাফল্য।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ব্যাপারে যে নিয়মনীতি প্রবর্তন করেছেন, তার শুভ পরিণতি শুধু যে সুদূরপ্রসারী হয়েছে তাই নয়, বরং ইসলামে জিহাদের যে উদ্দেশ্য তাকেও সফল করেছে।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার

যুগ যুগ ধরে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা বিজয়ের অংশে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ বন্দীদেরকে যত বেশি কষ্ট দেয়া যেত তত বেশি বিজয়ী দল তার সংগ্রামকে সার্থক মনে করতো। পৃথিবীর সকল দেশ এবং সকল যুগের ইতিহাস আমাদের এই বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষী। শুধু বর্বরতার যুগের কথা নয়, এমনকি বর্তমান সভ্য জগতেও একই নিয়ম কার্যকর রয়েছে। সোভিয়েত

www.pathagar.com

রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে কয়েদীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়, তা বিশ্ববাসীর অবিদিত নয়। জার্মানীতে কয়েদীদের দেহনিঃসৃত চর্বি দ্বারা সাবান তৈরি করা হয়েছে। ইসরাইল তার কয়েদীদের দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বের করে ফেলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়েদীদের সাথে যে অমানবিক ব্যবহার করা হয়, তা শ্রবণ করতেও ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হয়। কিন্তু ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের মহানায়ক, ইতিহাসের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিলেন তা হলো, "তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।" বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে প্রহরারত সাহাবায়ে কিরাম তাদের খাদ্য যুদ্ধবন্দীদের খেতে দিলেন এবং নিজেরা অভুক্ত রইলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে এমন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

বদরের যুদ্ধের এই বন্দী কারা ? এরা সেই সব লোক, যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় মুসলমানদের উপর অহরহ জুলুম করেছে। এই জুলুম অত্যাচার অব্যাহত ছিল সুদীর্ঘ ১৩টি বছর যাবত। এমনকি যখন মুসলমানগণ নিজেদের যথাসর্বস্ব মক্কায় ফেলে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছেন, তখনও তারা মুসলমানদেরকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। আজ সেই জালিমরাই বন্দী হয়ে এসেছে মুসলমানদের হাতে। প্রতিশোধ গ্রহণের এটিই তো সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু না, কোন প্রকারের প্রতিশোধ লওয়া যাবে না। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হলো, 'যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।' এই নির্দেশের প্রতি আমল করে সাহাবায়ে কিরাম বদর থেকে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় একশ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করলেন। আর বন্দীদেরকে উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করার সুযোগ দিলেন। নিজেরা না খেয়ে বন্দীদেরকে খেতে দিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বন্দীদেরকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্তি দিলেন। আর যারা মুক্তিপণ আদায় করতে পারলো না, তাদের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হলো যে, মুসলমানদের দশটি শিশুকে তারা লেখাপড়া

www.pathagar.com

শিখাবে এবং এই দায়িত্ব পালন করে মুক্তি লাভ করবে। আর যারা এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, তাদেরকে এমনিই মুক্তি দিয়ে দিলেন। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে যে উদারতা এবং মহানুভবতার নমুনা পেশ করলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অনেক বন্দী ইসলাম কবূল করে জীবনকে ধন্য করেছে।

সুবিচার কায়েম করা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি যুদ্ধের পর সুবিচার কায়েম করতেন এবং সকলকে জানমালের নিরাপত্তা দান করতেন। ফিৎনা-ফাসাদ, অশান্তি-উপদ্রব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখতেন। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সে যুগের রাজা-বাদশাহ এবং গোত্রীয় সরদারদেরকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার ভাষা হলো এই ঃ

১. ইসলাম কবূল কর, সুবিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা রয়েছে ইসলামে।

২. জিযিয়া বা মুসলিম ট্যাক্স আদায় করে আনুগত্য প্রকাশ কর।

৩. যুদ্ধের জন্য তৈরী হও, যাতে করে এই এলাকার জনগণ ইসলামের মহান আদর্শ গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

প্রথম দু'টি কথা যারা মেনে নিয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে কোন সময় যুদ্ধ করেননি। এতদ্ব্যতীত তিনি মুসলমানদেরকে নারী-শিশু এবং বৃদ্ধদের উপর হামলা না করার নির্দেশ প্রদান করতেন।

দুশমন সক্রিয় হওয়ার পূর্বেই তাদের প্রতি আঘাত হানা হতো

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন হামলাকারীর প্রস্তুতির সংবাদ পেতেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের প্রতি আঘাত হানার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

গ্রহণ করতেন। এটি ছিল তাঁর যুদ্ধনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। সৎসাহস, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতার জীবন্ত নিদর্শন ছিল তাঁর বিস্ময়কর সিদ্ধান্তসমূহ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, বনী আমাদ গোত্র প্রাণের মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তারা যাত্রা শুরু করার পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ সালমার নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন।। তাঁরা যখন তাদের উপর হামলা করলো, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি পিছনে ফেলে পলায়নে বাধ্য হলো।

দুরাত্মা য়াহূদীদের জঙ্গীগোত্র প্রতারণা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার অপচেষ্টা চালালো। যখন এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম য়াহূদীদেরকে ১০ দিনের নোটিশ দিলেন। যেন তারা এই ১০ দিনের মধ্যে মদীনা শরীফ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারা সেই নোটিশে আমল দিল না। নোটিশের সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের এলাকা অবরোধ করলেন। ফলে তারা পরাজিত হলো এবং মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনী গাতফান গোত্রের লোকেরা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে তাদের উপর আক্রমণ করলেন। ফলে তারা মুকাবিলা করা ব্যতীতই মালপত্র ফেলে পলায়নে বাধ্য হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত এবং অনতিবিলম্বে সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন, সৎসাহস, বিশেষ করে তাঁর সফল যুদ্ধনীতি মুসলিম জাতিকে সেদিন একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিল।

অদ্বিতীয় বীরত্ব এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রনায়ক এবং সেনাপতিরূপে যে গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, বীরত্ব ও সৎসাহস তন্মধ্যে অন্যতম। আর

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাঁর যে অসাধারণ বিশ্বাস ছিল তা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ভুলের কারণে পলাতক দুশমন গিরিপথ ধরে সম্মুখে এবং পিছন থেকে আবার আক্রমণ করলো, ফলে মুসলমানদের জয় পরাজয়ে পরিণত হলো। ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম শাহাদাত লাভ করলেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় আহত সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হানাদার পৌত্তলিক বাহিনীকে পিছন থেকে ধাওয়া করলেন অনেক দূর পর্যন্ত, যাতে করে তারা মুসলমানদের দুর্বল ভেবে পুনরায় আক্রমণ করার দুঃসাহস না দেখায়। এমনিভাবে হোনায়েনের যুদ্ধে ১০ হাজার মুসলমানের অগ্রভাগে ছিলেন দু'হাজার নওমুসলিম, এঁরা দুশমনের হামলার মুকাবিলা না করতে পেরে পলায়ন করলেন। কিন্তু যিনি একা দুশমনের মুকাবিলায় সুদৃঢ় হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে একথা বলেছিলেন, 'আমি সত্যনবী , আমি আবদুল মোত্তালিবের পৌত্র ।' হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধ যখন ঘোরতর হত, যোদ্ধাদের চোখে তখন রক্ত দেখা দিত। আমাদের সর্বাগ্রে থাকতেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আমরা তাঁর আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতাম।[রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, খন্ড ২, পৃষ্ঠা–৩৫১ ।]

বস্তুত তৌহিদের মহাসত্যকে যখন তিনি ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর সম্প্রদায় প্রাণের শত্রু হলো, সারা আরবের বিরুদ্ধে তিনি একা দন্ডায়মান ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল পবিত্র কুরআন, অন্তরে ছিল এক আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের কারণে তিনি শুধু আরবই নয়, রোম ও পারস্য সম্রাটকেও ইসলামের আহবান জানিয়েছেন। মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় ১৩ বছরের প্রতি দিনে নতুন নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। মক্কাবাসী তাঁকে তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিবের মাধ্যমে আরবের রাজত্ব গ্রহণের প্রলোভনও দিয়েছে আর তাঁর প্রাণ সংহারের প্রচেষ্টাও করেছে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন প্রকার লোভে বা ভয়ে তৌহিদের বাণী প্রচারে ক্ষান্ত হননি এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে আতঙ্কিত হননি। সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধে, শত্রুদের অধিক সংখ্যা দেখে বা তাদের রণপ্রতাপ লক্ষ্য করে কোনদিন এতটুকু ভীত হননি।

www.pathagar.com

কেননা, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রসূল। আল্লাহ্র প্রতি তাঁর সুদৃঢ় যে ঈমান ছিল তার দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রতিবার যুদ্ধের নয়া কৌশল গ্রহণ

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর যুদ্ধনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি প্রত্যেকবার যুদ্ধে নব নব কৌশল অবলম্বন করতেন। পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে খায়বরের য়াহূদী মক্কার কুরায়শসহ সারা আরব থেকে ১২ হাজার সৈন্য প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, শহরের ভিতরে থেকেই হানাদার দুশমনদের মুকাবিলা করতে হবে। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে তিন মাইল দীর্ঘ একটি পরিখা খনন করলেন। তিনি নিজেও এই পরিখা খননে সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় অংশগ্রহণ করলেন। পরিখাটি প্রায় দশ ফুট চওড়া এবং পাঁচ ফুট গভীর ছিল। হানাদার বাহিনী অশ্বারোহীরা সরাসরি মদীনা শরীফে এই পরিখার কারণে প্রবেশ করতে পারল না। এই পরিখা দেখে আক্রমণকারী দল বলতে লাগল, আরববাসী এমন কৌশল তো আর কোনদিন দেখেনি। [ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-৪১৬]

বস্তুত আরববাসীরা যুদ্ধের এমন কৌশল আর কোনদিন দেখেনি। ফলে তারা অবরোধ করলো সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত, যার জন্য তাদের রেশন ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার যথেষ্ট ছিল না। এদিকে আল্লাহ্র তরফ থেকে সাহায্যস্বরূপ রাত্রিকালে ঝড় উঠলো। ফলে উট এবং অশ্বের রশিগুলো ছিঁড়ে গেল, হানাদার বাহিনীর যাবতীয় ব্যবস্থা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হলো। এভাবে হামলাকারীদের বিরাট দল পলায়নে বাধ্য হলো। এটিই ছিল প্রাণের মদীনার উপর সর্বশেষ আক্রমণ। এর পর আর কোনদিন দুশমনরা মদীনা আক্রমণ করতে সাহস করেনি।

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুত্ব

মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। যত ক্ষতিই হোক, যে কোন অবস্থাতেই তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার চুক্তির সময়–তখনও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়নি, যদিও চুক্তির শর্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঠিক এমনি সময় হযরত আবূ জন্দল (রা) অত্যাচারিত উৎপীড়িত অবস্থায় কাফিরদের বন্দীখানা থেকে পালিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হন এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, অথচ তার পিতা সোহেল ইবনে আমর কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধি করার জন্য এসেছিলেন। সোহেল ইবনে আমর বললো, যদিও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়নি, কিন্তু চুক্তির এই শর্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান মক্কা থেকে এসে আশ্রয় নিতে চায় তবে তাকে মুসলমানরা আশ্রয় দিতে পারবে না বরং তাকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে হযরত আবূ জন্দল (রা)–কে ফেরত দিলেন। হযরত আবূ জন্দল (রা) তখন জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিলেন এবং ক্রন্দনরত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, "হে আবূ জনদল ! তুমি ধৈর্য ধর, আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন।"

এমনিভাবে বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন আর কাফির সংখ্যা ছিল ১০০০। মুসলমানদের আরও লোকের প্রয়োজন ছিল, ঠিক এমন সময় হযরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামন (রা) এবং হযরত আবূ হালিম (রা) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মক্কা থেকে এসেছি। পথে কাফিররা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল। পরে এই শর্তে আমাদের মুক্তি দিয়েছে যে, "আমরা যেন

www.pathagar.com

যুদ্ধে আপনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ না করি। এই অঙ্গীকারে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো।" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "অবশ্যই নয়। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার রক্ষা কর। রণাঙ্গন থেকে চলে যাও। আমরা মুসলমান, যে কোন অবস্থাতেই আমরা অঙ্গীকার রক্ষা করবো। আমাদের তো শুধু আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের প্রয়োজন।" (মুসলিম শরীফ)

ওহুদের যুদ্ধ থেকে বিদায়ের সময় আবূ জেহেল এই শর্ত দিয়েছিল যে, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আগামী বছর এমন দিনে বদরের ময়দানে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক এক বছর পর মদীনা শরীফ থেকে ১০০ মাইল দূরে বদরের ময়দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ৮ দিন পর্যন্ত বদরের ময়দানে অবস্থান করে তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ানরা মুকাবিলায় আসতে সাহস করেনি।

মূলত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর তবলীগ, দাওয়াত এবং জিহাদ এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ছিল এবং তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনেরই শিক্ষা দিয়েছেন। সত্যতা, সত্যবাদিতা , প্রতিশ্রুতি রক্ষা, উদারতা এবং মহানুভবতার শিক্ষা দিয়েছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেও তিনি দুর্গত মানবতার সেবা করেছেন। তিনি সুদীর্ঘ ১৩টি বছর মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় মজলুম অবস্থায় দীন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী থেকে নবম হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর মধ্যে তিনি যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন তা দশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় বিস্তৃত ছিল।

এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামকে বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ শিক্ষক রূপে তিনি তৈরী করে গিয়েছেন। বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বিপ্লবের জন্য এত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও যে রক্তক্ষয় হয়েছে, তা অতি সামান্য।

এই যুদ্ধের সংখ্যা ছিল ৮০। আহত-নিহতদের তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

	কয়েদী	আহত	নিহত
মুসলমান	১১ জন	১২৭ জন	৪৫৯ জন
দুশমন	৬৫৬৪ জন	০	৪৫৯ জন

এতগুলো যুদ্ধের মধ্যে মাত্র ৯১৮ জন লোক প্রাণ দিয়েছে। তন্মধ্যে ৪৫৯ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন। অতএব এই বিপ্লবকে রক্তহীন বিপ্লব বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না।

ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের নাম বিখ্যাত। জনতন্ত্রের জন্য সংঘটিত এই বিপ্লবকে সফল করা হয়েছে ৬৬ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে।

এমনিভাবে সোভিয়েত রাশিয়াতে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে তাতে এক কোটিরও অধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই যুদ্ধে নিহত লোকদের হিসাব পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এভাবে পেশ করা হয়েছেঃ

রাশিয়া	১৭ লক্ষ	
ইতালী	৪ ,,	৬০ হাজার
তুরস্ক	২ ,,	৫০ ,,
রোমান	১ ,,	
জার্মানী	১৬ ,,	
অস্ট্রিয়া	৮ ,,	
বেলজিয়াম	১ ,,	২ ,,
ফ্রান্স	১৩ ,,	৭০ ,,
বৃটেন	৭ ,,	৬ ,,
বুলগেরিয়া	১ ,,	
আমেরিকা	০	৫০ ,,
অন্যান্য	১ ,,	
মোট	৭৩ লক্ষ	৩৮ হাজার

www.pathagar.com

[হিকমতে ইনকিলাব পৃষ্ঠা ৬৫৯, হামদাম পত্রিকা, তারিখ ১৭ এপ্রিলি, ১৯১৯।]

যে উদ্দেশ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ হয়েছিল সে একই কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে অগণিত ডলার ব্যয় হওয়া ব্যতীত এক কোটির চেয়েও অধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, যার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো।

রাশিয়া	৭ লক্ষ	৫০ হাজার
আমেরিকা	৩ ,,	
বৃটেন	৫ ,,	৫০ ,,
ফ্রান্স	২ ,,	
জার্মান	২৮ ,,	৫০ ,,
ইতালী	৩ ,,	
চীন	২২ ,,	
জাপান	১৫ ,,	
মোট	১ কোটি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার	

এতদ্ব্যতীত এক কোটি মানুষ গৃহহারা হয়।

[ইনসাইক্লোপেডিয়া, খন্ড–২৩, পৃ. ৭৭৫ এবং ৭৯৩]

বিশ্বের বিভিন্ন বিপ্লব এবং যুদ্ধ–বিগ্রহের যে হিসাব আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তার আলোকে যদি আমরা হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত মহান বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, ইতিহাসের সর্বপ্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র তিনি স্থাপন করেছিলেন এবং ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব বা ইনকিলাব তিনি এনেছিলেন। এই বিপ্লবের নাম ইসলাম আর এই বিপ্লবের মহানায়ক হলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তিনি খাতেমুন নবীয়্যীন বা সর্বশেষ নবী এবং তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন বা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্য শান্তি ও মুক্তির দূত। তিনি নবী–রসূলগণের দলপতি। বিশ্বসভার স্থায়ী সভাপতি। তাঁর আদর্শ চিরন্তন, মহান, অনিন্দ্যসুন্দর, চির অনুকরণীয়, চির অনুসরণীয়।

www.pathagar.com

জংগে বদর, জংগে ওহুদ ও আহযাব

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ওহুদ যুদ্ধকে মুসলমানদের জন্য পরাজয় বলে মনে হলেও সত্যিকারে এটা জয়, না পরাজয়, তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। বদর যুদ্ধ যেমন মুসলমানদের জন্য এনে দিয়েছিল বিপুল বিজয়, ওহুদ যুদ্ধ তেমনি এনে দিয়েছিল বিরাট শিক্ষা, যে শিক্ষায় সংশোধিত হয়ে বদর ও ওহুদ যুদ্ধের সেই সব বিক্রমশালী যোদ্ধা পরবর্তীতে ধর্মের পথে, ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করে মিসর, সিরিয়া, পারস্য এমনকি স্পেন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে হলে বদর ও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ইসলাম প্রচারের প্রথমদিকে নবী করীম (সা) কুরায়শদের জোর-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার নীরবে নিভৃতে সহ্য করে যাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, একদিন তাদের মনে অনুশোচনা আসবে এবং তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আপনা-আপনি ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে। কিন্তু দিনের পর দিন তাদের অত্যাচার-অনাচার বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবং তা সহ্য সীমার বাইরে চলে যাওয়ায় তিনি প্রিয় মাতৃভূমির মায়া পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন। এতদসত্ত্বেও মদীনার মাটিতেও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হলো না। একদিকে মক্কার কুরায়শগণ, অন্যদিকে মদীনার য়াহূদী ও পৌত্তলিকরা যুক্তভাবে তাঁকে এবং তাঁর দলভুক্ত নওমুসলিমগণকে নানাভাবে অপমান ও উত্যক্ত করতে শুরু করলো এবং পদে পদে ইসলাম প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করতে লাগলো, যার জন্য তিনি তাঁর নীতি বদলাতে বাধ্য হলেন। আগে তাঁর নীতি ছিল সর্বাবস্থায় সবর ইখতিয়ার করা, আল্লাহ্‌র হুকুমে পরে তিনি যুদ্ধনীতি

www.pathagar.com

গ্রহণ করলেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে, তবে সীমালংঘন করো না, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

নবী করীম (সা) মদীনায় আগমনের পর মদীনার আনসারগণ জান-প্রাণ দিয়ে মক্কার মুহাজিরগণকে সর্বদিক থেকে সাহায্য করতে লাগলেন, এমনকি কোন কোন আনসার, যার দুই স্ত্রী ছিলো তার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাই-এর সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলেন। কিন্তু মদীনার য়াহূদীরা এবং পৌত্তিলিকরা ইসলামের এই জাগরণকে সহ্য করতে পারল না। তারা তলে তলে মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইসলাম বিরোধী এক শক্তি গঠনে মত্ত হয়ে উঠলো এবং মদীনার খাজরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই নামক জনৈক প্রভাবশালী লোকের নেতৃত্বে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠলো। মক্কার কুরায়শরা এই ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো এবং তারা গোপনে গোপনে পত্র দ্বারা আবদুল্লাহ্-বিন-উবাইকে উস্কানি দিতে শুরু করলো। এ অবস্থায় কুরায়শদের উপর নজর রাখার জন্য এবং তাদের সমর-সজ্জার তথ্য সংগ্রহের জন্য নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ-বিন-জাহশ নামক এক মুহাজিরের নেতৃত্বে ৮ জনের একটি গোয়েন্দা দল মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। এই দলটি মক্কার নিকটবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে উপনীত হলে হঠাৎ করেই কুরায়শদের ৪জনের একটি ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে গেলো এবং তাতে ঐ ৪ জনের ১ জন নিহত হলো, ২ জন বন্দী হলো এবং বাকী ১ জন কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। এই ঘটনার পর কুরায়শরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও এক হাজার উট নিয়ে কুরায়শ দলপতি আবূ সুফিয়ান সিরিয়া যাত্রা করল।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রিয়নবী (সা)-র চাচা হযরত আব্বাস (রা) গোপনে মদীনায় লোক পাঠিয়ে এই পুরা খবরটাই তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে জানিয়ে দিলেন। হযরত আব্বাস (রা) প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেনি বটে কিন্তু পৌত্তলিকতার আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত করে কত গোপন ও জরুরী খবর যে

www.pathagar.com

তাঁর প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্রকে পাঠিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচারে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর শুধু তাই নয়, হযরত মুহম্মদ (সা)–এর চরম বিপদে তিনি সর্বদা তাঁর ঢাল– স্বরূপ কাজ করেছেন এবং তাঁকে রক্ষা করেছেন, যার জন্য নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মানা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁকে (আব্বাসকে) বেহেশতে দাখিল করার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে থাকবো।"

আবূ সুফিয়ান যে বদরের প্রান্তর হয়েই সিরিয়া যাচ্ছে এবং অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করার পর আবার বদর প্রান্তর হয়েই মক্কা ফিরে যাবে, হযরত আব্বাস (রা) এসব তথ্য নবী করীম (সা)–কে জানিয়েছিলেন। খবর পাওয়ার পর হযরত (সা) মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণকে একত্র করে সকলের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বদর প্রান্তরেই আবূ সুফিয়ানকে ঠেকাতে হবে, যাতে সে যুদ্ধের এই বিরাট সম্ভার নিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে না পারে, কেননা যে মারণাস্ত্র যুদ্ধের সময় তাদেরই বুকে এসে বিদ্ধ হবে, সে অস্ত্র তাদের দ্বারপ্রান্ত দিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে দেয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

তিনি আর কালবিলম্ব না করে, সৈন্য–সামন্ত সংগ্রহ করে, জীবনের প্রথম সেনাপতিবেশে বদর প্রান্তরে রওনা হয়ে গেলেন। প্রথমেই তিনি এক বিরাট রণ–নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন যে, রাজধানীকে অরক্ষিত না রেখে, যাঁরা মদীনায় থাকতে চাইলেন, তাঁদেরকে মদীনায় রেখে, শুধু যাঁরা স্বেচ্ছায় নবী করীম (সা)–এর সঙ্গে বদর প্রান্তরে যেতে রাজী হলেন, তাঁদেরকে নিয়েই তিনি ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম হলেও তাঁরা ছিলেন মর্দে মুজাহিদ, যাঁদের অন্তর ছিল ইসলামের তেজোদীপ্ত। এ ছাড়া আরো একটি রণ–কৌশলের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন যে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন, এই খবরটা সর্বসাধারণের কাছে গোপন রাখার জন্য তিনি উটের গলার ঘন্টাগুলো খুলে ফেলেছিলেন।

সেনাপতিবেশে (মদীনা শরীফ প্রায় ৭০ মাইল দূরে), বদর প্রান্তরে তিনি এসে পৌছলেন তৃতীয় দিনে এবং একজন বিচক্ষণ সেনাপতির মত পাহাড়কে

www.pathagar.com

পিছনে দেওয়াল স্বরূপ রেখে এবং পানির উৎস একটি ঝরনা-ধারাকে সম্মুখে রেখে, পাহাড়ের প্রান্তরে ঘাঁটি গাড়লেন। কলাকৌশল তিনি ঠিকই করলেন কিন্তু তাঁর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, যার মধ্যে অশ্বারোহী ছিল মাত্র ২ জন এবং মালামাল ও সৈন্য বহনকারী উটের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০টি। আবূ সুফিয়ানের অস্ত্রশস্ত্রকে ঠেকাবার জন্যই তিনি বদর প্রান্তরে এসেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, তেমন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে না, কিন্তু ঘটনাচক্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেল। আবূ সুফিয়ান সিরিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করে মক্কা ফেরার পথে বদর প্রান্তরে এসে উপলব্ধি করতে পারল-হযরত (সা)-এর সৈন্য সেখানে উপস্থিত। সুতরাং তাড়াতাড়ি মক্কায় গুপ্তচর পাঠিয়ে দিল, যেন কালবিলম্ব না করে পুরো সৈন্যবাহিনীকে বদরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। খবর পাওয়া মাত্র এক হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে কুরায়শ নেতা আবূ জেহেলের নেতৃত্বে পাঠিয়ে দেয়া হলো, যার মধ্যে শুধু অশ্বারোহীই ছিল ১০০ জন, উষ্ট্রারোহী ছিল ৭০০ এবং অবশিষ্ট ছিল পদাতিক। ধূর্ত ছিল আবূ সুফিয়ান। তার অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রিয়নবী (সা)-র লোকদের মুকাবিলা না করে অন্য পথ ধরে মক্কায় ফিরে গেল আর হযরত (সা) তাঁর ঐ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে আবূ জেহেলের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করতে বাধ্য হলেন। সংখ্যায় নগণ্য হলেও হযরত (সা)-এর সৈন্যদের মনোবল ছিল অপরিসীম। তাঁরা ইসলামের বলে বলীয়ান হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে, 'আল্লাহু আকবার' বলে তকবীর দিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আল্লাহ্র সহায়তায় কুরায়শদের বিশাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে সারা বিশ্বে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলেন, যা বিশ্বের মুসলমানগণ শ্রদ্ধাভরে চিরকাল স্মরণ করবে।

বদর যুদ্ধ

দিনটি ছিল শুক্রবার। ১৭ রমযান। দ্বিতীয় হিজরী। হযরত বিলাল (রা)-এর কণ্ঠে সুললিত সুরে ফজরের আযান ধ্বনিত হলো। হযরত (সা)-এর পিছনে মুজাহিদগণ জামাতের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে নবী

www.pathagar.com

করীম (সা) বিগলিত চিত্তে, সজল নয়নে আল্লাহ্‌র দরবারে যুদ্ধে কামিয়াবী হওয়ার জন্য মুনাজাত করলেন। তারপর সম্মুখ সমরে উপস্থিত হলেন। তখনকার রীতি অনুসারে এ পক্ষের ৩জন অপর পক্ষের ৩ জনের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। শত্রু পক্ষের ওৎবা, তার ভাই শায়বা এবং পুত্র অলিদ ময়দানে এসে আস্ফালন শুরু করল, 'কার এমন বুকের পাটা আছে, আয় দেখি সামনে, যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেই।' তৎক্ষণাৎ হুযূর (সা)-এর আদেশে বীরবর হযরত হামযা (রা), হযরত উবায়দা (রা) ও বীরকেশরী হযরত আলী (রা) বিদ্যুৎ গতিতে ময়দানে গিয়ে তাদের কথার প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তবে আয়রে পামর'- সঙ্গে সঙ্গে ওৎবার সঙ্গে হযরত হামযা (রা), শায়বার সঙ্গে হযরত ওবায়দা (রা)এবং অলিদের সঙ্গে হযরত আলীর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যে বীরকেশরী আলী (রা)-র এক আঘাতেই অলিদের শির ভূলুন্ঠিত হয়ে গেলো। এই দৃশ্য অবলোকন করে ওৎবা প্রচন্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বিপুল বিক্রমে হযরত হামযা (রা)-কে আক্রমণ করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হযরত হামযা (রা) তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ হযরত উবায়দা (রা)ও শায়বাকে পরাজিত করে হত্যা করলেন বটে কিন্তু শায়বার তরবারির আঘাতে হযরত উবায়দা (রা) গুরুতর রূপে আহত হলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি শাহাদাতের মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে গেলেন।

সূচনাতেই তিনজন কুরায়শ সৈন্যের এহেন শোচনীয় পরিণতি দেখে বাকী কুরায়শ সৈন্যদের ধমনীতে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং তারা সকলে মিলে এক সঙ্গে ক্ষিপ্তগতিতে মুসলিম সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর সমস্ত রণক্ষেত্রে তখন শুধু শোনা যেতে লাগলো অস্ত্রের ঝনঝনানি। কিন্তু আক্রমণ যত প্রবলই হোক, ইসলামের বলে বলীয়ান হয়ে মুসলিম সৈন্যদের মনোবল এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাঁরা কোনরকম ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে, বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে কাফিরদেরকে কচুকাটা করতে লাগলো এবং মুয়াজ ও আবদুল্লাহ্ নামে দুইজন তরুণ যোদ্ধা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে

www.pathagar.com

ক্ষিপ্রগতিতে আবূ জেহেলের ব্যূহের ভিতর প্রবেশ করে আঘাতের পর আঘাত হেনে আবূ জেহেলকে যখন ধরাশায়ী করে ফেললো, তখন সমস্ত কুরায়শ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং যে যেদিকে পারল শৃগালের মত পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এই যুদ্ধে কুরায়শদের নিহত সংখ্যা ছিল ৭০ জন, আর বন্দীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন, অপর দিকে মুসলমানদের নিহত সংখ্যা মাত্র ১৪ জন।

ওহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনে এবং কুরায়শ নেতা আবূ জেহেল ও অন্য সৈন্যদের মৃত্যু সংবাদে মক্কার অন্যতম কুরায়শ নেতা আবূ লাহাব, যে লোক নিজে তার স্ত্রীকে নিয়ে আজীবন প্রিয়নবী (সা)-র বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছে, সে যে শয্যাগ্রহণ করল, আর সে শয্যা থেকে উঠতে পারল না। সপ্তাহখানেক পর ধরাধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। বলা বাহুল্য, তার এমন ফুস্কুড়ি রোগ হয়েছিলো যে, সে রোগের দুর্গন্ধে এবং আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে, তার নিকট-আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত তার কাছে ভিড়তে পারেনি এবং মৃত্যুর পর লাশের অনতিদূরে একটি গর্ত খুঁড়ে, লাকড়ির সাহায্যে মৃত দেহকে ঠেলে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল, কেননা ছোঁয়াচে রোগ বলে কেউ তাকে গোসল করাতে সাহস করেনি। দুনিয়াতেই তার এই আযাব হয়েছে, আর আখিরাতের আযাবের কথা তো কুরআন মজীদে সূরা লাহাবে স্পষ্টই ঘোষিত রয়েছে।

আবূ জেহেল ও আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর কুরায়শদের পরিচালনার ভার পড়লো আবূ সুফিয়ানের উপর। কুরায়শদের হৃদয়ে হিংসার আগুন প্রজ্বলিত করে তুলতে লাগলো এবং আবূ সুফিয়ান সর্ব-সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করে বসল যে, 'যতদিন পর্যন্ত এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত কোন সুগন্ধও ব্যবহার করবো না এবং স্ত্রীকেও স্পর্শ করবো না।' আর তার স্ত্রী হেন্দা পিতা হত্যা, পিতৃব্য হত্যা, ভ্রাতৃ হত্যার (ওৎবা, শায়বা ও অলিদ) প্রতিশোধ নেয়ার

www.pathagar.com

জন্য পাগলিনী হয়ে রণ-রঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে দিবানিশি কুরায়শদের নানাভাবে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো এবং পিতৃ-হন্তা হামযার রক্তপানের জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলো। আর তার প্রতিজ্ঞা কামিয়াবী করার জন্য নিজে নর্তকী সেজে নেচে নেচে নৃত্যের তালে তালে একজন হাবশী গোলামকে তীর ও বল্লম ছোঁড়ায় এমন পারদর্শী বানালো যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন অবস্থায় সে যাতে হামযাকে তীর বা বল্লম দিয়ে ধরাশায়ী করতে পারে। বাস্তবেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই হাবশী গোলামই বল্লম ছুঁড়ে হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করেছিল।

আবূ সুফিয়ান ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে বিরাট অস্ত্রসম্ভার সিরিয়া থেকে খরিদ করেছিল এবং তা গুপ্ত পথ ধরে নিরাপদে মক্কায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছিল। এবার সেই বিপুল অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অনতিবিলম্বে ৩ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করে ফেলল, যার মধ্যে ছিল ২০০ অশ্বারোহী, ৭০০ বর্মধারী এবং অবশিষ্ট উষ্টারোহী ও পদাতিক। প্রিয়নবী (সা)-র স্নেহময়ী চাচা হযরত আব্বাস (রা) এবারও গুপ্তচরের মারফত আবূ সুফিয়ানের সমস্ত সৈন্যের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সা) তাঁর বিরুদ্ধে এই বিশাল প্রস্তুতির খবর শুনেও ঘাবড়িয়ে গেলেন না, মনে মনে বললেন ঃ 'এক আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' তিনি অবশ্য চুপ করে বসে থাকলেন না। আবূ সুফিয়ানকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজেও যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

তৃতীয় হিজরী, শওয়াল মাসের ১৪ তারিখ, রোজ শুক্রবার, বাদ জুম'আ। তিনি মুজাহিদগণকে পুরা পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়ে সবাইকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানালেন। এবারে অবশ্য তিনি নিজে নগরে থেকেই যুদ্ধ করার (Defensive battle) পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু কিছু সংখ্যক যুবক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে মন্তব্য করল যে, এভাবে নগরে থেকে যুদ্ধ করলে তাতে আমাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ পাবে। সুতরাং প্রিয়নবী (সা) তাঁদের কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নগরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তই ঘোষণা করলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং অনতিবিলম্বে রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সেনাপতির বেশে বাইরে আসলেন। বুকে বর্ম, হস্তে ঢাল, কটিবন্ধে বিখ্যাত 'জুলফিকার' তরবারি আর শিরে বাঁধা আমামা। সত্যি তিনি আজ যুদ্ধনায়ক, বিচক্ষণ সেনাপতি।

এই যুদ্ধে তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার-যার মধ্যে অশ্বারোহী ২ জন, তীরন্দাজ ৪০ জন, বর্মধারী ৭০ জন, বাকী সব পদাতিক। এক হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেও পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্-বিন-উবাইর নেতৃত্বে যে ৩০০ সৈন্য যোগদান করেছিলো, তারা সটকে পড়ল, কেননা তাদের মনে দুরভিসন্ধি ছিলো। সুতরাং মাত্র ৭০০ সৈন্য নিয়েই ৩,০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ওহুদ প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হতে হলো। এই যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য লোকের ইচ্ছা এত প্রবল ছিলো যে, রাফে নামক এক বালক বয়স কম থাকায় এবং উচ্চতা কম হওয়ায়, দেহের মাপ নেবার সময় সে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে যথাসম্ভব উঁচু করে ধরার চেষ্টা করেছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে পাশের লোকেরা বলল, 'রাফে খুব ভাল তীরন্দাজ, কাজেই তাকে নেয়া যেতে পারে।' রাফেকে ভর্তি করার পর সামারা নামে অপর এক বালক ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে লাগলো, 'রাফেকে যদি নেয়া হয়, তবে আমাকে নেয়া হবে না কেন? আমি কুস্তি লড়ে অনায়াসে রাফেকে হারিয়ে দিতে পারি।' এবার প্রিয়নবী (সা) একটু হেসে হযরত সামারাকে বললেন, 'তাই নাকি? বেশ তো কুস্তি লড় দেখি।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সামারা তাল ঠুকে ঠুকে রাফের সঙ্গে কুস্তি করতে মত্ত হলো এবং রাফে ইচ্ছা করেই পরাজয় স্বীকার করে সামারাকেও ভর্তি করার সুযোগ করে দিলো। হযরত (সা) সন্তুষ্ট চিত্তেই তাঁকে ভর্তি করে নিলেন।

১৫ শওয়াল শনিবার, তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মদীনা থেকে ৩ মাইল দূরে ওহুদ পর্বতের পাদদেশে এসে হাযির হলেন এবং পিছনে পাহাড় রেখে সুবিধাজনক স্থানে নিজেদের ঘাঁটি গাড়লেন, সম্মুখে রইল উন্মুক্ত ময়দান।

www.pathagar.com

ফজরের ওয়াক্ত হলো, হযরত বিল্লাল (রা) আযান দিলেন, সমস্ত সৈন্য প্রিয়নবী (সা)–এর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন এবং তারপর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। আবূ সুফিয়ানের সৈন্যদল পূর্বেই সেখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল। সুতরাং উভয়পক্ষে রণ–দামামা বেজে উঠলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে কুরায়শদের মধ্য থেকে বীর তালহা ময়দানে এসে ব্যঙ্গ স্বরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহবান জানাল। সঙ্গে সঙ্গে বীরকেশরী আলী (রা) তীরবেগে ছুটে গিয়ে তরবারির এক আঘাতেই তালহার দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে উসমান ক্ষিপ্ত হয়ে ময়দানে ছুটে আসল কিন্তু বীরবর হামযা (রা) ছুটে গিয়ে নিমেষে তাকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে এই দুইজন বীরের শোচনীয় পরিণতি দেখে, তারা আর আলাদা আলাদাভাবে যুদ্ধ না করে, সমবেতভাবে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল। মুসলিম সৈন্যগণও বীর বিক্রমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হামযা, আবূ দেজাল, জুবায়ের প্রমুখ বিখ্যাত বীর আল্লাহ্র বলে বলীয়ান হয়ে অপরিসীম শৌর্যবীর্য ও রণ–চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে সেনাদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, বহু কুরায়শ সেনা নিহত হলো, আর বাকিরা দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে যত্রতত্র পালাতে শুরু করল এবং এ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠলো। কিন্তু ঠিক এই সময় কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন, যার জন্য বিজয় মুকুট হাতে পেয়েও অল্পের জন্য তা হাতছাড়া হয়ে গেল।

মুসলমানদের ঘাঁটির বাম পার্শ্বে একটি সুড়ঙ্গ ছিল, যে পথে পিছন দিক হতে শত্রু সেনাদের আক্রমণের ভয় ছিল। হযরত (সা) দূরদর্শী সেনাপতির মতই সুড়ঙ্গটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং পিছন দিক থেকে কোন আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার জন্য তিনি ৫০ জনের একটি সুদক্ষ তীরন্দাজ বাহিনীকে ঐ সুড়ঙ্গের পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের উপর কড়া হুকুম দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

যে, কোন অবস্থাতেই তারা যেন ঐ স্থান পরিত্যাগ না করে। এমনকি যুদ্ধে জয়লাভ হলেও এবং অন্যান্য সৈন্য পরাজিত সৈন্যদের পরিত্যক্ত রণ-সম্ভার লুট করতে থাকলেও, তারা যেন ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও ধাবিত না হয়। ঐ সুড়ঙ্গ রক্ষীদল যখন দেখল যে, শত্রু সেনারা প্রাণের ভয়ে যত্রতত্র পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা বদরের যুদ্ধের গনিমতের মালের কথা স্মরণ করে, লোভের বশবর্তী হয়ে নবী করীম (সা)-এর আদেশ ভুলে গিয়ে, সুড়ঙ্গ স্থান পরিত্যাগ করে (মাত্র কয়েকজন ছাড়া) লুটের মালের পিছনে ধাবিত হলেন, আর এই ভুলটির জন্যই বিপর্যয়ের মুকাবিলা করতে হলো মুসলমানদের।

কুরায়শ বীর খালিদের প্রথম থেকেই এই সুড়ঙ্গ পথটির দিকে নজর ছিল এবং ইতিপূর্বে সে ঐ পথে আক্রমণের প্রচেষ্টাও করেছিল কিন্তু সুদক্ষ তীরন্দাজ বাহিনীর তীরের আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। এবার সে যখন দূর থেকে লক্ষ্য করলো যে, সুড়ঙ্গ পথ এখন প্রায় অরক্ষিত, তখন আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার অশ্বারোহী দলকে ঘুরিয়ে এই পথে নিয়ে আসল এবং অতর্কিত আক্রমণ করে জন-কতক মুসলিম সৈন্যকে অনায়াসে পরাভূত করে, পশ্চাৎদিক হতে মুসলিম সৈন্যদের উপর এমন প্রচন্ড আক্রমণ চালাল যে, সে আক্রমণে মুসলিম সৈন্যগণ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। অনেকেই জানপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেন, বাকিরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছাবার চেষ্টা করলেন। এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) চিৎকার করে সবাইকে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার আহবান জানালেন। কিন্তু তাঁর এই উদাত্ত আহবান কারো কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করলো, কারো করলো না। তবে যারাই পারলেন, দৌড়িয়ে গিয়ে প্রিয়নবী (সা)-র চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হলেন এবং নিজেদের জীবনের দিকে মোটেই খেয়াল না করে, তাঁদের প্রাণপ্রিয় নবী (সা)-কে বাঁচাবার জন্য নিজেরাই তাঁর দেহের ঢালস্বরূপ চতুর্দিকে বেষ্টনির সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কুরায়শদের সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন একমাত্র নবীজী (সা)-র দিকেই নিবদ্ধ হলো। কেননা, এই একটিমাত্র লোককে খতম করতে পারলেই চিরকালের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। তারা দূর থেকেই হযরত

www.pathagar.com

(সা)–এর উপর বৃষ্টির মত তীর, বর্শা ও লোষ্ট্র বর্ষণ করতে শুরু করলো। আঘাতে আঘাতে তিনি যখন জর্জরিত হয়ে উঠলেন, তাঁর সম্মুখের ৪টি দাঁত ভেঙে গেলো এবং নিম্নোষ্ঠ কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো, তখন এই দুর্বল মুহূর্তে শয়তান ইবনে কামিয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে প্রিয়নবী (সা)–র শির মুবারক লক্ষ্য করে প্রচন্ড বেগে তরবারির আঘাত করলো। তালহা–বিন–ওবায়দুল্লাহ নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে প্রিয়নবী (সা)–কে বাঁচাবার জন্য দুরাত্মা ইবনে কামিয়ার সে আঘাত আপন হস্ত দ্বারা রোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গুলীগুলো কেটে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু এত করেও প্রিয়নবী (সা)–কে তিনি পুরোপুরি রক্ষা করতে পারলেন না। হযরত (সা)–এর শিরস্ত্রাণে সে আঘাত কিছুটা লেগে গেলো। ফলে শিরস্ত্রাণ কেটে গিয়ে তৎসংলগ্ন দুটি লৌহ–কড়া প্রিয়নবী (সা)–র কপালে গভীরভাবে বিদ্ধ হয়ে গেলো এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। নবী করীম (সা)–র পতন হওয়া দেখে ইবনে কামিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে 'মুহম্মদ নিহত হয়েছে, মুহম্মদ নিহত হয়েছে' এই ধ্বনি দিতে দিতে কুরায়শ সৈন্যদের সম্মুখে নাচতে শুরু করল। তাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো। আর মুহম্মদ (সা) নিহত হয়েছে–এই ধ্বনিই আল্লাহ্‌র ইশারায় হযরত (সা) ও সমস্ত মুসলিম সৈন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য 'রহমত' হিসাবে কাজ করল অর্থাৎ কুরায়শরা যখন জানতে পারলো যে, হযরত (সা) নিহত হয়েছেন, তখন তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ একেবারে বন্ধ করে দিলো এবং বিজয়োল্লাসে মত্ত হয়ে উঠল। পিশাচিনী (হেন্দা) সাইদুশ শোহাদা হযরত হামযা (রা)–র লাশ খুঁজে বের করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো এবং তাঁর কলিজা বের করে কাঁচা কলিজাই চিবিয়ে খেতে শুরু করলো এবং তাঁর দেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কেটে তা দিয়ে মালা বানিয়ে সেই মালা গলায় পরে সে সকলের সামনে নাচতে শুরু করল। তবে প্রিয়নবী (সা)–র লাশ মুবারক কোন জায়গায় না পাওয়ায় আবূ সুফিয়ানের মনে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হলো এবং সে পাহাড়ের প্রান্তদেশে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলো 'মুহম্মদ আছ ? আবূ বকর আছ ? উমর আছ ?' মুসলমানগণ তার এই ডাক শুনতে পেলেন বটে কিন্তু কোন শব্দ করলেন না। তখন আবূ সুফিয়ান বললো,

www.pathagar.com

'যাক সবগুলোই নিপাত হয়েছে।' এই কথা শুনে হযরত উমর (রা) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি উত্তরে বলে উঠলেন, 'ওরে হতভাগা, তোর কথা সত্য নয়, তোদেরকে শাস্তি দেবার জন্য আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।' কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আবূ সুফিয়ান বললো, 'আচ্ছা থাকো, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।' উত্তরে হযরত উমর (রা) বললেন, 'বেশ তাই হবে, আমরা তার জন্য প্রস্তুত।'

কুরায়শ সৈন্যগণ বিজয়োল্লাস শেষ করে মক্কার দিকে ধাবিত হলো। কিছুক্ষণ বেহুঁশ থাকার পর প্রিয়নবী (সা)-র জ্ঞান ফিরে এলো। সকলে মিলে হযরতকে ঠিকমত শুইয়ে দিয়ে তাঁর কপাল থেকে প্রোথিত কড়াদ্বয় টেনে বের করলেন। ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। সেই রক্তে প্রিয়নবী (সা)-র নূরানী চেহারা মুবারক রঙীন হয়ে উঠলো। হযরত আলী (রা) দ্রুতবেগে ঝরনা থেকে নিজের ঢাল ভরে পানি আনলেন কিন্তু সে পানি প্রিয়নবী (সা) পান করতে পারলেন না, তদ্দ্বারা তাঁর মুখখানি ধুইয়ে দেয়া হলো। এই অবস্থায় তিনি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, ''হে আমার রব, আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা কর, তারা অজ্ঞ, তারা ভ্রান্ত।' হায়রে ক্ষমা ! নিজের জীবন যারা বধ করতে এসেছিল, তাদের জন্যও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ! এরূপ ক্ষমার দৃষ্টান্ত কি অন্য কেউ কোন দিন স্থাপন করতে পেরেছেন ? তিনি যে 'রহমাতুল্লিল্ 'আলামীন'-সমস্ত বিশ্বজগতের রহমত।

ওহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য জয়, না পরাজয়

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ওহুদ যুদ্ধকে মুসলমানদের জন্য পরাজয় মনে হলেও সত্যিকারে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ওহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য একটা বিরাট শিক্ষা। এই যুদ্ধ থেকে মুসলিম বীরগণ এমন শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন যে, পরবর্তীতে তাঁরা আর এ ধরনের ভুল করেননি, যার ফলে তাঁরা মিসর, সিরিয়া, পারস্য, এমনকি স্পেন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা যদি মুসলমানদের জন্য সত্যিকারেরই পরাজয় হতো, তাহলে পরবর্তীতে মুসলমানগণ আর শির উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হতেন না। ইসলাম

www.pathagar.com

প্রচারও বন্ধ হয়ে যেতো, সারা বিশ্বে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হতো না। এই যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য শহীদ হয়েছিলেন বটে (কারো মতে ৭০ জন, কারো মতে ৫৫ জন) কিন্তু তাছাড়া আর কোন বিশেষ ক্ষতি কি হয়েছিলো ? তেমন কিছুই হয়নি। তা যদি হতো তাহলে এই যুদ্ধই হত মুসলমানদের জন্য শেষ যুদ্ধ। কিন্তু এটা কি শেষ যুদ্ধ ছিল ? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পরে আরো অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং ওহুদের যুদ্ধ ছিল তার জন্য একটা প্রস্তুতি, সংশোধন, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি।

ওহুদ যুদ্ধ আমাদেরকে কি কি শিক্ষা দিয়েছে

১. লোভের বশবর্তী হয়ে নেতার আদেশ লংঘন করলে তা জাতির জন্য ডেকে আনে বিরাট বিপর্যয়।

২. জয়-পরাজয় মানুষের জীবনে, জাতির জীবনে আছেই। সব কাজেই কৃতকার্য হওয়া যাবে এবং সব যুদ্ধেই বিজয়ী হওয়া যাবে-এরূপ আশা করা ঠিক নয়। চরম বিপদে দিশাহারা না হয়ে ধৈর্য ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩. যুদ্ধে পরাজয় হলেও, শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তাই বড় নয়, বরং প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েও নেতার জীবন রক্ষা করাই বীরত্বের কাজ যেমন তাল্‌হা-বিন-ওবায়দুল্লাহ্‌ নবীজীর জন্য করেছিলেন।

উপসংহার

বদর ও ওহুদ যুদ্ধের গাযীগণই পরবর্তীতে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং মিসর, সিরিয়া, পারস্য ও স্পেন এঁদের হস্তেই বিজিত হয়েছিল। ওহুদ যুদ্ধে তাঁদের এসব ভুলভ্রান্তি হয়েছিল বলেই ওহুদ ময়দানে ভুলভ্রান্তির সংশোধন করে, আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ দ্বারা নিজেদেরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে গড়ে তুলেছিলেন, যার জন্য পরবর্তীতে তাদের দ্বারা এতোগুলো মহৎ ও বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিলো।

www.pathagar.com

গাযওয়ায়ে আহ্‌যাব বা জংগে খন্দক

ডাঃ ক্যাপ্টেন আবদুল বাছেত

গাযওয়ায়ে আহ্‌যাব বা জঙ্গে খন্দক সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে।

ইসলামের ইতিহাসে এটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। আমরা জানি, তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয় জঙ্গে ওহুদ। এই যুদ্ধে মক্কার কুরায়শগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে চতুর্দিক থেকে প্রস্তর খন্ড, তীর, বর্শা বর্ষণ করে। ফলে তাঁর জিস্‌ম মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়। তাঁর পবিত্র ঠোঁটের নিম্নাংশ ফেটে লহু মুবারক ঝরতে থাকে। দান্দান মুবারক শহীদ হয়।

দুরাত্মা ইব্‌নে কামিয়া মুসলিম ব্যূহ ভেদ করে তীরবেগে ছুটে এসে তাঁর পবিত্র মস্তক লক্ষ্য করে প্রচন্ড বেগে তরবারির আঘাত করে। হযরত তাল্‌হা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু) নিজের জীবন বিপন্ন করে নিজ হস্ত দ্বারা সে আঘাত প্রতিরোধ করলেন। ফলে তাঁর আঙ্গুল কেটে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিরস্ত্রাণে আঘাত লেগে দু'টি লৌহকড়া তাঁর পবিত্র কপালে গভীরভাবে বিদ্ধ হয়ে গেলো, যার জন্য তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আর ইব্‌নে কামিয়া আনন্দাতিশয্যে 'মুহম্মদ নিহত হয়েছে' এই উল্লাস-ধ্বনি প্রচার করতে করতে কুরায়শ দলে ফিরে গেলো। ইব্‌নে কামিয়ার এই মিথ্যা প্রচারই ঢাল হয়ে হযরতের জীবনকে রক্ষা করলো। কুরায়শরা যখন শুনতে পেলো যে, হযরত মুহম্মদ (সা) আর ইহজগতে নেই, তখন আর যুদ্ধের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করলো না। সবাই ধন-সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্রের লোভে ছুটাছুটি শুরু করলো এবং মৃত লাশের খোঁজ করতে লাগলো। হযরত হামযা (রা)-র পবিত্র লাশ পাওয়া মাত্র আবূ

www.pathagar.com

সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা উন্মাদিনীর মতো তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে গলার মালা বানিয়ে তা গলায় পরে উল্লাসে নৃত্য করতে শুরু করলো। শুধু তাই নয়, হযরত হামযা রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহুর পেট কেটে কলিজা বের করে কাঁচা কলিজা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে পিতৃ-হত্যা ও ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। কিন্তু কোন জায়গায় হযরত মুহম্মদ (সা)-এর লাশ মুবারক না পেয়ে সন্দিহান হয়ে পড়লো। অবশেষে আবু সুফিয়ান পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'মুহাম্মদ আছো? আবু বকর আছো? উমর আছো? মুসলমানগণ পর্বতের উপর থেকে সে ডাক শুনতে পেলেন বটে কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। তখন আবু সুফিয়ান আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলো, 'সবগুলোই নিপাত হয়েছে।' হযরত উমর রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহু এই কথা শুনে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি জবাব দিলেন, 'ওরে হতভাগা, তোদেরকে শাস্তি দেবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এঁদের সবাইকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।' তখন আবু সুফিয়ান বললো, 'আচ্ছা থাকো, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।' হযরত উমর রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহু উত্তর দিলেন, 'বেশ, তাই হবে। আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি।'

ছাতুর যুদ্ধ (দ্বিতীয় বদর) ঃ ওহুদ যুদ্ধের প্রতিজ্ঞানুসারে উভয় পক্ষ দ্বিতীয়বার বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলো। আবু সুফিয়ান তার আস্ফালনের কথা স্মরণ করে শুধু এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেই ক্ষান্ত হলো না, দূর-দূরান্তরের কবিলাগুলিকে মিত্র বানিয়ে তাদের তরফ থেকে বন্ধুত্ব-রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলো। বিপুল বাহিনীর রসদ-সম্ভারেরও সুব্যবস্থা হয়ে গেলো। কিন্তু সে বছর খরার কারণে খাদ্যের অপ্রতুলতা দেখা দিলো, যার জন্য এই বিরাট বাহিনীর খাদ্য সংগ্রহ করা আবু সুফিয়ানের পক্ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো এবং তিনি চিন্তা করতে থাকলেন কিভাবে এই দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ পরিহার করা যায়। কিন্তু সময়মত বদর-প্রান্তরে উপস্থিত না হলে মুসলমানগণ তাদেরকে কাপুরুষ মনে করবে-এই অপমানও আবু

www.pathagar.com

সুফিয়ান সহ্য করতে রাযি নয়। এই পরিস্থিতিতে ন'ঈম বিন্ মাসূউদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে, যিনি মদীনা থেকে উমরাহ করার নিয়তে মক্কা এসেছিলেন। আবূ সুফিয়ান তাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে-'যদিও আমরা বিরাট বাহিনী গঠন করেছি তবু খাদ্য-সম্ভারের অভাবে আমরা এবার বদর প্রান্তরে যেতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাই বলে আমাদের ওয়াদার বরখেলাফ হোক, এটাও আমরা চাই না। এমতাবস্থায় তুমি যদি মুহম্মদকে (সা) কোন বাহানা করে বদরের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পার, তাহলে আমি তোমাকে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার দেবো।' ন'ঈম বিন মাসউদ তার এই কথায় রাযি হয়ে গেলেন এবং উমরাহ শেষ করে মদীনায় যেয়ে বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আড়ালে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, আবূ সুফিয়ান বিরাট বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরে এগিয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন কবিলার লোকেরাও। সুতরাং তোমাদের জন্য বদর প্রান্তরে যেয়ে অহেতুক বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং মদীনায় থেকে দুশমনদের মুকাবিলা করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে।

এ প্রস্তাব যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলো, তিনি তা মানতে রাযি হলেন না, বরং ফরমান জারী করে দিলেন যে, সবাই প্রস্তুত হয়ে বদরের দিকে চলো। তবে তিনি সৈন্যদেরকে বাড়তি একটি সুবিধা দিলেন, তা হচ্ছে-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সৈন্যগণ কিছু কিছু বাণিজ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিতে পারবে, যা যুদ্ধের আগে বা পরে বদর-প্রান্তরে বিক্রি করে সৈন্যগণ লাভবান হতে পারবে। এই প্লান অনুসারে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পনর শতের এক মুজাহিদ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বদর-প্রান্তরে উপস্থিত হলেন এবং ৮ দিন পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করলেন কিন্তু কুরায়শদের কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না। পরে বাধ্য হয়ে তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন। বাণিজ্য-সামগ্রী সঙ্গে আনার নির্দেশ দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দারুণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন, কারণ আশেপাশের এলাকাগুলোতে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করায় বাণিজ্য সামগ্রীতে বহু গুণ লাভ হলো, যার জন্য মুসলমান সৈন্যদের মনোবল অনেক বেড়ে গেল।

www.pathagar.com

এর পর প্রায় একটি বছর নির্বিঘ্নেই কেটে গেলো। কিন্তু আবূ সুফিয়ান চুপ করে বসে থাকলো না। কুরায়শগণ ভিতরে ভিতরে দারুণ দূরভিসন্ধি পাকাতে থাকলো এবং বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তাদের এই দূরভিসন্ধির কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জানতে বাকী রইল না। তিনিও তিন হাজার মুসলিম বীরের এক স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করে ফেললেন। আবূ সুফিয়ান শুধু নিজের সেনাদলই বৃদ্ধি করলো না, মরুভূমিতে যেসব স্বাধীন বেদুঈন গোত্র বাস করতো, তাদেরকেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে ফেললো। বিভিন্ন কবিলার লোকদেরকেও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ করে নিলো। এমনকি মদীনার য়াহূদীদেরকেও নিজেদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করলো। ইতোপূর্বে কুরায়যা গোত্রের য়াহূদীদের সঙ্গে একটি সন্ধি হয়েছিলো। বনি-নাযিরের চক্রান্তে তারাও সে সন্ধি ভঙ্গ করে গোপনে গোপনে কুরায়শদের সঙ্গে যোগ দিলো। এইভাবে কুরায়শ, বেদুঈন, য়াহূদী, বিভিন্ন কবিলা ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রের এক বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ বাহিনী মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো।

যথাসময়ে এ সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গেলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এবারে কিছুতেই মদীনার বাইরে যাওয়া হবে না, মদীনায় থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধনীতি অবলম্বন করা হবে। এর মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নগর রক্ষার এক অভিনব পরিকল্পনা দিলেন, যা আরববাসী এর পূর্বে কোনদিন শোনেও নাই, দেখেও নাই। তিনি নগরের চারপার্শ্বে গভীর পরিখা খননের পরামর্শ দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই পরিকল্পনা অত্যন্ত পছন্দ হলো। অন্যান্য সাহাবাগণও এ পরিকল্পনার অনুমোদন দিলেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে মুসলমানগণ এই গভীর পরিখা খনন কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

চতুর্দিকে পরিখা খননের পরামর্শ গ্রহণ করলেও সব দিকে সেটা করার প্রয়োজন হলো না। মদীনার পশ্চাৎ দিকে আলওয়া পর্বত অবস্থিত। সুতরাং

www.pathagar.com

সেদিকটা সুরক্ষিত ছিলো। অন্য তিন দিকেও সর্বত্র পরিখার প্রয়োজন হলো না, কেননা, দুর্গ প্রাচীর দ্বারা কোন কোন স্থান সুরক্ষিত ছিলো। সেই সব প্রাচীরগুলিকে বরং নতুন গাঁথুনী দিয়ে সংযুক্ত করে দেয়া হলো। যে সমস্ত স্থান উন্মুক্ত ছিলো, সেইসব স্থানেই খনন কার্য শুরু করা হলো। মদীনার উপর হামলার সর্বাধিক আশংকা ছিলো উত্তর দিক থেকে। কেননা, ঐ দিকটাই ছিলো খোলা ময়দান। সুতরাং সেই দিক থেকেই খনন কার্য আরম্ভ করা হলো। শিশু ও মহিলাদেরকে খোরাকসহ বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় দেয়া হলো।

দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে তিন হাজার মুসলিম খনন কার্য চালিয়ে গেলেন। এখানে আন্‌সার-মুহাজির, ছোট-বড়, গোত্র-অগোত্রের কোন ভেদাভেদ রইলো না। সবাই তাদের স্বদেশ ভূমি রক্ষার্থে গজল গেয়ে মনের আনন্দে খনন কার্যে মনোনিবেশ করলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আর সবচেয়ে অপূর্ব দৃশ্য এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেও পূর্ণ উল্লাস ও উদ্যমে সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এ কাজে শরীক হলেন। তিনিও সাহাবায়ে কিরামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দু'লাইন স্বরচিত কবিতা উচ্চারণে পরিবেশ মুখর করে তুললেন। তারই তালে তালে অপূর্ব উন্মাদনায় পরিখা খননের কাজ এগিয়ে গেলো। কবিতার লাইনগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

লা খায়রা, ইল্লাল খায়রান্ আখিরা,
আল্লাহুম্মা আরহামান আন্‌সারা ওয়া মুহাজিরা।

অর্থাৎ

আখেরের শুভ ছাড়া শুভ নাই আর
আন্‌সার ও মুহাজিরে আল্লাহ্ মদদ্‌গার।

এইভাবে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে এক বিরাট খন্দক বা পরিখা খোদিত হয়ে গেলো, যার গভীরতা ছিল ১০ হাত, প্রশস্ততা ১০ হাত এবং লম্বায় ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। প্রশস্ততা এবং গভীরতা এত বেশি এই জন্য রাখা হয়েছিল, যাতে কোন ঘোড়সওয়ার লাফিয়ে খন্দক পার হতে না পারে। আর খন্দকের মৃত্তিকা ফেলে খাদের ভিতরকার পার্শ্ব উঁচু করে বেঁধে দেয়া

www.pathagar.com

হলো, যাতে দুশমনরা ভিতরের কাজ-কর্ম কিছুই দেখতে না পারে এবং কোন অবস্থাতেই ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। বাঁধের আরো সুবিধা এই হলো যে, তীরন্দাজ সৈন্যরা বাঁধকে আড়াল করে সুন্দরভাবে নিজ নিজ স্থানে মজবুতভাবে দাঁড়াবার সুবিধা পেলো, যার ফলে যুদ্ধের সময় যেকোন কুরায়শ সৈন্য আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসতেই মুসলিম তীরন্দাজদের তীরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে ভূতলে ধরাশায়ী হতে বাধ্য হয়েছে এবং কোনক্রমেই তাদের আক্রমণে কামীয়াবী হতে পারেনি। বাঁধের উপরে অগণিত প্রস্তরখন্ড সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছিলো, যাতে বাঁধও মজবুত হয়, আবার প্রয়োজনে এই প্রস্তরখন্ড দিয়েই শত্রুদের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া যায়।

পরিখা খননের আরেক সুবিধা এই হলো যে সমস্ত সৈন্যের কমান্ড ও কন্ট্রোল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর এক হাতে রয়ে গেলো। যুদ্ধের সময় সেনাপতিগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যুদ্ধের দারুণ ক্ষতি হয়। প্রধান সেনাপতি হিসাবে এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। তিনি তিন হাজার সৈন্য থেকে পাঁচ শত দক্ষ সৈন্য আলাদা করে দুইজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে য়াহূদী মহল্লার চতুর্দিকে টহল দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এইসব সৈন্য কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে দিন-রাত ঐ য়াহূদী মহল্লার চারিপার্শে কুচকাওয়াজ করে বেড়াতে লাগলো এবং মুহর্মুহ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে মদীনার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুললো। এতে য়াহূদীরা ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল এবং মুসলিম পল্লী আক্রমণের যে পরিকল্পনা তাদের মনে ছিলো, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। তারা নিজেদের মহল্লা ছেড়ে বাইরে বের হবার সাহসই পেলো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাকী আড়াই হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখা-বেষ্টিত মুক্ত প্রান্তরে কুরায়শদের আক্রমণ প্রতিরোধের প্রতীক্ষায় রইলেন।

অপর দিকে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে ১০ হাজার কুরায়শ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে হাযির হলো। অসংখ্য উট, অগণিত অশ্ব, বিপুল লোক-লস্কর ও রসদ-সম্ভার, সে এক এলাহি কান্ড। আবূ সুফিয়ান প্রথমে

www.pathagar.com

ওহুদ প্রান্তরে এসে ডেরা ফেললো। মনে করেছিলো, সেখানেই মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা হবে। কিন্তু সেখানে কোন মুসলিম সৈন্য না দেখে কুরায়শরা মনে করলো, মুসলিম সৈন্যরা ঘাবড়ে গেছে, এখন অনায়াসে মদীনা আক্রমণ করে দখল করে নেয়া যাবে। তাই তারা চরম উৎসাহে মদীনার দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু এসে যা দেখতে পেলো, তাতে চক্ষু তাদের ছানাবড়া হয়ে গেলো। একি কান্ড ! খন্দক ! এ তো তারা বাপ্-দাদার চৌদ্দ-পুরুষেও দেখেনি বা শোনেনি। তারা খন্দককে সামনে রেখে অগণিত তাঁবু ফেললো। কিন্তু কি করে এই গভীর খন্দক পার হবে, দিন-রাত চিন্তা করেও তার কোন সুরাহা বের করতে পারলো না।

প্রথমত তারা দূর হতে প্রস্তর নিক্ষেপ করে দেখলো, তাতে কোন ফায়দা হলো না। পরে আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা একটি দুর্বল স্থান খুঁজে বের করে তার সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেই স্থানে আক্রমণ চালিয়ে মুসলিম প্রতিরোধ ভেদ করে কিছুটা ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো এবং আমর নামক এক কুরায়শ বীর ভিতরে প্রবেশ করে আস্ফালন করে মুসলিমদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করলো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র শের হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ছুটে এসে আমরের সম্মুখীন হলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে আমরের যুদ্ধ-সাধ মিটিয়ে দিলেন। এরপর নওফেল নামক আরো একজন কুরায়শ বীর হযরত আলী (রা)-র হাতে নিহত হলো। সুতরাং কুরায়শরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো। সেদিনের মতো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো।

মুসলিম সৈন্যরা সারারাত জেগে পরিখা পাহারা দিতে লাগলেন। রাতে আর কোন আক্রমণ হলো না। পরের দিন ভোরে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরামা বিন্ আবূ জেহেল তাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে কখনও খন্ড খন্ডভাবে, কখনও একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পরিখা ভেদ করার চেষ্টা করলেও কিছুতেই কিছু করতে পারলো না। এই ভাবে দ্বিতীয় দিনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো। এদিকে

www.pathagar.com

কুরায়যা গোত্রের য়াহূদীরাও কুরায়শদের নিরাশ করলো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের মুসলিম পল্লী আক্রমণ করার কথা ছিলো। সেই অনুসারে আবূ সুফিয়ান তাদের নিকট লোক পাঠালো কিন্তু তারা ঐদিন তাদের উপাসনার দিন (Sabbath day)-এই অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালো। সুতরাং এদিক দিয়েও কুরায়শগণ কোন ফায়দা নিতে পারলো না।

আবূ সুফিয়ান কিভাবে কি করবে চিন্তা করে কোন কূল-কিনারা পেলো না। একদিকে শীতের রাত, উন্মুক্ত প্রান্তর, পাগলা হাওয়া, সেই অনুসারে যথেষ্ট পোশাকাদি সঙ্গে আনা হয়নি; অন্যদিকে দশ হাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা করাও সোজা ব্যাপার নয়। তারা মনে করেছিলো ২/৪ দিনের মধ্যে মদীনা জয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। সেস্থলে দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। অথচ কিছুই করা গেলো না। সুতরাং মক্কায় ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। কিন্তু ফিরে যেতে চাইলেও নিরাপদে ফিরে যাওয়া হলো না। আল্লাহ্‌র গযব তাদের উপর নেমে এলো। সন্ধ্যাবেলা আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীষণ মরু-ঝটিকা উত্থিত হয়ে কুরায়শদের সমস্ত তাঁবু, ছাউনি ও অন্যান্য যুদ্ধ-সম্ভার লন্ড ভন্ড করে দিলো এবং অনেক কিছুই প্রবল ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। শিবিরের আগুন নিভে গেল। কুরায়শদের দুর্ভোগের আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। দিশেহারা হয়ে সেই রাতেই তারা মদীনা পরিত্যাগ করে মক্কার পথে পা বাড়ালো। সকাল বেলা দেখা গেলো, ময়দান একেবারে সাফ। কুরায়শদের নামগন্ধ কোথাও নেই, পড়ে আছে শুধু তাদের করুণ স্মৃতি, ছিন্ন শিবির, ভগ্ন-আসবাবপত্র ও নির্বাপিত অগ্নিকুন্ডের ভস্ম স্তূপ। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দারুণ সৈনিক বিচক্ষণতার জন্য মদীনার মুসলমানগণ এক ভয়ানক দুর্যোগের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই পেলেন এবং এই যুদ্ধে কুরায়শরা এমন শিক্ষা পেলো যে, পরে তারা আর কোন দিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করেনি।

উপসংহার ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর খন্দক নীতি পরবর্তীতেও এতোটা প্রশংসিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া এই নীতি অবলম্বন করে দুর্দমনীয় জার্মান সৈন্যদেরকে দারুণভাবে পরাজিত করে। তারা

১৮-

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট স্থানে জার্মান সৈন্যদের জন্য জাল বিছিয়ে রাখে এবং হাতীকে যে রকম ফাঁদে ফেলা হয়, ঠিক সেইভাবে জার্মান সৈন্যদেরকে মস্কো এবং স্ট্যালিনগ্রাডের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ পথিমধ্যে জার্মান সৈন্যদেরকে প্রবলভাবে প্রতিহত করা হয়নি, শুধু স্বল্প প্রতিরোধ করে তাদেরকে জিততে দেয়া হয়েছে এবং রাশিয়ানরা পিছু হটে গিয়েছে। এইভাবে সমস্ত জার্মান সৈন্য যখন মস্কো এবং স্ট্যালিনগ্রাডের নিকট পৌঁছে, তখন রাশিয়ান সৈন্য তুমুল বেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একদিকে রাশিয়ানদের প্রচন্ড আক্রমণ, অন্যদিকে রাশিয়ায় তখন ছিল হাড়-কাঁপানো শীত, জার্মান সৈন্যদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিলো না। এ হেন পরিস্থিতিতে দারুণভাবে নাস্তানাবুদ হয়ে, ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে, নিদারুণ পরাজয় বরণ করে জার্মানরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সা) -র দেশপ্রেম

আহমদ আবুল কালাম

প্রিয় নবী (সা) বিশ্বজগতের সব মানুষের জন্য আল্লাহর রসূল হিসেবে পৃথিবীতে আসেন। তিনি রহমাতুললিল আলামীন-বিশ্বজগতের রহমত। তাঁর জীবন-আদর্শে সমস্ত গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ। প্রিয়নবী (সা)-র জীবনাদর্শ যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব সেখানে দেশপ্রেমের আদর্শ মহীয়ান হয়ে ওঠেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির মুক্তির কল্যাণে নিয়োজিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে পারস্য ও রোমানরা ছিল বংশ পরম্পরায় একে অন্যের শত্রু। সম্প্রসারণবাদী এই উভয় সাম্রাজ্যের সাধনা ছিল আরবদেশে আগ্রাসন ও আধিপত্য বিস্তার করা। এমনই এক প্রেক্ষাপটে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা মুহতরাম আবূ তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সংগে একজন পারস্য দেশীয় বণিক এবং অপর একজন রোমীয় বণিকের সাক্ষাত ঘটে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সংগে আলোচনা প্রসঙ্গে রোমীয় বণিক রোম সম্রাট কায়সারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, 'আরবদের উচিত কায়সারের আধিপত্য মেনে নেয়া। এতে করে তাদের অনেক উন্নতি হবে।' রসূলুল্লাহ (সা) নীরব থাকলেন। রোমীয় বণিকের কথার প্রতিবাদ করে পারস্য দেশীয় বণিক বললেন, 'অনেক ব্যাপারেই আরব ও পারস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। এই উভয় জাতি একই

www.pathagar.com

বর্ণের, একই রঙের। অতএব আরবদের উচিত কিসরা-ই-ইরান (ইরান সম্রাটের) বশ্যতা স্বীকার করা, যেহেতু এতেই নিহিত রয়েছে তাদের প্রকৃত কল্যাণ।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়ের কথাবার্তা শুনতে থাকেন। ইরানী ও রোমীয় বণিকদ্বয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বাক-বিতন্ডা শুরু হয়ে যায়। উভয়েরই দাবি হলো আরব দেশের উপর তাদের স্ব-স্ব দেশের আধিপত্য বিস্তার। অবশেষে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত স্বাধীনচেতা রসূল (সা) মৃদু হেসে বললেন,"তোমরা পরস্পরের মধ্যে আর কথা কাটাকাটি করো না। আরবরা কারও অধীন নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হুকুমত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমার দেশের মানুষের অবস্থা আজ শোচনীয় বটে তবে কারও পদানত নয়। আমিও তাদেরকে কারও পদানত হতে দেবো না। অতএব তোমরা আমাদের (দেশবাসীর) উপর শাসনদন্ড চালাবার ইচ্ছা পরিহার কর।"

(দ্র. সীরাতে নবভী ঃ শামসুল উলামা খাজা হাসন নিযামী)

মাত্র ১২ বছরের বালক হযরত মুহম্মদ (সা) দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি সংরক্ষণের জন্য যে প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করেছিলেন, তা তিনি সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। প্রিয়নবী (সা) ও কয়েকজন তরুণ যুবক মিলে হিল্ফুল ফুযূল নামে যে সেবাসংঘ গড়ে তুলেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। দেশের মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা এবং বিদেশীদের নিরাপত্তা বিধান করা ছিল এ সংঘের মূল উদ্দেশ্য। এ সংঘের সদস্যগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই বলে-

১. আমরা আমাদের দেশের অশান্তি ও বিশৃংখলা দূর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

২. বিদেশী লোকদের ধনপ্রাণ ও মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

www.pathagar.com

৩. দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সহায়তা করতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হব না।

৪. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাঁধা দিব এবং নিপীড়িত অত্যাচারিতদের সাহায্য সহযোগিতা করব।

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করব।

সমবেত প্রতিজ্ঞাকারিগণ আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতদের পক্ষ সমর্থন করবেন এবং অত্যাচারীর নিকট থেকে স্বাধিকার আদায় না করে ক্ষান্ত হবেন না। যতদিন সমুদ্রে একটি পশম সিক্ত করার মত পানি অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ থাকবে। (দ্র. হালবী ১-১৩০; তাবাকাত ১-৮২)

দেশ ও সমাজের নৈতিক উন্নয়নে এ প্রতিজ্ঞা অনুসারে বেশ কাজ হয়েছিল। পরবর্তীকালে কুরায়শরা এই প্রতিজ্ঞার কথা এক প্রকার বিস্মৃত হয়ে বসেছিল। কিন্তু যিনি এই নতুন ভাবের প্রথম ভাবুক এবং এই নবীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবনের কোন মুহূর্তে এই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাননি। বদরের যুদ্ধের বন্দীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় তিনি এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করেছিলেন। একদা এই প্রসংগ উল্লেখ- কালে দেশপ্রেমিক হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, "আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে 'হে হিলফুল ফুযূলের ব্যক্তিবৃন্দ!'-আমি নিশ্চয়ই তার সেই আহ্বানে সাড়া দিব। ইসলাম তো এসেছে কেবলমাত্র ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারিতের সাহায্য করতে।" (দ্র. দাহলান ১-১০২; হালবী ১-৩১)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবনের একটা দীর্ঘতম সময় জন্মভূমি মক্কায় অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি প্রাণপণ দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে সক্রিয় ছিলেন। দেশ ও দশের প্রতি রসূল (সা)-এর অপূর্ব ভালবাসা ছিলো। ফলে দেশবাসী সকলেই প্রিয়নবী (সা)-র প্রতি আকৃষ্ট হন। তারা এক বাক্যে মুহাম্মদ (সা)-কে দেশ ও জাতির শান্তি-সম্প্রীতির

www.pathagar.com

অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করে। প্রিয়নবী (সা)-র দেশপ্রেমের দরুন তাঁর প্রতি দেশবাসীর কি পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তা একটা ঘটনা থেকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। কাবা-গৃহে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নিশ্চিত সংঘর্ষের উপক্রম হলে সেখানে শান্তির দূত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে। তখন সকল জনতা সমস্বরে বলে উঠল 'হাযাল আমীনু কাদ রাদীনাহ-এ তো আল আমীন মুহাম্মদ। আমরা সকলেই তার সিদ্ধান্তে সম্মত।(দ্র. তাবারী ২-২০১; ইবনুল হিশাম ২-৬৫; তাবাকাত ১-৯৩) গণমানুষের নিকট প্রিয়নবী (সা) এই যে শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করেছিলেন, তা ছিল তাঁর দেশপ্রেমের জন্য যথার্থ প্রাপ্য।

প্রিয়নবী (সা) নবুয়ত লাভ করে দেশবাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে চড়াও হয়ে উঠে। তবুও বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি এক যুগ ধরে দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। তাদের শান্তি ও মুক্তির জন্য তিনি আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেও জন্মভূমি মক্কায় অবস্থান করেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিপীড়নের চরম মুহূর্তে দেশে অবস্থান করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে জন্মভূমি থেকে হিজরত করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবুও স্বদেশপ্রীতি যেন তাকে বারবার বাধা দেয়। এ সময় আল্লাহ্ প্রিয়নবী (সা)-কে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন :

বলুন, হে আমার রব! আমাকে কল্যাণের সংগে প্রবেশ করান এবং কল্যাণের সাথে নিক্রান্ত করান আর আপনার নিকট থেকে দান করেন সাহায্যকারী শক্তি। —সূরা ইসরা : ৮০

রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ পড়তে থাকলেও প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে যেতে যেন তাঁর মন চাচ্ছিল না। তাই আল্লাহ ইরশাদ করলেন :

লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে ওদেরকে পরিহার করে চলো। —সূরা মুয্যামমিল : ১০

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সা) মদীনায় এসে পৌঁছলে মদীনাবাসী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তবুও জন্মভূমির প্রীতি যেন রসূল (সা)–কে মনের গভীরে বেদানাহত করছে। আলিমুল গায়েব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রিয়নবী (সা)–র মনের অবস্থা জেনে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন ঃ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি (আল্লাহ) তোমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন স্থানে (অর্থাৎ জন্মভূমি মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন।

–সূরা কাসাস ঃ ৮৫

প্রিয়নবী (সা) জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে আসার সময় যে আক্ষেপ করেছেন তা তাঁর দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদীনার দিকে এগুতে এগুতে প্রিয়নবী (সা) অশ্রুসজল নয়নে মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

হায়রে আমার জন্মভূমি মক্কা! দুনিয়ার জনপদগুলোর মধ্যে তুমিই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আমিও তোমাকে অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি ভালবাসি। ইসলামের দুশমনেরা যদি তোমাকে ছেড়ে যাবার জন্য আমাকে বাধ্য না করত, তাহলে আমি কখনই তোমাকে ত্যাগ করতাম না। (দ্র. আব্ওয়াবুল মানকির ঃ তিরমিযী শরীফ; কিতাবুল মানাসিক ঃ ইবনু মাযাহ শরীফ; কিতাবুসসায়র ঃ দায়ামী শরীফ)

উল্লিখিত হাদীস ও ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে দেশপ্রেম প্রিয়নবী (সা)–র সুন্নতের অন্তর্গত। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় প্রিয়নবী (সা)–র জন্মভূমির কথা মনে উঠলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। তিনি মদীনায় অবস্থানকালে জন্মভূমির স্মৃতি ও প্রীতি সদা সর্বদা হৃদয়ের গভীরে লালন করতেন। তখন জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া, কাবা শরীফের সান্নিধ্যে আসা প্রিয়নবী (সা)–র হৃদয়মন জুড়ে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রভাবকে স্বপ্ন বলে অভিহিত করলেন। মূলত মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং জন্মভূমির সাক্ষাত রসূল (সা)–এর একটা সহজাত স্বপ্ন ছিল। ফলে মাত্র আট বছর গড়াতে না গড়াতেই তিনি মক্কা বিজয় সাধন করেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার রসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। –সূরা ফাতহ ঃ ২৭

মক্কা নগরী প্রিয়নবী (সা)–র জন্মস্থান আর মদীনা হলো গিয়ে তার প্রবর্তিত ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র। প্রিয়নবী (সা) মক্কা, মদীনা, নাজরান, রাহরান প্রভৃতি প্রদেশ নিয়ে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনাকে কেন্দ্র করে এ দেশ বা রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। প্রিয়নবী (সা) মদীনা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেন সেখানকার দেশপ্রেম সম্পর্কীয় দু' একটা ধারা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেমন ঃ

১. এ সনদের আওতাভুক্ত সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইয়াসরিব (মদীনা) উপত্যকা অত্যন্ত পবিত্র স্থান।

২. মদীনাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হলো।

৩. মদীনা সহসা আক্রান্ত হলে এ সনদের আওতাভুক্ত সবাই শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হবে।

৪. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায়ের লোক সমবেত প্রচেষ্টায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবে।

৫. কেউ মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।

তত্ত্বগত বিশ্লেষণে না যেয়ে মদীনার সনদের প্রতি সাধারণভাবে তাকালেও বলা যায় যে, উপরিউক্ত ধারাগুলো দেশপ্রেমের মূর্তমান দৃষ্টান্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র হচ্ছে এই মদীনার সনদই।

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার রক্ষা করা দেশপ্রেমের অপরিহার্য দাবি। কোন দেশের প্রতি বাইরের আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দেশের আগ্রাসন যেমন হুমকিস্বরূপ, তেমনি অভ্যন্তরীণ কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র ও আঁতাত দেশের জন্য নেহায়েত ভীতিকর। এ পর্যায়ে ইসলামের বিধি ব্যবস্থা দিবালোকের মত স্পষ্ট। মদীনা থেকে য়াহূদীদেরকে একটা কারণেই বহিষ্কার করা হয়েছিল। তা হলো তারা সংঘবদ্ধ মদীনা রাষ্ট্র তথা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে

www.pathagar.com

অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের মতে একটা দেশের জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আগ্রাসন প্রতিহত করা অপরিহার্য দায়িত্ব। প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ

দুটো চোখ কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, যে চোখ আল্লাহ্‌র পথে সীমান্ত পাহারায় রাত কাটায়। অন্য বর্ণনায়- দেশ রক্ষার্থে একটি রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া সহস্র রাত্রির নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা না হলে দেশপ্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান-এ পাঁচটা বিষয় মানুষের একান্ত দাবি। কোন দেশে এ পাঁচটা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা না হলে দেশবাসী স্বদেশের প্রতি খুব একটা আগ্রহপ্রবণ থাকবে না। এই মৌলিক প্রয়োজনের অপূর্ণতার সুযোগ নিয়ে আগ্রাসী শক্তি বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ করতে পারে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের এই মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেনঃ কোন ব্যক্তির উপর যদি আল্লাহ্‌ মুসলমানদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং সে যদি তাদের প্রয়োজন ও সমস্যাবলীর সমাধানে উদাসীনতা প্রদর্শন করে তাহলে আল্লাহ্‌ও তার প্রয়োজন পূরণে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। (দ্র. আবূ দাউদ শরীফ)

রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজনীতি-এক কথায় ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে তার প্রতিটিই ন্যায়নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশপ্রেমের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং দেশপ্রেমের নামে যদি সত্য সুন্দর ও কল্যাণের বিরোধিতা করা হয় কিংবা আপামর জনসাধারণের ন্যায়সংগত অধিকার হরণ করা হয় অথবা দেশপ্রেমের নামে যদি আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে উপেক্ষা করা হয় তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত একজন মুসলিমকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ ইসলামে অস্বীকৃত। ফলে একটা মুসলমানের স্বদেশপ্রেম নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকবে না। তা রূপান্তরিত হবে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বপ্রেমে। ইকবালের ভাষায় 'মুসলিম হ্যাঁয় হাম ওয়াতন হ্যাঁয়, সারা জাঁহা হামারা'-আমরা মুসলিম, নিখিল বিশ্বই আমাদের স্বদেশ।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) - র পারিবারিক জীবন

নূরজাহান বেগম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবন শুরু হয় ২৫ বছর বয়স থেকে। ২৫ বছর বয়সে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী এবং ধনবতী মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন। তখন হযরত খাদীজা (রা)-র বয়স ৪০ বছর। ধনাঢ্য আরব রমণী হযরত খাদীজা (রা)-কে নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন শুরু হয়। বিবাহ পরবর্তী জীবনে তার সংসারে তখন কোন সন্তান না থাকলেও তিনি সন্তানের জনক। তাঁর সংসারে সহোদর ভাই নেই, তবু তিনি বড় ভাই। সংসারে গর্ভধারিণী মাতা-পিতা ছিল না, তবু তিনি গরীব পিতা-মাতার একমাত্র আশার স্থল। তাই তিনি বিয়ের পর হযরত আলী (রা)-কে নিজের সংসারে নিয়ে আসেন এবং ছোট ভাই আকিলকে দুধ ভাই চাচা আব্বাসকে দেন লালন পালন করতে। খাদীজা (রা) স্বামীর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং বংশমর্যাদার কথা উপলব্ধি করেই বিয়ের ৩ দিন আগে থেকে ৩টি করে উটে মালামাল পাঠাতে থাকেন শ্বশুর আবু তালিবের বাড়ী, যাতে গোত্রপ্রতি শ্বশুর-এর কোন প্রকার অমর্যাদা না হয়।

নবী করীম (সা)-এর পারিবারিক জীবনের ৩৯ বছরের মধ্যে হযরত খাদীজা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে দাম্পত্য জীবন কাটে ২৫ বছর। এই ২৫ বছরে তিনি ছয় সন্তানের পিতা হন। এ সময় আর দ্বিতীয় কোন পত্নী গ্রহণ করেন নি। প্রথম সন্তান হযরত জয়নব, তারপর রোকাইয়া, কুলসুম এবং হযরত ফাতিমা (রা)। মা ফাতিমা সবার ছোট। এর আগে দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। রসূলে পাক ওফাতের সময় একটি সন্তান রেখে যান। রসূল জীবনের সবচেয়ে মধুর এবং সর্বদিক দিয়ে শান্তির দাম্পত্য জীবন ছিল খাদীজাতুল কুবরার সময়। একজন জ্ঞানে, মান-মর্যাদায় রূপে গুণে আরবের তাহেরা বা মালেকা; অন্যজন জ্ঞানে, মানে, মর্যাদায় এবং রূপে গুণে আরব

www.pathagar.com

আযমের আল-আমীন। একজন সতী, অন্য জন বিশ্বাসী। এমনটি জগতে খুব কমই দেখা যায়, এমন সুন্দর দাম্পত্য জীবন অতি আনন্দের সংগে ২৫টি বছর সন্তান-সন্ততি নিয়ে কাটে মহানবী (সা)-র। কিন্তু হযরত খাদীজা (রা) ও চাচা আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর নবীর জীবনে গভীর বিষণ্ণতা নেমে আসে। বেহেশ্‌তের ফুল শিশু কন্যা কুলসুম আর ফাতিমাকে নিয়ে মহা সংকটে পড়েন। ঘরে নাবালক দুই শিশু কন্যা, অন্যদিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ইসলাম প্রচার। চারদিকে শত্রু, চাচা আবূ তালিব আর পত্নী খাদীজা (রা)-ই শত্রুর দুশমনী থেকে তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন, রসূল জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতেন। এই দুই ব্যক্তির একই সংগে ইহলোক ত্যাগ শত্রুদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। এই সময় হযরতের সংসারের দেখাশুনা করতেন ফুফু খাওলা (রা)। তিনি নবী জীবনের এমন দুর্দশা দেখে বারবার অনুরোধ করতেন মহানবী (সা)-কে বিবাহের জন্য। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সা)-এর শুধু ঐ একই কথা, "আমি আর দ্বিতীয় খাদীজা কোথায় পাব, যে আমার সন্তান, সংসার এবং আমার শুধু নয়, আমার প্রচারিত ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।" এইভাবে ৩টি বছর চলে যায়, মহানবী (সা) খাদীজা-বিয়োগ কথা ভুলতে পারেন না একটি মুহূর্তের জন্য। এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রচার এবং সন্তানের প্রতি এতটুকু অযত্ন করেন নি।

অবশেষে নবুয়তের দশম সালে হযরত খাওলার একান্ত ইচ্ছায় এবং চেষ্টায় শোকরানের বিধবা পত্নী হযরত সাওদার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা) শাদী মুবারকে আবদ্ধ হন। হযরত সাওদা ছিলেন ইসলামের প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা। স্বামীসহ দু'বার হিজরত করেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর দেশে ফিরে এলে আত্মীয়-স্বজন তাকে সমাজচ্যুত করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত সাওদা (রা)-র প্রার্থনা কবূল করেন। আল্লাহ্ বলছেন, "হে নবী আপনি নিরাশ্রয় দুঃখিনীর অভিলাষ পূর্ণ করুন এবং তাকে শাদী করুন।" নবুয়তের দশম সালে শাওয়াল মাসের ৫ তারিখে ৫৩ বছর বয়সে সাওদার পরামর্শে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-র সাথে

www.pathagar.com

আক্‌দ করেন। তাঁর এ বিয়ে যখন সম্পন্ন হয়, হযরত আয়েশার বয়স তখন ৮–৯ বছর।

বলা বাহুল্য, হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহ্ তা'আলা আনহুর একান্ত ইচ্ছায় হযরত আয়েশা (রা)–র সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর শাদী মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরই ৬২২ খৃষ্টাব্দে ১২ জুলাই ১লা রবিউল আওয়াল রসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। ২২ দিন রাস্তায় কাটানোর পর মদীনায় গিয়ে পৌঁছান। আক্‌দ–এর দু'বছর পর হিজরী দ্বিতীয় সন থেকে হযরত আয়েশা (রা) স্বামীর ঘরে আসেন। ২ বছর হযরত সাওদা (রা) একাকী স্বামীর সংসার করেন।

হযরত আয়েশা (রা) ৮ বছর স্বামীর সংসার করেন। হিজরী তৃতীয় সাল থেকে সপ্তম সাল পর্যন্ত নবী করীম (সা) ৮ জন পত্নী গ্রহণ করেন। রসূল জীবনে একাধিক পত্নী গ্রহণের পিছনে কোন–না–কোন উদ্দেশ্য আছে অবশ্যই। রসূলে পাকের ৩৮ বছর বিবাহিত জীবনের মধ্যে ২৫ বছর হযরত খাদীজাতুল কুবরা, ৩ বছর বিপত্নীক জীবন যাপন, ২ বছর শুধু একাকী হযরত সাওদার সাথে, ১ বছর হযরত সাওদা আর হযরত আয়েশার সাথে কাটে। ২৫+৩+২+১ = মোট ৩১ বছর খাদীজাতুল কুবরা, হযরত সাওদা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)–র সাথে পারিবারিক জীবন কাটে। এরপর বাকি ৭ বছর অর্থাৎ ৫৭ বছর বয়স থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ১০ জন পত্নী নিয়ে সংসার করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি একাধিক বিয়ে করেন ঠিক, তা যৌবনের উন্মাদনায় নয়, আল্লাহ পাকের আদেশে আদিষ্ট হয়ে। প্রত্যেকটি পত্নী ছিলেন ইসলামের জন্য, আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের জন্য, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্য আত্মনিবেদিত প্রাণ। তারা প্রত্যেকে বিবাহিতা ছিলেন, একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বাদে। শেষ বিচারের দিন যাদের হাতে থাকবে হাউস কাওসার–এর পানির দায়িত্ব, তাঁর বিচার এবং সমান অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভালভাবেই অবগত আছেন। আর সেই ব্যক্তির নিকট তাঁর একাধিক পত্নী কেমন বিচার বা অধিকার পেতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

আমরা নবী করীম (সা)-এর প্রত্যেকটি বিয়ের ইতিহাস জানলে বুঝতে পারি, কোন-না-কোন মহৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এ সমস্ত পুণ্য শাদী মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। অথচ অমুসলিমগণ সমালোচনা করে থাকে, একজন নবী এমন করলেন কি করে। অথচ তারা জানে না প্রত্যেকটি বিয়ে হয় আল্লাহ্ পাকের কোন-না-কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। নবী জীবনে প্রথম বিয়ে হয় ৫৯৫ খৃস্টাব্দের দিকে। এ বিয়েতে ৫৫০ দিরহাম মোহরানা ছিল। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন রসূল জীবনে পৌত্তলিক যুগে দেহের ও মনের বর্মধারী ঢালস্বরূপ। কারণ, বর্বর আরবগণ তদানীন্তন আরবে তাদের মালেকাকে সবাই তাহেরা বলেই জানত। এ সময়টি ছিল পৌত্তলিক যুগ। এই যুগের একজন পৌত্তলিক প্রতিবেশী ওরওয়া বলেন, আমি আল-আমীনকে বলতে শুনেছি, "হে খাদীজা, আমি লাত ও ওজ্জার উপাসনা করি না, হে খাদীজা! আল্লাহ্র কসম, আমি লাত ও ওজ্জার উপাসনা কখনো করি না।" এ কথা শুনে হযরত খাদীজা (রা) বলেন, "হে স্বামী, ও প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন।" খাদীজা (রা) বলেছেন, "হে স্বামী। আল্লাহ্র কসম আমিও না।" উল্লেখ থাকে যে, এ কথাগুলো পৌত্তলিক যুগের মহানবী (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির আগের ঘটনা। এর থেকে অনুমান করা যায়, এ দম্পতির বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক কিন্তু মনের মিল ছিল অগাধ ও অকল্পনীয়। এই বাক্য দু'টির মধ্যে শেষের উক্তিটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, যে নারী সত্য এবং সত্যের নবীর সন্ধানে নিজেকে এবং নিজের কষ্টে অর্জিত সমস্ত সম্পদ হাসিমুখে বিলিয়ে দেন, সে নারীর প্রাণাধিক স্বামীর গতিবিধি লক্ষ্য করে সেভাবে চলাই স্বাভাবিক। এতেই বোঝা যায়, কেমন মধুর পারিবারিক জীবন শুরু হয় মহানবী (সা)-র। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্য খাদীজা (রা)-র পুত্রই ইসলামে প্রথম শহীদ হন। সুবহানাল্লাহ। কেমন মায়ের কেমন পুত্র একবার ভাববার বিষয়। একটি কথা সত্য যে, সমস্ত সৃষ্টির শান্তির উৎস যাকে কেন্দ্র করে, সেখানে কি অশান্তির এতটুকু বীজ থাকতে পারে। তাই আমরা দেখছি একজন সন্তান নিয়ে মহা আনন্দে সংসার আর স্বামীসেবা যত্ন নিয়ে ব্যস্ত, অন্যজন দিন-দুনিয়ার সমস্ত লোভ-লালসা ভুলে হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন। তিনি

www.pathagar.com

স্বামীর সমস্ত কাজ নিজের হাতে করতেন এবং স্বামীর জন্য ৩ মাইল পথ হেঁটে খাবার তৈরি করে নিয়ে যেতেন এবং দুর্গম হেরা পাহাড়ে উঠে গুহায় প্রিয় স্বামীকে নিজের হাতে খাওয়ানোর জন্য বসে থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্টা।

আজ আমরা মক্কা মদীনায় গাড়ী বা রাস্তা ঘাট দেখতে পাই। ১৪ শত বছর আগে এত রাস্তা-ঘাট বা গাড়ী-ঘোড়া শুধু আরবে কেন, দুনিয়ার কোথাও ছিল না। সেই সময় ধনীর দুলালীর মরুময় কংকরযুক্ত রাস্তায় উত্তপ্ত রোদে স্বামীর জন্য পায়ে হেঁটে ৩ মাইল যাওয়া আসা শুধু ইসলামের জন্য নয়, মধুর দাম্পত্য জীবনের উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত জগতকে মধুর দাম্পত্য জীবন কাকে বলে তা-ই শিক্ষা দেবার নীতিমালা তৈরির উৎস। এর প্রমাণ হাদীসেই পাই। জিবরাইল (আ) বলছেন, "হে নবী! খাদীজা আসছেন, তাকে আমার ও আমার প্রভুর তরফ থেকে সালাম জানাবেন।" হযরত খাদীজা (রা)-র মত মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও সর্বত্যাগী পত্নী ছিলেন বলেই জিবরাইল (আ) ও আল্লাহ্ পাক সালাম জানান।

আমরা পার্থিব দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য দেখতে পাই কিন্তু ঠিক এমন মনের মিল সৃষ্টি জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। নিজের কষ্টে অর্জিত ধনভান্ডার অম্লান বদনে স্বামীর জন্য বিলিয়ে দেন এমন নজির জগতে বিরল।

নবুয়তের প্রথম বর্ষে ওহী আসা যখন কিছুদিন বন্ধ থাকে সেই সময় মহানবী (সা) ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যান যে, আমার প্রভু কি আমাকে পরিত্যাগ করবেন? আর কি সত্যের সন্ধান পাব না? এ সময় হযরত খাদীজা (রা)-র ভূমিকা নবী জীবনে অপরিসীম, যা নাকি তিনি সমস্ত জীবনে ভুলতে পারেননি। রসূলে পাক (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে যে ওহী নাযিল হয়, তাতে আমরা মহানবী (সা)-র সাথে হযরত খাদীজার শাদী মুবারকের ইঙ্গিত পাই। 'হে নবী! আপনি কি আশ্রয়হীন ছিলেন না? আমি কি আপনাকে আশ্রয় দেইনি? হে নবী! আপনি কি সম্পদহীন ছিলেন না? আমি কি আপনাকে সম্পদ দান করিনি?" এর থেকে বোঝা যায়, খাদীজা (রা)-র মত পত্নী আল্লাহ্র অশেষ দান। পার্থিব ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে এ বিয়ে নয়। হযরত খাদীজা (রা)-র পর আর সকল উম্মুল মু'মিনীন-এর আগে হযরত জয়নব (রা) ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি কেবল

www.pathagar.com

মাত্র হযরত মুহম্মদ (সা)-র আগে ইহলোক ত্যাগ করেন। হযরত জয়নব (রা) মহানবী (সা)-র ফুফাতো বোন এবং হযরত জায়েদের পত্নী ছিলেন। দানের জন্য তিনি জগত-বিখ্যাত। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পত্নীদেরকে একের পর এক পালাক্রমে যুদ্ধে যাওয়ার সময় সংগে নিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পত্নীদের সংগে যাওয়ার ব্যাপারে লটারী করতে বলতেন, লটারীতে যার ভাগ্যে যা উঠত। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে নবী (সা)-র সংগে পত্নীগণ অংশ নিতেন। আহত সৈনিকদের পানি খাওয়ানোর জন্য, যত্নের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাগণ অংশ নিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহানবী (সা)-র ৯ জন পত্নী ছিলেন। আসর নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক পত্নীর পবিত্র হুজরায় সাক্ষাত করতে প্রবেশ করতেন। এই সময় উম্মুল মু'মিনীনগণ যে যার পছন্দ মত খাবার বা হাদিয়া রসূল (সা)-এর সম্মুখে হাযির করতেন। এখানে উল্লেখ্য, তিনি পত্নীদের সংগে একই থালায় আহার করতেন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক পত্নীর সংগে দেখা করার পর সর্বশেষে জগৎ মাতার সংগে দেখা করে যে উম্মুল মু'মিনীনের ঘরে থাকার পালা সেই ঘরে যেতেন। হযরত সাওদার পালার দিন মহানবী (সা) যথাবিহিত হযরত সাওদা (রা)-র ঘরে যেতেন এবং তিনি এত স্থূলকায় ছিলেন যে, নিজের হাতে কোন জিনিস তৈরি করে রসূল (সা)-এর সম্মুখে হাযির করতে পারতেন না। তাই সকল উম্মুল মু'মিনীন ঐ সন্ধ্যায় এক সংগে হযরত সাওদা (রা)-র ঘরে সন্ধ্যা কাটাতেন এবং গল্প-গুজব শুনতেন হযরত সাওদা (রা)-র নিকট থেকে। কোন কোন সময় রসূল (সা) গল্প করতেন, তাঁরা শুনতেন। হযরত সাওদা (রা) হযরত আয়েশাকে নিজ হুজরায় মহানবী (সা)-কে নিয়ে যাওয়ার তাকিদ দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। বিদায় বেলায় উঠে স্বামীকে এগিয়ে দেবার জন্য ওঠার চেষ্টা করলে মহানবী (সা) নিজে ধরে তুলে দিতেন এবং হযরত সাওদার যা যা প্রয়োজন নিজে সবকিছু তাঁর সম্মুখে রাখতেন। এসব দেখে সাওদা (রা) ভীষণভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, আমি কত বড় অপরাধী যে, আল্লাহ্র নবীর সেবা নিচ্ছি। মহানবী (সা) বলতেন, সাওদা, আপনি আফসোস করছেন কেন, আল্লাহ্র তরফ থেকে এটা আপনার পাওনা। আপনি

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র শাস্তিতে বিশ্বাসী।" হযরত সাওদাকে হযরত আয়েশা (রা) বলতেন, "আপনার আত্মা যদি আমার কালবে আসত আর আমার আত্মা যদি আপনার কালবে যেতো কি সুখী হতাম।" পারিবারিক জীবনে তিনি পত্নীদের আত্মীয়-স্বজনকে অতি সম্মান দিতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা)-র দুধ চাচা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়াতে হযরত আয়েশা (রা) পর্দার বাইরে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর চাচার সাথে কথা বলছেন। এমন সময় রসূলে পাক (সা) আয়েশা সিদ্দীকার হুজরায় আসেন। জানতে চান লোকটি কে? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দুধ চাচা, আমাকে দেখতে এসেছেন, আমি কি তাঁ সাথে পর্দা করব?" রসূলে পাক (সা) বলেন, 'না, তাকে ঘরে এনে বসতে দাও, আপ্যায়ন কর, দুধ চাচার সাথে পর্দা করতে হবে না।'

হযরত আয়েশা (রা)-র উক্তি থেকে বোঝা যায়, মহানবী (সা) পত্নীদের কেমন দেখতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, আমরা ১০ জন, আমি আপনার ভালবাসার ষোল আনার দশ ভাগের এক ভাগ। আপনার উপর আমার যে অধিকার বাকী নয় জনেরও তাই। কিন্তু আমি দেখি আপনি আমাকে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসেন।" রসূলে পাক (সা) বলেন, "তা অসম্ভব! খাদীজাতুল কুবরার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা কি তোমার মনে নেই! খাদীজাকে আমি যেমন ভালবাসতাম, তেমন আপনাদের প্রত্যেককেই ভালবাসতে চেষ্টা করে থাকি।"

আল্লাহ্‌র নবী পারিবারিক এবং সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার ব্যাপারে আদর্শ স্থানীয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন পত্নীর আত্মীয়স্বজনকে ক্ষমা করে। যার ঘরে যেদিন থাকার পালা তার ঘরে সবশেষে যেতেন। তাঁর সাথে সেদিন ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করতেন। ঘর ঝাড় দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কাজ তিনি পত্নীর সাথে করতেন। সকল পত্নীর সমান অধিকার, তাই তিনি সবার সাথে নির্দিষ্ট পালার দিন কাজ করতেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ছোট থাকায় তাঁর সাথে খেলা করে বা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাঁকে খুশী করতেন।

www.pathagar.com

কারণ, আয়েশা সিদ্দীকা দৌড়ে পটু ছিলেন। আল্লাহ্‌র নবী এতে কিছু সংকোচ বোধ করেন নি যে, এ বয়সে দৌড়ে পাল্লা দেয়া ঠিক হবে কি না। তাঁর মহান উদ্দেশ্য ছিল ছোট মানুষের সঙ্গ দান।

হযরত খাদীজা (র) ছিলেন বিপদে আশ্রয়দায়িনী, দুঃসময়ের বন্ধু। মোট কথা সত্যের নবী (সা)-র সত্য সন্ধানে অনুপ্রেরণা দানকারিণী। এই মহীয়সী মহিলার গর্ভে রসূল (সা)-এর ৬টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শিশু অবস্থায় পুত্র সন্তানদ্বয় ইহলোক ত্যাগ করেন। কন্যা সন্তানগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা খাতুনে জান্নাত যিনি সবার ছোট এবং তিনি পাক পাঞ্জাতনের অন্যতম ব্যক্তি। হযরত রোকেয়া (রা) এবং কুলসুম (রা) উভয়ে হযরত উসমান (রা)-এর পত্নী ছিলেন। হযরত জয়নব মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় আহত হন এবং মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজা (রা) ৪টি কন্যা সন্তান জীবিত রেখে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সা) শুধু হযরত ফাতিমা (রা)-কে ৬ মাসের জন্য জীবিত রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। হযরত খাদীজা (রা) জীবিত অবস্থায় তাঁর বেহেশতবাসী হওয়ার সংবাদ জিবরাইল (আ) মারফত প্রিয় স্বামীর নিকট থেকে অবগত হন।

দীন এবং দুনিয়ার নবী খাদীজা (রা)-র বিয়োগ ব্যথায় জর্জরিত দিশেহারা প্রায়। এমন সময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হযরত সাওদাকে বিবাহ করেন। সাওদা (রা)-র সাথে মহানবী (সা)-র বিয়ে সংক্রান্ত ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। সাওদা (রা) ছিলেন ধীর স্থির শান্ত এবং সহজ-সরল ধর্মপ্রাণা মহিলা। তাঁর জন্য খাদীজা (রা)-র মত সুদক্ষ সুনিপুণা গৃহিণীর অনুপস্থিতিতে এমন ধীর, স্থির, জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল দু'টি শিশু কন্যার লালন-পালনের জন্য। সাওদা (রা) আর আয়েশা সিদ্দীকার বিয়ে এবং আক্দ ১৫ দিন আগে পিছে সম্পন্ন হয়। এঁদের মধ্যে খুব মিল ছিল। মহানবী (সা)-র ঘরে সাওদার কোন সন্তান হয়নি। শেষ জীবনে হযরত সাওদা (রা) নিজের পালার দিন ছোট বোন আয়েশা (রা)-কে ছেড়ে দেন। কারণ, তিনি এত বৃদ্ধা ও অচল হয়ে গিয়েছিলেন যে, একা ওঠা বসা করতে পারতেন না। তাই তিনি মহানবী (সা)-র নিকট প্রার্থনা করেন,

www.pathagar.com

"আমি এমন পাপী যে, আমি আপনার খিদমত করতে পারি না। আপনি আমার খিদমত করেন।" হযরত সাওদা (রা) আর হযরত আয়েশা (রা)-র ঘর পাশাপাশি ছিল। হযরত সাওদা (রা)-র পালার দিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত হযরত সাওদা (রা)-র সাথে সময় কাটাতেন। তাঁকে যত্ন করতেন, ঐ ঘরে নামায আদায় করতেন। এ আসরে সব পত্নী থাকতেন, তারপর খেতে যেতেন। এই যে অসহায় পত্নীর প্রতি স্বামীর সহানুভূতি, সহযোগিতা, মায়া-মমতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা, এটা নবী জীবনের পারিবারিক মধুর সম্পর্কের নিদর্শন বটে। একটি হাদীস দেখলে বোঝা যায়, রসূলে পাক (সা) আর হযরত (রা) আয়েশা একই থালায় খাচ্ছেন এমন সময় হযরত সাওদা (রা) উপস্থিত। হযরত আয়েশা (রা) কয়েকবার বড় বোনকে সাথে খেতে অনুরোধ করেন। এতে সাওদা (রা) আপত্তি জানান। হযরত আয়েশা (রা) জোর করে হযরত সাওদা (রা)-র মুখে খাবার পুরে দেন। এতে হযরত সাওদা হযরত আয়েশার নিচে পড়ে যান। রসূলে পাক (সা) বলেন, "কর কি ? এ বয়সে সাওদা কি তোমার সাথে পারে ?" সাওদা বলেন, ''আয়েশার আবদার আমাকে বরদাশৃত করতেই হবে।" এই যে সপত্নীদের হাসি-তামাসা স্বামীর সামনে, এতে বোঝা যায়, মহানবী (সা)-র পারিবারিক জীবন মাধুর্য ও সৌন্দর্যে ভরা।

দীনের নবী (সা)-র পিতৃস্নেহ জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। কারণ, তিনি কন্যাদের অতীব স্নেহ করতেন। একটি হাদীসে দেখা যায়, রসূল (সা) বলেছেন, "ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা, তাকে যে কষ্ট দেয়, আমাকে সে কষ্ট দেয়।" এ থেকে বোঝা যায়, জগত এবং জীবনের কান্ডারী হয়েও সন্তানদের তিনি কেমন আদর করতেন। আর একবার জগত-মাতার হাতে দু'টো সোনার বালা দেখে রসূল পাক (সা) কথা না বলে, কন্যার ঘরে না ঢুকে চলে যান। জগত-মাতার বুঝতে বাকি থাকে না। তিনি হাতের বালা বিক্রি করে সংগে সংগে পিতার নিকট পাঠান। ঐ টাকায় একজন দাসীকে মুক্তি দিয়ে সংগে সংগে রসূলুল্লাহ্ (সা) হাসতে হাসতে প্রিয় কন্যার নিকট আসেন। তিনি বলেন, "মা, নবীর কন্যার হাতে আগুনের বালা, এটা কি করে সহ্য করি, তোমার জন্য দুনিয়া নয়।"

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সা) পারিবারিক জীবনে ছিলেন আদর্শ স্থানীয় এবং পরিবার নামক সংগঠনের আদি এবং অন্তের মূলনীতিমালা প্রণয়নকারী। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের মূল উৎস। একবার নয়, দুই বার হযরত আয়েশা (রা)-র গলার সোনার হার মরূদ্যানে হারিয়ে যায়। এই হারটি ছিল হযরত আয়েশা (রা)-র বড় বোন সালমার। একবার এই হারকে কেন্দ্র করে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়। তিনি যে সতী সে সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়। দ্বিতীয় বার ঐ একই ব্যক্তির হার আবার আয়েশা সিদ্দীকা (রা) চেয়ে নিয়ে গলায় দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। এবারও হার হারিয়ে যায়। একথা শোনামাত্র তাঁবু ফেলা হয় বালুকাময় নির্জন স্থানে, মহানবী (সা) চুপ। সাহাবী (রা) নামায আদায় করতে পারছেন না ওযূর পানির জন্য। রসূলে পাক (সা) তাঁবুর ভিতর আছেন, হার খোঁজ করা হচ্ছে। হযরত আবূ বকর (রা) খুব চিন্তিত যে, তাঁর মেয়ের জন্য নবী করীম (সা) তাঁবু ফেললেন আর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা নামায আদায় করতে পারছেন না। একবার মেয়েকে ডেকে বললেন, "মা, তোমার জন্য আমার নবীর এত কষ্ট, এটা কি করছ, মা। পানি নেই, নামায পড়া যাচ্ছে না আর একটু এগিয়ে তাঁবু ফেললে পানি পাওয়া যেতো, কিন্তু রসূল (সা)-এর হুকুম, আমরা তো কিছু করতে পারছি না। সাহাবা (রা)-গণ নামায আদায় করতে ব্যস্ত। এমন সময় তায়াম্মুমের ওহী নাযিল হলো এবং হার পাওয়া গেল। এই ওহীর পর উসাইদ বিন হুযাইর (রা) সবিনয়ে মন্তব্য করেন, "হে আবূ বকর (রা)-এর সন্তান, আপনি সকলের জন্য রহমতের মূল কারণ।" এইভাবে জগতের মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার ওহী আসে। নশ্বর পৃথিবীতে মানব ক্ষণস্থায়ী, তাই তাঁর গৃহ পরিবেশ শুধু নয়, আচার-আচরণ এবং ব্যবহারযোগ্য সম্পদ আসবাবপত্র ছিল অতি সামান্য এবং অনাড়ম্বরময়। তাঁর সংসার জীবন ছিল অতি সাধারণ, অতি নগণ্য ও সম্পদশূন্য।

আল্লাহ্র নবী (সা) পারিবারিক জীবনে ছিলেন একজন গৃহকর্তা। সংসার জীবনে প্রত্যেকটি কাজ নিজের হাতে করতেন। নিজের ক্রীতদাসকে মুক্তি দেন

www.pathagar.com

চলে যাবার জন্য। কিন্তু তাঁর গুণে মুগ্ধ ক্রীতদাস নিজের পিতা এবং চাচার সাথে ফিরে না গিয়ে রসূল (সা)-এর সেবায় থেকে যান; তিনি হলেন পালিত পুত্র যায়েদ। আরবদের বংশীয় অহংকার গোত্র কলহ বাঁধার একমাত্র কারণ ছিল। তাই তিনি নিজের দাস-পুত্র হযরত যায়েদের সাথে নিজের ফুফাতো বোনের বিয়ে দেন। যাতে বংশ অহংকার, পারিবারিক এবং সামাজিক কলহের কারণ না হয়। পারিবারিক জীবনে তিনি সকল পত্নীকে সমান অধিকার দিয়ে গিয়েছেন। জীবনের ১৩টি বছর তিনি মদীনায় জীবন কাটান, এই ১৩ বছরের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল কর্মব্যস্ত জীবন। এই জীবনে তিনি ৮৩টি যুদ্ধে অংশ করেন, ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝেই বকরী জবাই করে খাদীজাতুল কুবরার বান্ধবীদের বাড়ী হাদিয়া পাঠাতেন। মদীনা জীবনে সংসারত্যাগী ৪৫০-৫০০ জন সাহাবী সর্বদা আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁদের কাজ ছিল শুধু আল্লাহ্র যিকর করা আর রসূল (সা)-এর হুকুম পালন করা। তাঁরা যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণ করতেন, অবসর সময় আল্লাহ্ প্রেমে কেউ কেউ যিকর করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। তাঁদের আহার নিদ্রার কোন প্রয়োজন হত না। রসূলে পাক (সা) ঘুমোতে যাওয়ার আগে এঁদের খোঁজ-খবর নিয়ে তবে হুজরায় যেতেন। কারণ এঁরা মসজিদে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রসূল (সা)-এর কাছে কোন হাদিয়া এলে এঁদের জন্য সিংহ ভাগ দিয়ে বাকি মহিলাদের জন্য ভিতরবাড়ী পাঠাতেন।

www.pathagar.com

রসূল করীম (সা)-এর বৈবাহিক জীবন

অধ্যাপক মোঃ আবদুল মতিন

রসূলুল্লাহ (সা)-র মহীয়সী স্ত্রীগণের সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, সম্পদশালিনী ও পুণ্যবতী। তাঁদের মন-মানসিকতা ও রুচিবোধ ছিল অতি উঁচু স্তরের। রসূলুল্লাহ (সা)-র সংসারে ছিলো না ধনৈশ্বর্য। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা অতি সাধারণ ও সরল জীবন যাপন করে গেছেন। তিনি তাঁদেরকে সমভাবে ভালবাসতেন। কিন্তু বিবি খাদীজা (রা)-কে তিনি কখনো ভুলতে পারেননি।

রসূল করীম (সা)-এর বৈবাহিক জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা ১. প্রথম পর্যায়ে বিবি খাদীজাতুল কুবরার সাথে (২৫ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত)। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবি খাদীজা (রা)-র ইন্তিকালের পর বিয়ে হয়। ২. বিবি সাওদা (রা) ও ৩. বিবি আয়েশা (রা)-র সাথে (৫১ বছর থেকে ৫৬ বছর পর্যন্ত)। তৃতীয় পর্যায়ে বিয়ে হয় ৪. হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা) ৫. হযরত জয়নাব বিনতে খুয়াযমা (রা), ৬. হযরত উম্মে সালমা (রা), ৭. হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা), ৮. হযরত যুয়ায়রিয়া (রা), ৯. হযরত উম্মে হাবীবা (রা), ১০. হযরত সুফিয়া (রা), ১১. হযরত উম্মে মায়মূনা (রা), ১২. হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রা) প্রমুখ পুণ্যশীলা মহিলাদের সাথে (৫৬ বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত)। বাকী ৩ বছরে আর কোন বিয়ে হয়নি।

দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্যায়

১. বিবি খাদীজা (রা)

আরবের মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চবংশ কুরায়শ বংশের মুহম্মদ (সা) ছিলেন তখন ২৫ বছরের অতুলনীয় এক কান্তিময় যুবক। আরবের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল

www.pathagar.com

তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও রূপ-গুণের কথা। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের সুন্দরী কুমারী মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল অনেক। কিন্তু সব কিছুই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ছাড়া তাঁর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিলো না। তাঁকে যে বিশ্বনবীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি ২৫ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিত্তবান ও সম্মানিত খুয়ায়লিদ-এর গুণবতী ও ধনবতী কন্যা বিবি খাদীজা (রা)-র সংগে। ৪০ বছরের বিধবা রমণী বিবি খাদীজা (রা)-র ইতিপূর্বে দু'বার, মতানৈক্য তিনবার বিয়ে হয়েছিলো। চতুর্থ বারে তিনি প্রিয়নবী (সা)-র সহধর্মিণীর মর্যাদা লাভ করেন। বিবি খাদীজা (রা) ৬৫ বছর বয়সে যখন ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত রসূল (সা)-এর বয়স ছিলো পঞ্চাশ বছর। দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপী তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিলো পরম আনন্দের ও আদর্শের। এই পুণ্যশীল দম্পতি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-মমতার, সুখে-দুঃখে পরস্পরের অংশদারিত্বের। বিবি খাদীজা (রা)-র জীবদ্দশায় তিনি আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি। প্রৌঢ়া স্ত্রীকে নিয়ে যে মহামানব জীবনে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত পরমানন্দে কাটাতে পারেন, বার্ধক্যের পরবর্তী ১৩ বছরের জীবনে জৈবিক ক্ষুধা মিটাবার জন্যে তিনি পরপর ১১টি বিয়ে করেছিলেন এরূপ ধারণা করা কেবলমাত্র অসুস্থ, অজ্ঞ, মূর্খ ও শত্রুদের পক্ষেই সম্ভব।

বিবি খাদীজা (রা) প্রিয় স্বামী আল-আমীনের পদতলে সমর্পণ করেছিলেন তাঁর দেহ-মন-প্রাণ ও সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। সত্যের সাধনার ক্ষেত্রে, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে, বিপ্লবের ক্ষেত্রে শত্রুর মুকাবিলায় সফলতার ক্ষেত্রে বিবি খাদীজা (রা)-র অকুণ্ঠ সমর্থন, সক্রিয় সহযোগিতা, সুদৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা এবং দক্ষ অভিভাবকসুলভ পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা বিশ্বনবী (সা)-কে সর্বক্ষেত্রে সফল করে তুলেছিল। প্রিয় স্বামীর সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে তিনি মিশেছিলেন পানি ও বায়ুর মত। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দিনের পর দিন হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, নির্দিষ্ট দিনে ঘরে ফিরে

www.pathagar.com

না আসতেন তখন স্বামীপ্রাণা বিবি খাদীজা (রা) অস্থির হয়ে পড়তেন। প্রিয় স্বামীর জন্য আহারাদি সংগে নিয়ে জাবালে নূরের হেরা গুহায় গিয়ে নিজ হাতে স্বামীকে খাইয়ে সাধনায় উৎসাহ যুগিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। শহর থেকে তিন মাইল দূরের হেরা গুহায় বিবি খাদীজা (রা) প্রায় প্রতিদিন বহু কষ্টে উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে ধ্যানমগ্ন স্বামীর তদারকীর জন্য আসা-যাওয়া করতেন। স্বামীর খাদ্য পানীয় বহন করতেন। এতে তাঁর স্বামীর প্রতি ছিল না কোন অভিযোগ, ছিল না সংসারের প্রতি কোন অনীহা। তদুপরি, নবুয়ত প্রাপ্তি ও মহাসত্য প্রচারের চরম সংকটের দশটি বছরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণা দিয়ে, সাহস দিয়ে, দৃঢ়তা দিয়ে আগলে রাখার কঠিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন একমাত্র বিবি খাদীজা (রা)। তাই তিনি আদর্শ স্ত্রীর ইতিহাসে অনন্যা।

নবীজির ঔরসে বিবি খাদীজা (রা)-র দুই ছেলে হযরত কাসেম (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। চার মেয়ে হযরত যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও বিবি ফাতিমা (রা) সকলেরই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কনিষ্ঠা মেয়ে বিবি ফাতিমা (রা) ভিন্ন আর কারোর সন্তান-সন্ততি প্রিয়নবী (সা)-র রক্তধারার উত্তরাধিকার নিয়ে জীবিত ছিলেন না। নবীজির ২৫ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন ছিলো অতি মধুময়। কেবলমাত্র বিবি খাদীজা (রা)-ই রসূল (সা)-কে একতরফা ভালবাসতেন না বরং তিনিও বিবি খাদীজা (রা)-কে প্রাণাধিক ভালবাসতেন।

এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ 'হযরত খাদীজা (রা)-র কথা উত্থাপিত হলে হুযূর (সা) যেন আবেগপ্রবণ হয়ে যেতেন। আবেগাপ্লুত ভাষায় তিনি বিবি খাদীজা (রা)-র বিভিন্ন গুণপনার কথা বলতে থাকতেন। একদিন আমি ঈর্ষার বশে বলেই ফেল্লাম, আল্লাহ্ তা'আলা তো এখন আপনার সান্নিধ্যে অনেক সুন্দরী স্ত্রী এনে দিয়েছেন, আমার ন্যায় কুমারী মেয়েও আপনার ঘরে আছে। অথচ আপনি এখনও সেই দাঁত পড়া বৃদ্ধার কথা এমন উচ্ছ্বাসের সাথে কেন স্মরণ করেন?' জবাবে প্রিয়নবী (সা) বলেছিলেনঃ 'আয়েশা, সত্যই আল্লাহ্ তা'আলা এখন আমার ঘরে একাধিক সুন্দরী স্ত্রী এনে দিয়েছেন। কিন্তু খাদীজা

www.pathagar.com

যা ছিলেন, তোমরা কেউ তা নও। আমার সেই সঙ্কটপূর্ণ জীবনে খাদীজা যা করেছেন তোমাদের কারোর পক্ষেই এখন তা করার সুযোগ নেই।' –যুরকানী

হযরত আয়েশা (রা)–র একটি বর্ণনাঃ হযরত রসূলুল্লাহ (সা) কখনও ছাগল যবেহ করলে তা থেকে কিছু অংশ অবশ্যই খাদীজার বান্ধবী বা আত্মীয়–স্বজনদের নিকট পাঠাতেন। –বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ

বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, ওহী নাযিলের প্রথম দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন এবং বিবি খাদীজা (রা)–কে বলতে লাগলেনঃ 'আমাকে কম্বল চাপা দাও, আমার খুব ভয় করছে।' বিবি খাদীজা (রা) ঘটনাটি শুনলেন এবং আরয করলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আপনার জন্য ভয়ের কিছু নেই। মহান আল্লাহ্ কখনও আপনাকে বিপন্ন করবেন না। আপনি অসহায়কে সহায়তা করেন, দুঃস্থ বিধবাদের খবরদারী করেন, আত্মীয়–স্বজনের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। আমার বিশ্বাস আপনি যার দেখা পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি পূর্ববর্তী নবী–রসূলগণের নিকট অবতরণ করতেন।' পরে বিবি খাদীজা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)–কে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের সাথে দেখা করেন এবং বিষয়টি তার সাথে আলোচনা করেন। ওয়ারাকা ছিলেন তৎকালীন যুগের বিখ্যাত সাধক পুরুষ। সবকিছু শুনে এই মুহম্মদ (সা)–ই প্রতিশ্রুত শেষ নবী বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। বিবি খাদীজা (রা)–ই সেই ভাগ্যবতী নারী, যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবূল করেছিলেন। বিবি খাদীজা (রা)–র মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ নিজে তাঁকে গোসল দেন। নিজ মাথার পাগড়ী দিয়ে কাফন পরান এবং কবরে দাফন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

বিবি খাদীজা (রা)–র মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ্ (সা)–র দাম্পত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায় ছিল তাঁর ৫১ বছর বয়স থেকে ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত। বিবি খাদীজার মৃত্যুর পর রসূল (সা) অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন। ঘর–সংসার

www.pathagar.com

অচল হয়ে পড়ে। বিবি খাদীজার চার মেয়ের দেখাশোনার বিঘ্ন ঘটে। প্রচার কার্য অচল হয়ে যায়। এইসব কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পুনরায় বিয়ে করতে হয়। তাঁর স্বগোত্রীয় এক মুরুব্বী মহিলা খাওলার প্রস্তাব মতে তিনি কুরায়শ বংশের সাওদা বিনতে যাম'আ নাম্নী এক বর্ষিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন বিগতা যৌবনা। তাঁর বয়স ছিল কারো মতে ৫৮, কারো মতে ৬০, আবার কারো মতে ৭০ বছর। একই দিনে তিনি বিয়ে করেন তার বিশিষ্ট সাহাবা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ছয় বছরের নাবালিকা কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে।

২. বিবি সাওদা (রা)

বিবি সাওদা ছিলেন অতীব ধৈর্যশীলা, দানশীলা, মিষ্টি মেজাজী, মধুর আচরণকারিণী, স্বল্পভাষিণী, স্বামী সোহাগিনী। নবীজির ঘর-সংসার সামলানো, চার কন্যার তদারকী এবং স্বামীর খিদমতের ব্যাপারে তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর হাসি-খুশী ও খোশমেজাজ ঘরের পরিবেশকে এমন হাস্য কৌতুকময় ও মোহনীয় করে তুলতো যা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও হাসতেন। এমনিভাবে তিনি হাস্য কোলাহলমুখর সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মন থেকে বিবি খাদীজা (রা)-র মৃত্যুজনিত শোক হাল্কা করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঘর-সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় প্রচার কাজে মনোযোগী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবীজী তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর নাবালিকা সতীন বিবি আয়েশা (রা)-র দাম্পত্য জীবনের বিকাশ সাধনে আন্তরিক সহযোগিতা করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে রাত্রি যাপনের নিজের পালা বিবি আয়েশাকে ছেড়ে দিতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পাঁচটি।

৩. বিবি আয়েশা (রা)

হিজরতের নয় বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে এবং ইংরেজি ৬১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হযরত আয়েশা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন রসূলুল্লাহ্

www.pathagar.com

(সা)-র অতি প্রিয় সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তাঁর ও আত্মীয়-স্বজনের একান্ত ইচ্ছা ও উৎসাহে ৬২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এবং হিজরীর ৩ বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর শাদী মুবারক হয়। ৯ বছর বয়সে তিনি স্বামীগৃহে গমন করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। হিজরী ৫৮ সালের ১৭ রমযান এবং ইং ৬৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ জুন, বিত্‌র নামাযান্তে ৬৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ ও তা প্রচারণার জন্য হযরত আয়েশার প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। রক্তিম বর্ণের কুমারী, সুন্দরী হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন স্ত্রীদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠা, মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দিক থেকে তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠা। তিনি অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন কুরআন-সুন্নাহ, কিয়াস, উসূল, ফিকাহ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে। তিনি আয়ত্ত করেছিলেন চিকিৎসা বিদ্যা ও শিক্ষকতার কলাকৌশল। তাঁর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল এবং ছিলেন সুবক্তা। আদর-যত্ন সোহাগে নবী-কন্যা ও নবীর মন কানায় কানায় ভরে তুলেছিলেন তিনি। ঘর সাজানো-গোছানোর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুদক্ষা। জানালায় তিনি ব্যবহার করতেন রঙ্গীন পর্দা। নবীজী তাঁকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁকে নিয়ে একত্রে একই বাসনে খানা খেতেন। হাসি কৌতুক করতেন। দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতেন। রসূল (সা)-এর ব্যবহৃত আসবাবপত্র সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতেন। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদা পরিপাটি হয়ে থাকতেন। প্রতি নয় দিনে দু'দিন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এককভাবে পেতেন। এ সময়টুকু তিনি স্বামীর সান্নিধ্যে থেকে অতি যত্ন সহকারে ব্যয় করতেন। অন্তিমকালে অপরাপর স্ত্রীগণের অনুমতি নিয়ে নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-র গৃহে অবস্থান করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যে সমস্ত মেয়েলোক ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাযির হতেন, সর্বজ্ঞানে বিভূষিতা হযরত আয়েশা (রা) রসূল (সা)-এর কাছ থেকে জেনে তাঁদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। অর্থাৎ নারী সমাজের মধ্যে দীনের প্রচারণার ক্ষেত্রে তিনি নবী করীম (সা) ও নারী জাতির মাধ্যম হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। হযরত আয়েশার বর্ণিত হাদীসের

www.pathagar.com

সংখ্যা চার হাজারেরও বেশী। আবার কেউ বলেছেন ২২১০টি। হযরত আবূ মূসা আশ'আরীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কোন জটিল মাস'আলা দেখা দিলে হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট যেতেন। তিনি এ সমস্যার কোন-না-কোন মীমাংসা করে দিতেন। -তিরমিযী

তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ৫৬ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে ৯টি শাদী সম্পন্ন হয়। নিম্নে এসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

৪. হযরত হাফসা (রা)

উম্মত জননী হযরত হাফসা (রা) ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর কন্যা। বদরের যুদ্ধের পর তিনি বিধবা হন। পরে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে শাদী করেন। তিনি ছিলেন বিদুষী। কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানে তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেন। মেজাজের উগ্রতার কারণে নবীজীর সাথে মাঝে মধ্যে তাঁর কথা কাটাকাটি হতো। কিন্তু রসূল পাক (সা) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন। পবিত্র কুরআন সংকলনে তাঁর অবদান অনেক। কুরআন-সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা দানে তিনি ছিলেন সুদক্ষা। গরীব মিসকিনের সহায়তায় তিনি ছিলেন উদারহস্ত। হিজরী ৪৫ সালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬০।

৫. হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা)

হযরত যয়নাব (রা) ছিলেন আরবের বিখ্যাত হেলাল বংশের খুযায়মার কন্যা। তিনি গরীব-মিসকিনদের আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন। তিনি বিনা মোহরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পাণি গ্রহণ করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ছিল ৫৬ বছর এবং তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। তাঁরা পরস্পর পরস্পকে খুব

www.pathagar.com

ভালবাসতেন। শাদীর কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইন্তিকাল করেন। নবীজী নিজেই তাঁর জানাযা পড়ান এবং নিজ হাতে তাঁকে দাফন করেন।

৬. হযরত উম্মে সালমা (রা)

হযরত উম্মে সালমা (রা)-র পিতা ছিলেন বিখ্যাত কুরায়শ বংশের মাখযুমী গোত্রের নেতা ধনবান ব্যবসায়ী আবূ উমাইয়া বিন মুগীরা। বদর যুদ্ধে তাঁর স্বামী নিহত হন। ৫টি সন্তান নিয়ে হযরত সালমা বিধবা হন। সন্তানদের অসহায়ত্বের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে তিনি নবীজীর সাথে ছিলেন। তখন সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে যে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিরসন হয়েছিল বিবি সালমার তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার ফলে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮টি। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁর রচিত বহু কবিতা আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ৬১ হিজরীতে কারবালা হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭. হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) ছিলেন কুরায়শ বংশের আসাদিয়া গোত্রের সর্দার জাহাশের কন্যা। মাতা ছিলেন বিশ্বনবী (সা)-র ফুফু আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইয়া। ক্রীতদাস যায়েদ ছিলেন রসূল (সা)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারী। যায়েদকে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্ত করে পোষ্য পুত্র হিসেবে বরণ করেন। ৪র্থ হিজরীতে হযরত যায়েদ (রা)-এর সাথে হযরত যয়নাব (রা)-এর বিয়ে হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অল্পদিনেই দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়। ফলে এক বছরের মধ্যে যায়েদের সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরে ৫ম হিজরীর শেষের দিকে আল্লাহ্র নির্দেশে ৩৫ বছরের বিবি যয়নাবকে রসূলুল্লাহ্ স্ত্রীত্বে বরণ করেন। হযরত যয়নাব যেমন ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না,

www.pathagar.com

তেমনি ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারিণী। তাঁর দানশীলতা, সংযম, ইবাদত-বন্দেগী, বিনয় ও মিতব্যয়িতা নবীজীকে মুগ্ধ করতো। তিনি ছিলেন হস্তশিল্পে সুনিপুণা। নিজের উপার্জন দ্বারা তিনি ভরণ-পোষণ করতেন। এমন কি তাঁর কাফনের সরঞ্জামাদিও তিনি নিজেই যোগাড় করে রেখে গেছেন। ৫৩ বছর বয়সে ২০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। 'জান্নাতুল বাকী' নামক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এ শাদী দ্বারা আঘাত করা হয়েছে তৎকালীন যুগে প্রচলিত বহু কুসংস্কারের মূলে। প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ইসলামের সাম্য-নীতি, নারী স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদাকে। নিরুৎসাহিত করা হয়েছে অর্থহীন বংশমর্যাদা ও অহংকারকে। তাঁর থেকে ১১টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৮. হযরত যুয়ায়রিয়া (রা)

হযরত যুয়ায়রিয়া (রা)-র মুসলিম-পূর্ব নাম ছিল বাররাহ। আরব সীমান্তের খ্যাতিনাম যোদ্ধা গোত্র বনি মুস্তালিকের সর্দার হারিস-এর কন্যা ছিলেন তিনি। হারিস ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জানের দুশমন। মদীনার অদূরে এক যুদ্ধে মুস্তালিক গোত্র মুসলমানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। বাররাহ্সহ উক্ত গোত্রের ছয়শত লোক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। উক্ত যুদ্ধে বাররাহ্র স্বামী নিহত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বাররাহ্র মুক্তিপণ প্রদান করেন; তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যুয়ায়রিয়া নাম রাখেন। পরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পিতাসহ মুস্তালিক গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের সীমান্ত সুরক্ষিত হয়।

বিবাহের সময় যুয়ায়রিয়া (রা)-র বয়স ছিল ২০ বছর। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, মমত্ববোধ, মধুর আচরণ সকলকে মুগ্ধ করতো। নবী পাক (সা) তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। হিজরী ৫০ সালের রবিউল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৪, মতানৈক্যে ২৫।

www.pathagar.com

৯. হযরত উম্মে হাবিবা (রা)

হযরত উম্মে হাবিবার পিতা ছিলেন কুরায়শ বংশের উমাইয়া গোত্রের সর্দার আবু সুফিয়ান। তাঁর ইসলাম-পূর্ব নাম ছিল রমলাহ। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আহবানে তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ সহ তিনি ইসলাম গ্রহণপূর্বক আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁর স্বামী মারা যান। পরে ৭ম হিজরীতে আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর ওকালতীতে নবী পাকের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। শাদীর সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর। উম্মে হাবিবার মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তৌহিদবাদে বিশ্বাস ও আমলের দিক থেকে তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবতী। এমনকি নিজের পিতা আবু সুফিয়ানকে পর্যন্ত তিনি রসূল পাকের খাটে বসতে দেননি। কারণ, পিতা ছিলেন অবিশ্বাসী। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ ও ইসলামের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতাপ্রাণ। তিনি হিজরী ৪৪ সালে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৫।

১০. হযরত সুফিয়া (রা)

হযরত সুফিয়া (রা) ছিলেন নবী পাকের ১০ম স্ত্রী। য়াহূদী কন্যা সুফিয়ার পিতা ছিলেন বনী নাসীর গোত্রের গোত্রপতি হোয়াই ইবনে আখতার। এই গোত্রটিই ছিল মুসলমানদের বড় শত্রু। খায়বারের যুদ্ধে সুফিয়ার স্বামী কেনান নিহত হয় এবং তিনি বন্দী হন। এ যুদ্ধেই কামুস দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে। বন্দিনী সুফিয়াকে মুক্ত করে দেয়া হয়। তাঁর আবেদনক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুফিয়া (রা)-র সুপারিশক্রমে বনু নাযীর গোত্রের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ বিবাহের কারণে য়াহূদীরা মুসলমানদের সাথে দুশমনী ছেড়ে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে। বিবাহের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স ছিল ৬০ বছর এবং বিবি সুফিয়ার বয়স ১৭ বছর। তিনি ছিলেন অতুলনীয়া সুন্দরী, ধৈর্যশীলা, শিক্ষিতা এবং রান্নার কাজে পারদর্শী। দানের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তিনি হিজরী ৫০ সালে

www.pathagar.com

৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসলাম ও হযরত (সা)–এর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

১১.হযরত উম্মে মায়মুনা (রা)

মক্কা বিজয়ের সফলতার লক্ষ্যে রসূল পাক হযরত উম্মে মায়মুনাকে শাদী করেন। হযরত মায়মুনা (রা) ছিলেন বিখ্যাত বীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)–এর ফুফু এবং নবীজির চাচা আব্বাসের শালিকা। ইতিপূর্বে তাঁর দু'টি বিয়ে হয়। দ্বিতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)–র সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার কথা ব্যক্ত করেন। চাচা আব্বাসের মধ্যস্থতায় এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি রসূল পাকের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। তাঁর দান ছিল অতুলনীয়। নিজের সামান্য দ্রব্য সামগ্রীও তিনি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। আল্লাহ্র ভয়ে তিনি সর্বদা ভীত থাকতেন। হিজরী ৫১ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১২. হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রা)

মিসরের সাথে রাজনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এবং ভ্রাতৃসুলভ পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে শাদী করেন। মিসরের শাসনকর্তা মিকাওকাস শুভেচ্ছাস্বরূপ স্বীয় চাচাত বোন মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে রাষ্ট্রীয় প্রথানুসারে রসূলুল্লাহ্ (সা)–র নিকট উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুসলমান করেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রপতি মিকাওকাসের উপঢৌকনের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন। মারিয়ায়ে কিবতিয়া রসূলুল্লাহ্কে এবং ইসলামকে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। তাঁরই গর্ভে রসূল পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক মহান ইসলামের প্রচার, প্রসার (বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে) ও তালিমের লক্ষ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও মানবিক কারণে নবী করীম (সা)–কে আলোচ্য বিবাহগুলো সম্পন্ন করতে

www.pathagar.com

হয়েছিল। তিনি স্ত্রীদের মধ্যে খাওয়া-পরা, সুখ-সুবিধা ও বসবাসের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সমতা বজায় রাখতেন। হাসিমুখে তিনি গৃহে ফিরতেন এবং স্ত্রীদের সালাম বলতেন। নম্রভাবে প্রত্যেক স্ত্রীর খোঁজ-খবর নিতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের সাথে হাস্য-কৌতুক করতেন। পালাক্রমে এক এক স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করলেও প্রত্যহ এশার নামাযান্তে প্রত্যেক স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে বসতেন। পবিত্র কুরআনের তালিম দিতেন। শরীআতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। মাস'আলা মাসায়েল বুঝিয়ে দিতেন। কোন কোন সময় এ মজলিশে বহিরাগত মহিলারাও অংশ নিতেন। উম্মত জননীগণের গৃহগুলো ছিল খুব ছোট। আসবাবপত্র ছিল খুবই অপ্রতুল। এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। আরাম-আয়েশের প্রাসাদ বা দামী আসবাবপত্রের তাঁরা প্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যাশী ছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দীদারের। তাঁদের খাওয়া-পরার জন্য বার্ষিক যে সামান্য দ্রব্যাদি নির্ধারিত ছিল তা থেকে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গরীব, য়াতীম, অসহায় ও বিধবাদের মধ্যে দান করে দিতেন। তদুপরি দূর-দূরান্ত থেকে আগত মহিলাদের তাঁরা মেহমানদারী করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাঁদের আরযি পৌঁছাতেন। ইসলামের নিয়ম-কানূন ও জরুরী বিষয়াদি তাঁদেরকে শিক্ষা দিতেন, যাতে করে তাঁদের এলাকাতে গিয়ে তাঁরা এ শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটাতে পারেন। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহ ছিল ইসলামের আদর্শ শিক্ষাগার, শান্তি ও সমতার নীড়, এক অনুপম ও অনুকরণীয় পারিবারিক জীবন।

www.pathagar.com

শোকের বছর

নূরজাহান বেগম

বিরহ-বেদনার অপর নামই শোক। শোককে শক্তিতে পরিণত করার মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা। শোকে ধৈর্য ধারণ করার কথা কুরআনুল করীমে রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, ধৈর্য ও সালাতের সঙ্গে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

–সূরা বাকারা ঃ ১৫৩

অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর আপনি (হে রসূল) ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দিন। যারা বিপদে পতিত হলে বলে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- আমরা তো আল্লাহ্রই আর নিশ্চয়ই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

–সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৪-৫৫

মানব জীবনে সুখ আছে, আনন্দ আছে, আছে দুঃখ-বেদনা। আছে রোগ-জ্বরা-মৃত্যু। আছে শোক। সুখে শোকর, দুঃখে সবর-এই হলো মু'মিনের জীবন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনেও বার বার শোক এসেছে। সন্তানের মৃত্যুতে শোকার্ত হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনে যে বছরটি বিশেষভাবে শোকের বছররূপে চিহ্নিত তা হলো নবুয়তের ১০ বছর। এই বছরে প্রিয়নবী (সা) তাঁর অতি আপন দু'জনকে হারান।

মহানবী (সা)-র ভীষণ বিপদসংকুল সময়েই এই দু'জন তাঁর পাশ থেকে চলে যান। একজন হলেন উম্মুল মু'মিনীন-যাঁর আশ্রয়ে, যাঁর সেবাযত্নে, এক দু'বছর নয়, ১৫টি বছর অতিবাহিত করে আল্লাহ্র নবী নবুয়তপ্রাপ্ত হন। ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভে মহানবী (সা) এবং নব্য মুসলিমগণ যাঁর সাহায্য-

www.pathagar.com

সহযোগিতায় শত্রুদের মুকাবিলা করতেন, সেই মু'মিনগণের মাতা হযরত খাদীজা (রা) নবুয়তের দশম সালে দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে পরলোকগমন করেন। তাই এই দশম সাল শোক বছররূপে দুনিয়ার মানুষের কাছে পরিচিত।

হযরত খাদীজা (রা) প্রাণপ্রিয় স্বামীর জন্যে সবকিছু ছেড়ে আল্লাহ্র দীন প্রচারের অনুপ্রেরণা যোগাতে নিজের প্রচুর অর্থ-ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করেছিলেন। নবুয়তের দশম সাল-ইসলামের শত্রুরা চারদিকে ওঁৎ পেতে আছে। প্রিয়নবী (সা) এবং স্বামীকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় রেখে তাঁকে চলে যেতে হবে-এ ভাবনায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি।

মহানবী (সা)-ও খুবই চিন্তিত হযরত খাদীজা (রা)-র জন্যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়েছেন, হযরত খাদীজা (রা)-র জন্যে সাদা মার্বেল পাথরের নির্জন বাসস্থান তৈরী আছে বেহেশতে। এই সংবাদ পেয়ে নবী (সা)-র বুঝতে বাকী থাকলো না যে, তাঁর প্রিয় সাথীর বিদায় মুহূর্ত অতি নিকটে। কী হৃদয়বিদারক সংবাদ। কি মর্মান্তিক শোক আসন্ন। কিন্তু নবীজী টললেন না। তিনি আল্লাহ্র বিধান মেনে নিলেন। আল্লাহ্র শোকরানা আদায় করলেন। প্রিয় সাথীর আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় আল্লাহ্র নবী (সা) প্রশান্ত শোকাভিভূত, মর্মাহত হয়েও অশ্রুপ্লাবিত নয়নে খাদীজা (রা)-র সেবাযত্ন করে যাচ্ছেন। আর বারবার জানতে চান, 'খাদীজা আপনার কি ভয় করছে?'

প্রিয়নবীর মনোভাব বুঝতে পারেন আল্লাহ্ তা'আলা। অহীর মাধ্যমে তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন, খাদীজা (রা)-র বিদায় মুহূর্ত আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্ধারিত। তাঁর জন্যে বেহেশতে বিশেষ খিদমতের ব্যবস্থা রয়েছে।

এই সংবাদ পেয়ে হযরত রসূলে করীম (সা) স্বস্তি বোধ করেন এবং আল্লাহ্র অপার করুণার কথা অসুস্থ খাদীজা (রা)-র নিকট বর্ণনা করেন। হযরত খাদীজা (রা) এ কথা শুনে আল্লাহ্র শোকরগুজারী করেন।

বিদায় আসন্ন। মহানবী (সা) খাদীজা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, "খাদীজা, আপনি কিছু দেখছেন কি ? আপনার কি ভয় করছে ?"

www.pathagar.com

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-র প্রথমা স্ত্রী এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনিই সর্বপ্রথম। ইসলামের ইতিহাসে এই মহীয়সী মহিলার অবদান চিরস্মরণীয়। আর এই দুইজনকে সর্বদা যিনি আড়াল দিয়ে রাখতেন, ছায়া দিয়ে রাখতেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আবূ তালিব। নবুয়তের দশ বছর অনেক দুঃখকষ্ট ভোগের পর নির্বাসিত জীবনের অবসান হয় নবী পরিবারের। সবেমাত্র শিআবে আবী তালিব থেকে মুক্তি পেয়ে আসছেন। সঙ্গে পরিবার-পরিজন এবং বৃদ্ধ চাচা আবূ তালিব। পিতৃতুল্য চাচা আবূ তালিব নির্বাসিত জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট করেছেন। আরব সিংহ আবূ তালিব শিআবে আবূ তালিবে বৃদ্ধ বয়সে যে কষ্ট ভোগ করেছেন তা নজীরবিহীন। চৌদ্দশত বছর পূর্বে মরুর লু-হাওয়ায় বৃদ্ধ এবং শিশুদের কষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জঠর জ্বালায় শুকনো চামড়া ভিজিয়ে সিদ্ধ করে খেতেন, খেতেন গাছের লতা-ছাল সিদ্ধ করে। এই সময়ই আল্লাহ্র রসূল ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ করতেন পেটে পাথর বেঁধে। আরব সিংহ বৃদ্ধ আবূ তালিব এবং আরব সম্রাজ্ঞী মালেকা ভিখেরী। রাজরাণী সিংহাসন ছেড়ে ইসলামের জন্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন জীবন গ্রহণ করেছেন কোলাহলময় লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে। পর্বতগাত্রে প্রিয় ধর্ম এবং রসূলকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্যেই এই ত্যাগ, এই কষ্ট, এই দুঃখ-যন্ত্রণা।

শত দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নবী সেখানে নিরাপদে আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারলেন। আর পতিব্রতী হযরত খাদীজা (রা) আগলে রইলেন তাঁকে।

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান। চারদিক শত্রুবেষ্টিত। অনভ্যস্ত জিনিস খেয়ে মাঝে-মধ্যেই পেটের পীড়ায় ভুগতেন নবী-পরিবার। মরুর লু-হাওয়ায় বালুর আধিক্যতায় প্রায়ই চক্ষুরোগ বেড়ে যেতো সর্বসাধারণের। এসব রোগীদের সমস্ত দাওয়া হযরত খাদীজা (রা) প্রস্তুত করতেন। মৃত ব্যক্তিদের সৎকাজ এবং অসুস্থদের হেকিমী চিকিৎসা করতেন তিনি। আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তিনি ইসলাম অনুসারীদের সেবাযত্নের সার্বিক দায়িত্ব মাথায় তুলে

www.pathagar.com

নিয়েছিলেন। বৃদ্ধা মাতা খাদীজা (রা) তপ্ত রোদে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের গাছ-গাছালি সংগ্রহ করতেন। আর নিজের হাতে ওষুধ প্রস্তুত করতেন। হেকিমী চিকিৎসায় ছিলেন তিনি পারদর্শী। পাহাড়ের ঝরনায় ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতেন গাছ-গাছড়ার শিকড়।পাচন তৈরী করে অসুস্থ শিশু-যুবকদের ওষুধ হিসেবে বিলি করতেন। হযরত খাদীজা (রা) এই নির্বাসনস্থল শিআবে আবী তালিবে ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, সেবিকা, সান্ত্বনাদায়িনী, অন্নবস্ত্র সংগ্রহকারিণী। বৃদ্ধা মা হযরত খাদীজা (রা) নওমুসলিম মহিলাদের ধর্ম বিষয়ক খুঁটিনাটি শিক্ষা দিতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্য-বস্ত্রাদি নিজ হাতে শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্যে বিলি-বন্টন করতেন। শিআবে আবী তালিবের প্রতিটি মানুষের মুখে যতোক্ষণ না খাবার তুলে দিতে পারতেন, ততোক্ষণে স্বামী-স্ত্রী পানিটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না, পতিব্রতী মহীয়সী মহিলা স্বামী এবং শ্বশুরের মুখে আহার না দিয়ে নিজে পানিও স্পর্শ করতেন না কখনো। দেশবাসীর সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা, রোগ-শোক সমস্ত কিছু তিনি নিজে দেখাশুনা করতেন আর প্রিয়নবী (সা)-কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে সদাসর্বদা ধ্যানে থাকার সুযোগ দিতেন। ইসলামের প্রথম যুগে মহানবীর একমাত্র সাধনা ছিল ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ। হযরত খাদীজা (রা)-র সেবাপরায়ণতা দেখে মাঝে মধ্যে রসূল (সা) বলতেন, 'খাদীজা, আপনার বয়স হয়েছে, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

খাদীজা (রা) প্রিয় স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'আমি জানি আপনার একদিন সফলতা আসবেই-কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে দেখে যেতে পারবো না। আপনি আমাকে দোয়া করুন আমি যেনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সেবায় নিজেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারি।'

তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।পিতৃব্য আবূ তালিবকে পিতৃতুল্য সেবাযত্ন করতেন।

আশি বছরের বৃদ্ধ আবূ তালিব। শিআবের নির্বাসিত জীবনের কষ্টে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। একদিকে প্রাণাধিক ভাইপো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিন্তা, অন্যদিকে খাদ্য দ্রব্যের অভাব, অমানুষিক শারীরিক কষ্ট, তিন বছর বন্দী

www.pathagar.com

জীবন তাঁকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। একদিন নির্বাসিত জীবনের শেষ হলো। মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য আর ভালো হলো না। বৃদ্ধ আবূ তালিব হযরত খাদীজা (রা)-র উপর নবী করীম (সা)-র দায়িত্ব দিয়ে একদিন পরলোকগমন করলেন। নবুয়তের দশম সাল ছিল এটি। দুঃখ আর সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুতে রসূলে করীম (সা) এবং খাদীজা (রা) ভেঙে পড়লেন। 'সে সময় আরবে মহানবী (সা)-এর আপনজন বলতে চাচা আবূ তালিব আর খাদীজা (রা) ছিলেন প্রধান। আরব সিংহ আবূ তালিবের মৃত্যুতে মহানবী (সা)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রা) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন বৃদ্ধ আবূ তালিব বেঁচে থাকতে মক্কার এমন কোনো প্রাণী নেই, যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনিষ্ট করতে পারে। চাচা আবূ তালিব ছাড়া স্বামীর জন্যে মক্কা নিরাপদ তো নয়ই বরং ভয়ের -তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন এখন থেকে মক্কায় আর কোনো ছায়া নেই আল্লাহর নবীর জন্যে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) বাল্যকাল হতেই চাচার আদরে সোহাগে, লালনে-পালনে বড় হয়েছেন। সেই পিতৃতুল্য চাচার তিরোধানে স্বামী-স্ত্রী শোকে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন-বেশি ভেঙে পড়লেন হযরত খাদীজা (রা)। নির্বাসিত জীবনের নির্মম দুঃখ-কষ্ট পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক খাদীজা (রা)-র স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আঘাত আর তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। নবী (সা)-র নিরাপত্তার অভাব যতোই অনুভব করতে লাগলেন দিনের পর দিন ততোই তিনি ভেঙে পড়ছিলেন। মহানবী (সা) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন খাদীজা (রা)-কে নিয়ে। জীবনের ৬০ বছর যে নারী রাজরাণী ছিলেন, যাঁর ধন-সম্পদের প্রশংসা ছড়িয়েছিল সারা আরব জাহানে-শতাধিক দাস-দাসী যাঁর হুকুমের প্রত্যাশী ছিলো, সেই রমণী বৃদ্ধা বয়সে কী কষ্টই না করেছিলেন নির্বাসিত জীবনে। সেই দুঃখ-কষ্ট আর প্রিয় স্বামীর ভবিষ্যত চিন্তায় যখন তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছিলো তা দেখে মহানবী (সা)-র আর বুঝতে বাকী থাকলো না যে, প্রিয়সঙ্গিনী অচিরেই দূরে চলে যাবেন।

www.pathagar.com

নবুয়তের দশম বছর। শোকের সাগর পেরিয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। চাচা আবূ তালিব পরলোকগমন করেছেন। চারদিকে শত্রুর পাঁয়তারা। অতীতের দিনগুলো ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। দুচোখ ফেটে কান্না আসছে আল্লাহ্‌র রসূলের-কিন্তু স্থির তিনি। বারবার স্ত্রীর মুখমন্ডলে চোখ ফেলে দেখছেন আর আকুল কন্ঠে জিজ্ঞেস করছেন, 'খাদীজা আপনার কি ভয় করছে?'

প্রশান্তির রশ্মি ছড়িয়ে আছে হযরত খাদীজা (রা)-র মুখমন্ডলে। একটু নড়লো তাঁর মুখ। আর শেষ মুহূর্তে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আকাশ-বাতাস কেঁদে উঠলো।

শোক সাগরে ভাসলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। শোকের বছর নবুয়তের দশম সাল। রসূলে করীম (সা) হারালেন পিতৃতুল্য চাচা আবূ তালিবকে এবং সুখ-দুঃখের সাথী প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা (রা)-কে। তিনি এই সালটিকে জীবনের শোক বছর বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রিয়নবী (সা)-র জীবনে এই বছরটি ছিলো দারুণ বেদনা-বিধুর বছর। শোকের বছর।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কিছুই ভাল লাগে না। ক্ষেত-খামারের কাজেই হোক, আর কুলি-মজুরের কাজেই হোক, অফিসের কাজেই হোক , আর অধ্যয়নের কাজেই হোক, এমন কি আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করতে গেলেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার, রুগ্ন ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো কাজই করা সম্ভব নয়।আমাদের প্রিয় নবী সরওয়ারে কায়েনাত তাজেদারে মদীনা সাইয়েদুল মুরসালীন রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহম্মদ (সা)-এই বিষয়টি এতো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইসলামের প্রতিটি কাজের ভেতর দিয়ে তিনি এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

ওযূ-গোসল থেকে শুরু করে, তায়াম্মুম, নামায ও রোযার ভেতর দিয়ে, সময়মত নিদ্রা ও নিয়মিত আহারের মাধ্যমে এবং মাদক-দ্রব্য বর্জনের ভেতর দিয়ে তিনি স্বাস্থ্যকে বজায় রাখার এমন কতগুলো ব্যবস্থাপনা দিয়ে গিয়েছেন, যাকে বর্তমান জগতের কম্পিউটার সিসটেমের সঙ্গে অথবা একটি পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যে মেশিন দূষিত পানির ধূলা-ময়লা-আবর্জনা ও রোগ-জীবাণুকে ছেঁকে আলাদা করে দিয়ে, বিশুদ্ধ পানি বের করে আনে সর্বসাধারণের পানের উপযোগী করে।

এবারে আসুন এর প্রত্যেকটি বিষয় আমরা পর্যালোচনা করে দেখি, কিভাবে এগুলো আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে।

আহার ও নিদ্রা

ইসলাম প্রচারের চৌদ্দশত বছর পরে, বর্তমান জগতের ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, অতিভোজনকারীর জীবন,

www.pathagar.com

স্বল্পভোজনকারীর জীবনের চেয়ে বেশী ক্ষণস্থায়ী (অর্থাৎ মোটা লোক কাজে-কর্মেও দুর্বল এবং তারা তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করে।) এর কারণ নির্ণয়ে দেখা গেছে যে, মোটা লোকের শরীরে কলেস্টরল (Cholesterol) জমা হয়, যা হৃৎপিন্ডের কাজের ব্যাঘাত ঘটায় এবং তাতে তাড়াতাড়ি মানুষের মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ডাক্তারও ছিলেন না, বৈজ্ঞানিকও ছিলেন না কিন্তু তিনি এমন সুনিপুণ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে (স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে, এসব তথ্যই তাঁর জানা ছিল, যার জন্য তিনি নিজেও সর্বদা স্বল্পাহারী ছিলেন এবং অন্যকেও স্বল্পাহারের উপদেশ দিতেন, সেই সঙ্গে আবার কেউ যাতে অনাহারে না থাকে, সেদিকেও সর্বদা সুনজর রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দাওয়াত খেতে যেয়ে অর্ধ দুম্বা ভক্ষণ করে ফেলেছেন-এমন কোন ঘটনা বা নজির তাঁর কোন শত্রুরাও কোনদিন উপস্থাপন করতে পারেনি। অথচ যিনি আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনদিন অর্ধেকটা দুম্বা একেবারেই ভক্ষণ করতে পারতেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি কোনদিনই তা করেন নি কেননা ভোগ-বিলাসী জীবন তিনি কোন দিনই পছন্দ করেন নি এবং কেউ এরূপ জীবন-যাপন করুক এটাও তিনি চান নি। তাঁর জীবনটাই ছিল আদর্শ ও বাস্তব জীবন। কোন কিছুই তিনি শুধু মুখে উপদেশ দিয়ে যান নি বরং নিজের জীবন দিয়ে সেটা তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন যে- বাস্তবেও সেটা করা সম্ভব।

রোযা

আহারের ব্যাপারটা শেষ করার আগে রোযার প্রসঙ্গটা আলোচনা করা দরকার। হুযুর করীম (সা) রমযানের রোযা ছাড়াও সারা বছরই বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোযা রাখতেন। রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে। একটা রোযা ভঙ্গ করলে তার জন্য একাধারে ৬০টা রোযা রাখতে হবে। রোযা সম্বন্ধে এতো জোর তাকীদ কেন দেওয়া হয়েছে ? এর প্রধান কারণ এই যে, অর্থাভাবে যারা অনাহারে থাকে, তাদের ক্ষুধার জ্বালা কি দুর্বিসহ তা যাতে সকলেই উপলব্ধি করতে পারে, ধনীর বাড়ীর পাশে যাতে কোন গরীব অনাহারে

www.pathagar.com

না থাকে, ধনীরা–গরীবের প্রতি যাতে সহানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং ফিত্‌রার টাকা , যাকাতের টাকা ও অন্যান্য টাকা দিয়ে যাতে তাদের সাহায্য করে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো স্বাস্থ্যগত।

রোযায় মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হয়–এটাই সর্বসাধারণের ধারণা কিন্তু এতে যে বিশেষ বিশেষ লোকের স্বাস্থ্য আরো ভাল থাকে –এ সম্বন্ধে কিন্তু অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। যে বিশেষ গ্রুপের লোক এতে বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন, তাঁরা হচ্ছেন সমাজের স্থূলকায় লোকেরা অধিক ভোজনের জন্য যাদের দেহে কলেস্টেরল বা চর্বি জমা হয়, হৃৎপিন্ডের কাজের ব্যাঘাত ঘটায় এবং মৃত্যু ডেকে আনে। রমযানের রোযায়, একমাস কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে, তাঁদের হৃৎপিন্ড আবার স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে তাদের জীবনের আয়ু বৃদ্ধি পায়। ধূমপায়ীদের জন্যও রোযা একটা বিরাট ফায়দা বহন করে আনে এরূপে যে, তাদের ফুসফুস অন্তত এক মাসের জন্য নিকোটিনের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে। কোষ্ঠ–কাঠিন্যদের জন্যও রোযা সুফল আনে। একই রাতে তিনবার আহার করা এবং ইফতারের সময় প্রচুর শরবত পান করায়, কোষ্ঠ–কাঠিন্য দূর হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের জন্য রোযা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমন কোন ফায়দা বয়ে না আনলেও এতে যে তেমন কোন ক্ষতি হয়, সেটাও প্রমাণিত হয় নি। কেননা, রমযানের রোযা রেখে কোন লোক অপুষ্টিতে মারা গেছে এমন কোন নজির নেই। তাছাড়া রোযা রেখেও যে পূর্ণ শৌর্য–বীর্যের কাজ করা যায় তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা বদরের যুদ্ধে। রমযান মাসে বদরের যুদ্ধে মাত্র তিনশত তেরজন রোযাদার মুসলমান এক হাজার কাফির শক্তিশালী বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মুসলমান তা গৌরব ভরে স্মরণ করবে।

নিদ্রা

সুনিদ্রা সুস্বাস্থ্যের সুসহায়ক। রাতে শয্যায় শুয়ে যারা শুধু ছট্‌ফট্ করে এবং অনিদ্রায় ভোগে তাদের স্বাস্থ্য কিছুতেই ভালো থাকতে পারে না। আগের

www.pathagar.com

দিন রাতে কোন কারণে অনিদ্রা হলে, পরের দিন কাজ-কর্মে কতটা ব্যাঘাত ঘটে, তা ভুক্তভোগী সবাই জানেন। কাজেই নিদ্রা হলো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বান্দার প্রতি এক বিশেষ দান বা নিয়ামত। ইসলামের বিধানই হলো, সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর রাতে ঈশার নামায পড়ে এবং আহারাদি শেষ করেই তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়া এবং প্রায় ছয় ঘন্টার প্রচ্ছন্ন ঘুমের পর সোবহে সাদেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে, ওযূ- গোসল করে প্রশান্ত মনে ফজরের নামায আদায় করা। যারা ইসলামের এই সুন্দর বিধানটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, তারা যে কতো দিক থেকে লাভবান হয়ে থাকেন, এখানে তার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

৬/৭ ঘন্টার প্রচ্ছন্ন ঘুমের পর আপনি যখন জাগ্রত হলেন, তখন মনটা আপনার আপনা-আপনি প্রশান্তিতে ভরে যায়। এর পর নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ওযূ গোসলের ভেতর দিয়ে মনটাকে পূত-পবিত্র করে, আল্লাহ্‌কে হাযির-নাযির জেনে একাগ্রচিত্তে যখন ফজরের নামায আদায় করলেন-তখন মনটাও আপনার প্রশান্তিতে ভরে উঠবে। সেই সঙ্গে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর রহমতের হাত আপনার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

এবার আপনি যে কাজেই হাত দিচ্ছেন, তাতেই আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হচ্ছে। নামাযান্তে তসবীহ্ তাহ্‌লীল (এমনকি প্রাতঃভ্রমণেও যদি বের হন) তখন সকাল বেলার আল্ট্রা-ভায়োলেট-রে (মিশ্রিত (Ultra-violet ray) যে মিঠে-কড়া সূর্যরশ্মি আপনার শরীরের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে, তাতে আপনার দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে কেরোটিন ও স্টেরল থেকে আপনার দেহে প্রচুর ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'ডি' প্রস্তুত হচ্ছে, যার ফলে আপনি চর্ম-রোগ ও রাতকানা রোগের (Toad-skin, night blindness) হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছেন। এ ছাড়া সকাল বেলায় যে কাজেই আপনি হাত দেবেন, তাতেই সোনা ফলবে কেননা, সকাল বেলায় ঠান্ডা মস্তিষ্কে (cool brain) যে কাজেই হাত দেওয়া যায়, তাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে যারা ইসলাম বিরোধী বা যারা সারারাত বিলাসিতায় কাটিয়ে সকাল বেলাটা ঘুমের ঘোরে কাটিয়ে দেয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, শ্রমের দিক থেকে আপনি তাদের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছেন। তারা সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠে যখন তাদের কাজ শুরু করবে, ততক্ষণে আপনার ৪ ঘন্টার কাজ শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি কাজের দিক থেকে তাদের চেয়ে ৪ ঘন্টা এগিয়ে আছেন।

ওযূ

আল্লাহ্‌র যে-কোন ইবাদত বন্দেগী শুরু করার আগে দেহ ও মনকে পবিত্র করার জন্য ওযূর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যখন কোন রাজা-বাদশার দরবারে যাই, তখন ভাল করে গোসল করে, সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, আতর গোলাপ খুশবু মেখে সেই দরবারে হাযির হই। আর আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সময় আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হচ্ছি। তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন, সারা আলমের বাদশাহ, কাজেই তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার আগে আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পূত-পবিত্র হতে হবে-এটাই স্বাভাবিক। শুধু হাত-পা ও মুখ পরিষ্কার করলেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে ওযূর কাজ হয়ে যায় কিন্তু নবীজী এ ব্যাপারে কতটা গভীরে প্রবেশ করেছেন, সেটাই আলোচনা করে দেখার বিষয়। হাত ধোয়া তো সবার আগে একান্ত প্রয়োজন, তাই ওযূ করতে যেয়ে নিয়তের পরই কমপক্ষে তিন বার কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়ার নির্দেশ এসেছে। এরপর গড়গড়া করে তিনবার কুল্লি করতে বলা হয়েছে, যাতে মুখে কিছু না থাকে। নাকের ময়লা দূর করার জন্য নাককেও সাফ করতে বলা হয়েছে। এরপর মুখমন্ডল ভাল করে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার পুরা হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে, ভিজা হাত দিয়ে শের মসেহ করতে বলা হয়েছে, যাতে মাথার চুলে এবং কানের পৃষ্ঠে কিছু লেগে না থাকে। সবার শেষে পা দুটিকে ভাল করে ধুতে বলা হয়েছে। ওযূ করার নিয়মগুলি এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, যাতে গোসল ব্যতিরেকেও শরীরের বাইরের

www.pathagar.com

অংশগুলো (Exposed parts) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়। এর মধ্যে প্রধান ৪টা কাজকে ফরয হিসেবে রাখা হয়েছে, যেমন কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা, মাথা মসেহ করা এবং টাকনা পর্যন্ত দুই পা ভালভাবে ধৌত করা অর্থাৎ যে সব কাজ একান্ত করণীয় সেগুলোকে ফরয হিসেবে রাখা হয়েছে, যাতে কেউ সেগুলো বাদ দিতে না পারে, কেননা এই ৪টার যেকোন একটা বাদ গেলে ওযূই বরবাদ হয়ে যাবে। ওযূর পদ্ধতিটা এত সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, যিনি ৫ বার ওযূ করে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়বেন, তাঁর চেহারাই উজ্জ্বল হয়ে পরিস্ফুটিত হবে।

গোসল

আমাদের শরীরে প্রচুর ঘাম হয় বলে, শীতের তেমন কোন প্রাধান্য নেই বলে এবং সহজে সর্বত্র পানি পাওয়া যায় বলে, আমরা প্রতিদিন গোসলে অভ্যস্ত কিন্তু সৌদী আরব এবং অন্যান্য বহু দেশে নানাবিধ কারণে সেখানকার অধিবাসীরা গোসলে অভ্যস্ত নয়। সৌদী আরবে প্রচন্ড গরম কিন্তু আবহাওয়া বিলকুল শুষ্ক বলে শরীরে কোন ঘাম হয় না আবার শীতকালে এত প্রচন্ড শীত যে, সে শীতের সঙ্গে আমাদের দেশের শীতের কোন তুলনাই হয় না। তাছাড়া মরুভূমির দেশ বলে সব জায়গায় সব সময় পানি পাওয়া যায় না। এসব কারণে অধিকাংশ লোক নিয়মিত গোসল করে না, যা শরীরের জন্য অস্বাস্থ্যকর। এই সব দিক বিবেচনা করে, হুযূরে করীম (সা) কোন কোন অবস্থায় বাধ্যতামূলক গোসলের ব্যবস্থা করে গেছেন অর্থাৎ গোসলকে ফরয করে দিয়ে গেছেন, যাতে তারা গোসল করতে বাধ্য হয় এবং দেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। গোসলের মধ্যেও তিনটা জিনিসকে ফরয করে রাখা হয়েছে, যেমন, কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা।

তায়াম্মুম

আল্লাহ্র ইবাদত করতে গেলে ওযূ-গোসলের একান্ত দরকার এবং তা করার জন্য জোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরই নবীজীর মনে চিন্তা

www.pathagar.com

এসেছে। যিনি অসুস্থ, ওযূ-গোসল করতে গেলে যার অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তিনি কি করবেন? নিজের জীবন বিপন্ন করেও কি তিনি ওযূ-গোসল করবেন ? না, ওযূ-গোসল করা গেল না বলে আল্লাহ্র ইবাদতই ছেড়ে দেবেন? এমন দু'টি কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্য তিনি তায়াম্মুমের বিধান চালু করে এমন দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতেই আসতো না। তায়াম্মুমের ব্যবস্থা করে তিনি আল্লাহ্র ইবাদতের পথও খোলা রেখেছেন, আবার পানির স্পর্শে এসে রোগীর রোগ-যন্ত্রণা যাতে বৃদ্ধি না পায় সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

নামায

সমস্ত ইবাদতের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামায, যা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তাই নামায পড়া মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। এই নামায কুরআন তিলাওয়াতের মত বসে বসে পড়ারও ব্যবস্থা করা যেত অথবা মুণি-ঋষিদের মত বৃক্ষতলায় বসে জপমালার মত তসবীহ হাতে জপ করা যেত। কিন্তু নবীজীর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং তাঁর চিন্তাধারা ছিল গভীর বা অনন্য। তাই যে নামায সারাজীবন পড়তে হবে এবং এক দিনে বারে বারে পড়তে হবে, সেটাকে তিনি অলস অথর্বের মত এক জায়গায় চুপ করে বসে পড়ে হাত পাগুলোকে স্থবির করে দিতে চাননি। বরং ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরের এক্সারসাইজ হয়ে শরীরে যাতে বেশী করে রক্ত সঞ্চালন হয়, মুসুল্লিগণ যাতে কর্মক্ষম থাকেন এবং রুজী-রোযগারের জন্য হাত-পা যাতে শক্ত-সবল থাকে, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রেখে নামাযের পদ্ধতিগুলো ঠিক করেছেন। শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য আজকাল জিমনাসিয়ামে যে সব এক্সারসাইজের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, নামাযের ভেতর দিয়েও নবীজী তার প্রায় সবগুলো ব্যবস্থাই দিয়েছেন।

প্রথমেই দেখুন, নিয়তের পরই দুই হাত উচুঁ করে কান-পর্যন্ত স্পর্শ করতে হচ্ছে, এতে হাতের একটা বিরাট এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। এরপর হাত দুটোকে নাভির উপর সুন্দর করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। সূরা তিলাওয়াতের পর যখন রুকুতে যাওয়া হচ্ছে, তখন ঘাড়ের, পিঠের ও হাতের এক্সারসাইজ হয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে, কেননা সহীহ্ রুকু করার নিয়ম এই যে, মাথা এতটা ঝুঁকতে হবে যাতে মাথা, পিঠ ও চোতড় এক লাইন বরাবর হয়ে যায়। এক হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে হাঁটুর উপর শক্তভাবে অবস্থান করে। আবার রুকু থেকে ঘাড় উঠিয়ে যখন সিজদায় যাওয়া হয় তখন হাঁটু, হাত, পা, মাথা, পেট, নাক ও কপালের এক্সারসাইজ হয়ে যায়, কেননা সহীহ্ সিজদার নিয়ম এই যে, প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে রাখতে হবে তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রেখে তার মাঝখানে মাথা রাখতে হবে এবং কপাল ও নাক দুটোকেই মাটিতে ছোঁয়াতে হবে এবং পেট এতটা উচুঁতে রাখতে হবে, যাতে পেটের নীচে দিয়ে ছোট একটা বকরীর বাচ্চা চলে যেতে পারে। নামায শেষে সালাম ফেরাবার সময় আবার ঘাড়ে ও চোখের এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোন ধর্মে এ ধরনের এক্সারসাইজ আছে কি ? এটাই হচ্ছে নবীজীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়।

মাদক–দ্রব্য নিষিদ্ধ করা

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) সবচেয়ে বেশী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন–মাদক–দ্রব্য নিষিদ্ধ (হারাম) করে। শুধু একটু নেশা হওয়া ছাড়া শরীরের উপর মাদক দ্রব্যের আর কোন রকম ফল নেই। মাদক–দ্রব্য লিভারকে ক্রমশ ধ্বংস করে দেয় এবং শেষে সিরোসিস অব দি লিভার হয়ে (Cirrhosis of the liver) রোগীর অপমৃত্যু হয় অর্থাৎ মৃত্যুর সময় রোগীর চেহারা এত বিটকাল হয় এবং মুখ দিয়ে এত বদবু বের হয় যে–নিকট আত্মীয়স্বজনও রোগীর কাছে ভিড়তে চায় না। নবীজি ডাক্তার ছিলেন না কিন্তু মাদক দ্রব্যের এইসব কু–ফল সম্বন্ধে তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন। যার জন্য তিনি ''মদ খাওয়া হারাম'' এই একটি মাত্র ধর্মীয় বাণী উচ্চারণ করে সেই সময়ে মদ খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিলেন, যখন আরব দেশের লোকেরা পানির পরিবর্তে মদ্য পান করত। বর্তমান বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে মদের এসব কু–ফলাফল দেখে পশ্চিমা দেশে, বিশেষ করে আমেরিকান সরকার দেশ থেকে মদ্যপান উঠিয়ে দেয়ার জন্য কোটি কেটি ডলার খরচ করে কত কোটি কোটি

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন ছেড়েছেন। কত মিটিং কত সিম্পোজিয়াম করেছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকের মদ খাওয়া বন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের নবীজি একটি মাত্র বাণী প্রচার করে, ''মদ খাওয়া হারাম, সুতরাং তোমরা কেউ মদ খেয়ো না"- দেশ থেকে চিরতরে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র আইন আর মানব রচিত আইনের মধ্যে কতই না পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কোন ডাক্তার ছিলেন না, কোন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, দুনিয়ার কোন ইলমই তাঁর মধ্যে ছিল না, কিন্তু তিনি এমন শিক্ষাগুরুর নিকট থেকে (জগৎ গুরু) ইলম শিক্ষা করেছিলেন এবং সেই শিক্ষার আলোকে এমন সব ধর্মীয় পদ্ধতি চালু করে গিয়েছিলেন, যা বর্তমানের বিজ্ঞানীরাও নত মস্তকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে-এর চেয়ে উত্তম আর কোন পদ্ধতি হতে পারে না এবং ইসলামের প্রত্যেকটি পদ্ধতিই যুক্তিসঙ্গত এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

www.pathagar.com

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাব্যপ্রীতি

আবদুস সাত্তার

এক

পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের সূচনা কবিতা দিয়ে এবং সব সাহিত্যের এই শাখাটিই সবচেয়ে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। আরবী সাহিত্যের বেলায়ও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মতো আরবী সাহিত্যও যখন লিখিত রূপ পায়নি তখন কবিতা ছিল মুখে মুখে কিংবা লোকে লোকে প্রচারিত অর্থাৎ মৌখিক কবিতা বা লৌকিক কবিতা অথবা বলা চলে লোক-কবিতা। পঞ্চম শতাব্দীর আল-মুহল্লিল ও হাতিম আত-তাঈ-এ এসে আরবী কবিতার লিখিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। 'সজ' বা গদ্য রচনা শুরু হয় আরও অনেক পরে।

আরবী কবিতার প্রাচীনতম ধারা 'লোককবিতার' ছিল চারটি স্তরবিন্যাস। যেমন হিদা, হিজা, রাজাজ ও কাসাস। এ সবের বাংলা করলে দাঁড়ায়; যেমন 'হিদা' কারার্তী সঙ্গীত, 'হিজা' দ্বন্দ্ব সঙ্গীত, 'রাজাজ' রণ-সঙ্গীত বা যুদ্ধ সঙ্গীত এবং 'কাসাস' কাহিনী-ধর্মী লোককবিতা বা লোকগীতি। সব কবিতার বিষয়বস্তুতেই যে অশ্লীলতা বা গ্লানিকর বর্ণনা ছিল এমন নয়। তবে ভালো কবিতার কিংবা সৎকবিতার সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম অর্থাৎ সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুতে রয়েছে যুদ্ধের পাঁয়তারা, অশ্লীলতা, কাম, ক্রোধ, সম্পদ লুণ্ঠন, অন্যের বিরুদ্ধে উস্কানি, গোলযোগ সৃষ্টি, বিপদে ফেলা ইত্যাদি যাবতীয় অকল্যাণকর বিষয়। উদাহরণস্বরূপ কিছু আরবী শব্দের উল্লেখ করছি, যেগুলো প্রাচীন আরবী কবিতার বিষয়বস্তুতে বসে কবিতাগুলোকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করেছে অনেক ক্ষেত্রে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

এহরাব–লুণ্ঠন। আসল উদ্দেশ্য অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা। কাজেই গোলযোগ সৃষ্টি করে অন্যের সম্পদ কি করে লুণ্ঠন করা যায় কবিতার মাধ্যমে তার প্রকৌশল দেখানো।

হারব–যুদ্ধ। আভিধানিক অর্থ যুদ্ধ হলেও এর অন্তরালে উত্তেজিত করা হতো ক্রোধ এবং রাগান্বিত স্বভাবকে।

হারাব–লুট–তরাজ। অন্যের সম্পদ লুট করার এমন বর্ণনার চাতুর্য যে, তখন লুটতরাজ না করে আর গত্যন্তর থাকে না।

হারিবা– লুণ্ঠিত সম্পদ। সম্পদ লুট করার প্রবৃত্তি বাড়ানোর জন্যে কবিতা ছিল পরম সহায়ক।

তাহরীব –রাগান্বিত করা। গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব বাড়াবার জন্য এমন উস্কানী দেওয়া হতো যে, গোলযোগ না করে উপায় ছিল না।

রওউন– লড়াই। গোত্রে গোত্রে লড়াইর জন্যে এমন বর্ণনা চাতুর্য থাকতো যে তখন লড়াই ছিল অবধারিত।

শারবুন–মন্দ, অকল্যাণ। এই শব্দও গোত্রে গোত্রে কোন্দল সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়ে গোলযোগের সৃষ্টি করতো।

এমনি আরও অনেক শব্দের অবতারণা করা যায়। আসল কথা, আইয়্যামে জাহেলিয়ার অধিকাংশ আরবী কবিরা অন্যায়, অত্যাচার কলহ, অশ্লীলতা ইত্যাদি অকল্যাণকর বিষয়বস্তু প্রতীকধর্মী শব্দের ব্যবহার এবং বর্ণনা কৌশলে কবিতাকে এমনই প্রাণবন্ত করে তুলতো যে,তখন অকল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া আরবদের সামাজিক পরিবেশও ছিল তখন জঘন্য প্রকৃতির। যে জন্য এই সময়কালকে 'আইয়্যামে জাহেলিয়া ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'আইয়্যামে জাহেলিয়া' যুগে উকাজের মেলাকে কেন্দ্র করে কবিদের মধ্যে চলতো কবির লড়াই বা কবিতা–যুদ্ধ। প্রতি বছর যে কবিতাটি প্রথম স্থান লাভ করতো সেই কবিতা মিসরের মিহি কাপড়ে সোনার হরফে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হতো পবিত্র কা'বার গায়ে। এভাবে সাতটি কবিতা পর পর প্রথম স্থান লাভ করে এবং সাতটি কবিতার সংকলকই 'সাব আ' মু আল্লাকা'।

'সাবআ' মু' আল্লাকার সাতজন কবি হলেনঃ ইমরাউল কায়েস, ত্বরাফা, জুহায়ের বিন আবূ সালমা, লবীদ, আমর বিন কুলসুম, আনতারা বিন শাদ্দাদ, নাবিগা বিন জুবিয়ানী প্রমুখ। বলা বাহুল্য 'সাবআ' মু'আল্লাকা'-খ্যাত কবিতাসমূহে রয়েছে 'জাহেলিয়া' সঞ্জাত মনোভাব , অশ্লীলতা এবং রুচি বিকৃতির পরিচয়। এসব ছাড়াও আরবে তখন ছিল গণকদের প্রাদুর্ভাব অতিমাত্রায়।

কবি ও গণক উভয় সম্প্রদায় মিলে সামাজিক পরিবেশে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যে, তখন নতুন কিছু বললেই ধরে নেওয়া হতো তা কবির মনগড়া ও মিথ্যা আশ্রিত বক্তব্য কিংবা গণকদের বানোয়াট বর্ণনা। রসূল করীম (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তাঁর আদর্শ শিক্ষা এবং পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচারিত হতে থাকে, তখন বিরোধী দলীয় লোকেরা নবী করীম (সা)-কে কবি এবং গণক বলে প্রচারণা শুরু করে দিলো। শুধু নবী করীম (সা) কেন, তাঁর অনুসরণকারীদেরও তারা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকলো। রসূলে করীম (সা) অবশ্যি অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে তাদের ভুল ধারণা নিরসন করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। কিন্তু তাদের পাপ-মনোবৃত্তি অব্যাহতই রইলো। ঠিক এমনি মুহূর্তে নাযিল হলো 'সূরা আশ-শু'য়ারা'। এই সূরায় আছে মোট ২২৭টি আয়াত এবং মোট রুকু ১১টি। বলা যায়, ২২১ আয়াত থেকে ২২৬ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে পাপ, শয়তান এবং পাপাচারে লিপ্ত কবিদের সম্পর্কে। আয়াতগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

২২১. হাল ওনাব্বেয়ুকুম আলা মান তানাযযালুশ শায়াতিন-হে লোকেরা, আমি কি বলবো শয়তান কাদের উপর অতিমাত্রায় আসর করে বা অবতীর্ণ হয় ?

২২২. তানাযযালু আলা'কুল্লি আফাকিন্ আসিম-তারা অর্থাৎ শয়তান আসর করে বা অবতীর্ণ হয় পাপাচারী, অন্যায়কারী ও বিবেকহীনদের উপর।

www.pathagar.com

২২৩. ইউয়ুলকুনাস্ সামআ' ওয়া আকসারাহুম কাজেবুন- তারা আজগুবি মিথ্যা অন্যের কানে পৌছে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী।

২২৪. ওয়াশ শোয়া'রায়ু ইয়াত্তাবেয়ুহুমুল গাউন-আর কবিদের কথা। তাদের অনুসরণকারী হচ্ছে বিভ্রান্ত লোকেরা।

২২৫. আলাম্ তারা আন্নাহুম ফি কুল্লি ওয়াদেইয়্যাহিমুন-তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে তারা প্রান্তরে প্রান্তরে পাহাড়ে-পর্বতে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করে ?

২২৬. ওয়া আন্নাহুম ইয়াকুলুনা মা লা তায়াল্লামুন-এবং তারা এমন সব কথাবার্তার অবতারণা করে, যা তারা নিজেরাও করে না ।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে দুটো ধারা সুস্পষ্ট। একটি সত্য (reality) এবং অপরটি অসত্য (unreality) । অসত্যের নায়ক শয়তান যাদের উপর আসর করতো, কেবল তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল মহান আল্লাহ্র এই অমিয় বাণী।

উল্লেখ্য, ২২৫ আয়াতে বলা হয়েছে, কবিরা পথে-প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করে। 'আইয়্যামে জাহেলিয়া'র অধিকাংশ কবিদের স্বভাবেই ছিলো এই রীতি এবং মদ, মাংস, নারী সম্ভোগ ছিল তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ শানফারাও ইমরাউল কায়েসের নাম উল্লেখ করা যায়। ইমরাউল কায়েসের 'সাবআ'মু'আল্লাকা'-খ্যাত কবিতা থেকে কয়েকটি লাইনের অনুবাদ পেশ করছি। যেমনঃ 'অনেক কুমারী নারী মুরগীর ডিমের মতোন/দাগহীন দেহের সৌষ্ঠব/আর কোনদিন ভুলে/ অন্য পুরুষের পদক্ষেপ পড়েনি কখনো/যাদের তাঁবুতে/নির্বিঘ্নে করেছি 'খেলা' সেইসব রমণীর সাথে।' এখানে এই 'খেলা' কিন্তু রমণক্রিয়া হিসাবে আরবীতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা আবশ্যক, পবিত্র কুরআনের বাণীতে এই ধরনের বিভ্রান্ত কবিদের প্রতিই ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাব বিশেষ করে নবুয়ত প্রাপ্তির পর উকাজের মেলার কবিতা-যুদ্ধের অবসান ঘটে। তখন নবী করীম (সা)-এর অমিয় বাণী শুভ শিক্ষা, আদর্শ এবং পবিত্র কুরআনের বাণী আরববাসীদের মনের আকাশে

www.pathagar.com

এক অভিনব আলোর উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়। ফলে কবি সম্প্রদায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূলে করীম (সা)-এর আদর্শ তাঁদের কাব্যকর্মে রূপায়িত করতে নিবিষ্টচিত্ত হলেন। রাসূলে করীম (সা) নিজেও কবিতার সমঝদার হয়ে উঠলেন। এমনকি প্রতিভাবান কবিদের পুরস্কৃত করে তাঁদের কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি জানাতে শুরু করলেন।

তখন কবিরা যে কিভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন 'সাবআ'মু'আল্লাকা'-খ্যাত চতুর্থ কবি লবীদ বিন রাবিয়াহ্-এর ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। কবি লবীদ রাসূলে করীম (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির বিশ বছর পর অর্থাৎ তাঁর বয়স যখন ১০০ বছর তখন তিনি নবী করীম (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ৫৫ বছর জীবিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি এরূপ কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। কেন তিনি কবিতা লেখেন না, এ ধরনের প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন, নে'মা বাদলাল কুরআন'-অর্থাৎ কবিতার পরিবর্তে আমি কুরআনের নিয়ামত পেয়েছি।

আসলে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তদানীন্তন আরবী ভাষাগর্বী আরব সমাজের সামনে ছিল এক অনমনীয় চ্যালেঞ্জস্বরূপ। কেননা রাসূলে করীম (সা)-এর মুখনিঃসৃত আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যে মানব রচিত নয় এই প্রমাণ তখনকার কবিকুলই একজোট হয়ে দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, সূরা 'আল কাওসার'-এর ছোট একটি আয়াত লিখে পবিত্র কা'বার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল এর সম মর্যাদা, সম ছন্দ এবং সমপরিমাণ আর একটি সমিলের লাইন লিখে দিতে। আয়াতটি ছিল : 'ইন্না আতায়না কাল কাওসার' [নিশ্চয় আমরা তোমাকে কাওসার (তৃপ্তিকর কল্যাণ) দান করেছি।]

আমন্ত্রণক্রমে আরবের শ্রেষ্ঠ কবিকুল একত্রিত হলেন এবং অনেক চিন্তাভাবনা করলেন কিন্তু কেউ কিছু লিখতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি লবীদ বিন রাবিয়াহ্ আয়াতটির নীচে একই ছন্দে এবং একই মাত্রায় লিখলেন : লায়সা হাযা কালামুল বাশার' (এটা কোনো মানব রচিত ছত্র নয়।)

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় তাঁরা পরাজয় স্বীকার করে আল্লাহ্র অকাট্য বাণী একজোট হয়ে স্বীকার করে নিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ছিলেন কবিতার অত্যধিক সমঝদার। 'সাবআ'মু'আল্লাকা-খ্যাত কবি ইমরাউল কায়েস-এর কবিতা ছিল অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট কিন্তু বর্ণনার পারিপাট্য, উপমা গ্রহণের রীতি এবং প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতা তাঁর কবিতাকে শুধু মোহময় করেনি, করেছে আকর্ষণীয়। আইয়্যামে ইসলামিয়া যুগে হযরত উমর (রা) এবং হযরত আলী (ক) পর্যন্ত তাঁর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন; এমনকি নবী করীম (সা) ইমরাউল কায়েসকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করলেও তাঁর কাব্যকর্মের প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন ঃ 'ইন্না মিনাল বায়ানিল সিহরান ওয়া ইন্না মিনাল শি'রীল হিকমাইন ওয়া কাল হিসমান'-অর্থাৎ 'নিশ্চয় তাঁর ভাষায় রয়েছে সম্মোহনী শক্তি এবং কাব্য-কর্মে রয়েছে বর্ণনার পারিপাট্য।' এই মন্তব্যে কি রাসূলে করীম (সা)-এর কাব্য প্রীতি বিধৃত নয় ?

আসলেই রাসূলে করীম (সা) ছিলেন কবিতার ভীষণ সমঝদার এবং প্রতিভাধর কবিদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করতে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। কবি কা'ব বিন জুহাইর-এর ঘটনা উল্লেখ করলেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবি কা'ব ছিলেন রাসূলে করীম (সা)-এর ঘোর বিরোধী। এমন কি তাঁর জীবন নাশেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলা যায়, শেষ পর্যন্ত কবি কা'ব নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং নবী করীম (সা)-এর ক্ষমা পাবার যোগ্যতা অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি নবী করীম (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতপর রচনা করলেন রাসূলে করীম (সা)-এর প্রশংসায় অমর কাব্যগ্রন্থ 'বানাত সু'আদ'। এক শুভ মুহূর্তে এই কাব্যগ্রন্থ কবি কা'ব প্রথম থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীদের সামনে। সবাই থ' বনে গেলেন এবং রাসূলে করীম (সা) নিজেও। এই কবিতা পাঠ করতে করতে যখন কা'ব উচ্চারণ করলেন; 'ইন্নার রাসূলা লা নূরুন ইয়াস

www.pathagar.com

তাদাবিহী/মহান্নাদুন মিন সুয়ূফিল্লাহি মাসলুলু। (অর্থাৎ নিশ্চয়, রাসূল তুমি ঝলসানো আলোর তলোয়ার/ঘুচায়েছ বিশ্ব হতে পাপের সকল অন্ধকার।)

লাইন দুটি উচ্চারণ করেই কবি কা'ব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। উপস্থিত সবাই তখন আনন্দে বিহবল, বিভোর, রাসূলে করমী (সা)-ও তখন মুগ্ধচিত্তে কবি কা'বকে উপহার প্রদান করলেন নিজের কাঁধ থেকে অতি মূল্যবান 'বুরদা' বা ডুরে কাঁটা চাদর। এতে শুধু রসূলে করীম (সা)-এর কাব্য-প্রীতিই প্রকাশ পায়নি-কবি কা'বও অমর হয়ে আছেন কাব্য-কৃতির জন্য পুরস্কৃত হয়ে।

শুধু কি কবি কা'ব ? কবি লবীদ, হাসান বিন সাবিত, কা'ব বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা কবি কা'বের মতো চাদর পুরস্কার পাননি বটে, তাঁরা পেয়েছিলেন নবী করীম (সা)-এর ভালোবাসার পুরস্কার। কারণ তাঁরা তাঁদের উৎকৃষ্ট এবং সৎ-কাব্যকর্মের জন্য সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এটাও কি কম পুরস্কার ?

তদুপরি 'কাসিদায়ে বুরদা'-এর লেখক মুহাম্মদ শরফুদ্দীন ইবনে সায়ীদ আল-বুসিরী কাসিদা সমাপ্ত করে যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে লাভ করেন রাসূলে করীম (সা)-এর বুরদা বা চাদর। এটাও কি রাসূলে করীম (সা)-এর কাব্য-প্রীতির নিদর্শন নয় ?

বিশ্ববিখ্যাত না'ত 'বালাগাল উলা বি কামালিহী'-এর রচয়িতা মহাকবি শায়েখ সাদীও স্বপ্নে পান রাসূলে করীম (সা)-এর দর্শন লাভ এবং চার লাইনের এই নাত-এর চতুর্থ লাইন যোগ করা হয় রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশে। জানা যায় বালাগাল উলা বেকামালিহি। কাশাফাত দোজা বে জামালিহী। হাসুনাত জামিউ খিসালিহী' এই তিন লাইন লিখে শায়েখ সাদী অপেক্ষা করছিলেন বার বছর সমছত্রের চতুর্থ লাইন লিখতে। বার বছরেও তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পরে রাসূলে করীম (সা) তা পূর্ণ করেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে এই বলে, লিখুন, 'সাল্লুআলায়হি ওয়ালিহী'।

এমনি আরও অনেক ঘটনা আছে। উদাহরণস্বরূপ ফারসী ভাষায় কবি জামী, আমির খসরু দেহলবী প্রমুখের নাম করা যায়। যাঁদের সংগে রাসূলে

www.pathagar.com

করীম (সা)-এর সাক্ষাত ঘটেছিল স্বপ্নের মাধ্যমে এবং কবিতাকে কেন্দ্র করে। আরও অনেক কবি আছেন নাম না জানা-তাঁদের কথা অদৃশ্য রয়ে গেলো। এসব আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় রহস্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। পৃথিবী রহস্যময় এবং এসবও কম রহস্যপূর্ণ নয়।

দুই

রাসূলে করীম (সা) যে কবিতার সমঝদার ছিলেন তার আরও অনেক প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। যেমন, তিনি অন্যের মুখে কবিতা আবৃত্তি শুনতে পছন্দ করতেন। হযরত উমর (রা) এবং হযরত আলী (ক) তাঁকে প্রায়ই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আরও আবুল ফারাজ ইসফাহানী রচিত 'কিতাবুল আগানী' (৩য় খন্ড, পৃ. ১৮৯-৯২)-এর বরাত দিয়ে বলা যায়, একবার আমর বিন আশ্শারীয়া রাসূলে করীম (সা)-এর সম্মুখে কবি উমাইয়া বিন আবিস সাল্তের কাসিদা পড়ে শুনাচ্ছিলেন। রাসূলে করীম (সা) 'চালিয়ে যাও' বলে মন্তব্য করেছিলেন, 'আর, কবিতা শুনে মনে হয় উমাইয়া তো কাব্যের মাধ্যমে প্রায় মুসলমান হয়ে গেছে।'

আরও একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় ইবন আবদু রাব্বিহী রচিত 'ইবৃদুল ফরীদ গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায়। সেখানে বলা হয়েছে রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ 'তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের কবিতা শিখাও, এতে তাদের জবান মিষ্টি ও সুরেলা হবে।'

আরও উল্লেখ করা যায়, রাসূলে করীম (সা)-এর অন্তরটা ছিল কোমল, রসাল এবং কবি-স্বভাবের। তিনি মাঝে মাঝে কবিতার 'মিসরা' (দুই লাইনের কবিতা) তৈরী করে নিজে নিজে আবৃত্তি করে তৃপ্তি পেতেন। 'জার্নাল অব রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৯০১, পৃ. ২০৭-২১৫) পত্রিকার একটি নিবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তাছাড়া 'সহীহ্ ইবনে হাব্বান' হাদীস গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে রাসূলে করীম (সা) রচিত কয়েকটি 'মিসরা'র উল্লেখ করছিঃ

ক. আনা নাবীউন লা কাজিব
আনা ইবন আব্দ ইল মুত্তালিব,

www.pathagar.com

[আমি কিন্তু নবী, নই কো মিথ্যুক,
মুত্তালিবের বংশ আমি সবাই জানুক।]

খ. আতাইনা কুম আতাইনা কুম
ফা হাইয়ানা ওয়া হাইয়াকুম।

[আমি তো এসেছি আমি তো এসেছি
তোমাদের কাছে,
দীর্ঘজীবী হই যেন তোমরা ও আমি
আল্লাহ্র ইচ্ছায়।]

গ. ইন্ আন্তা ইল্লা ওয়া সবৃউ দুমিতি
ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি মা লাকিতি।

[তুমি যদি হয়ে থাকো রক্তিম আঙুল
তাহলে গিয়েছ তুমি আল্লাহ্র রাস্তায়।]

উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে বলা যায়, রাসূলে করীম (সা) শুধু কাব্য-প্রেমিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বভাবে এবং আচরণে কবি-মনের অধিকারী।

আরও কিছু কথা আছে। রাসূলে করীম (সা) কোন্ ধরনের কবিতা পছন্দ করতেন ? অথবা কোন্ ধরনের কবিতার প্রতি ছিল তাঁর আসক্তি? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবি লবীদ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পবিত্র কুরআন হাতে পান তখন তিনি কবিতা লেখা একরূপ ছেড়েই দিয়েছেন। তবু মাঝে মধ্যে যা তিনি লেখতেন তা ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উদ্ভাসিত এবং ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত। যেমন লবীদের দুটো লাইনঃ

আ লা কুল্লো শাইয়িন মা খালাল্লাহ বাতেলুন
ওয়া কুল্লো নাঈমু লা মুহালাতা জায়েলুন।

www.pathagar.com

[সকলি বিনষ্ট হবে একমাত্র আল্লাহ্ অক্ষয়,

সুখ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী আসলে ওসব কিছু নয়।]

এই ধরনের কবিতাই ছিলো রাসূলে করীম (সা)-এর অতি পছন্দনীয় এবং তিনি সেই সব কবিদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন, যাঁদের কাব্য-ভাবনায় ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পর্শ, মানবতা ও নৈতিকতার স্বাক্ষর, ইসলামী আদর্শের উন্মাদনা এবং চিরন্তন গুণের মহিমা।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা

মওলানা মুহম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

একটি বিখ্যাত উক্তি আছে যে, 'লানাবিয়া ইল্লা বিল মু'জিযাত, ওয়ালা ওলিয়্যা ইল্লা বিল কিরামত'। অর্থাৎ 'মু'জিযা ছাড়া নবী নেই, কারামত ব্যতীত ওলী নেই'। –কথাটি সত্য। নবী ছাড়া অন্য লোক যা করতে পারে না তা হলো মু'জিযা। এতে যদি চ্যালেঞ্জ থাকে তবে তা নবীগণের জন্যই খাস হবে। আর চ্যালেঞ্জ না থাকলে তা হলো কারামত, যা দিয়ে আউলিয়া ও নেক বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন তাঁকে সম্মানিত করেন । মু'জিযা হলো এমন যেমন আল্লাহ্ মানুষকে বলেছেন--'তোমরা নবীকে সত্য জান ও তাঁর প্রতি ঈমান আন, সে যা বলে বিশ্বাস কর ।' মু'জিযাই পার্থক্য করে সত্য নবী ও অসত্য নবীর মধ্যে।

মু'জিযা বাক্যটি কুরআনে উল্লিখিত হয়নি, কুরআনুল করীমে এর পরিবর্তে 'আয়াত' বা নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে । মু'জিযা হলো নবুয়তের প্রমাণ ও আলামত।

ইমামুল আম্বিয়া প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে মু'জিযা আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন তা সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন সকল আম্বিয়া কিরামের মু'জিযার চাইতে অনেক বেশি, গুণগত দিক দিয়ে তা অনেক শক্তিশালী ও উচ্চ।

একজন আশেকে রসূল বলেছেন এবং তিনি যথার্থই বলেছেন--

'জাঁহাকে সারে কামালাত এক তুঝ মেঁ হেঁ/ তেরা কামাল কিসীমে নেঁহী মগর দু'চার।' অর্থাৎ 'হে প্রিয় নবী (সা), সারা বিশ্বের গুণাবলী সমষ্টিগতভাবে

www.pathagar.com

আপনার মধ্যে বিরাজিত। কিন্তু আপনার গুণাবলী দু'চারটি ব্যতীত কারো মধ্যে পাওয়া যায় না।'

আর একজন রসূল প্রেমিক বলেছেন-'হুসনে ইউসুফ, দমে ঈসা, ইয়াদে বায়যা দারী/আঁছে খোবাঁ হামাদারন্দ তু তানহা দারী।' অর্থাৎ 'ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য, ঈসা (আ)-এর ফুঁক ও মূসা (আ)-র শুভ্র হাতের মু'জিযা আপনার মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু অন্যদের মধ্যে যা গুণরাজি রয়েছে সেসব সমষ্টিগতভাবে আপনার মধ্যে বিরাজিত।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এক হাজারের মতো মু'জিযা দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমরা এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

সর্বাপেক্ষা উচ্চতর মু'জিযা হলো আল-কুরআনুল করীম

কুরআন আল্লাহ্র কালাম, যা ওহী মারফত তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেছেন। কুরআন প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ। এর শব্দ, বাক্য গঠন ও অদৃশ্য জগতের খবরাদি সবই মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মানুষ ও জিন্ জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তারা যেন তাদের সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে সম্ভব হলে এ কুরআনের মতো কুরআন অথবা দশটি সূরা কিংবা একটি সূরা অথবা একটি আয়াত তৈরি করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। এ চ্যালেঞ্জ আজও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন- 'বলো, যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয়, তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ কুরআন আনতে পারবে না। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৮

www.pathagar.com

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আন এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো।

যদি তোমরা আনতে না পারো, আর কখনোই আনতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় করো, মানুষ আর পাথর হবে যার ইন্ধন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়েছে।" —সূরা বাকারা : ২৩–২৪

কুরআনের অনুরূপ কালাম সৃষ্টি করা যে তাদের পক্ষে অসম্ভব আল্লাহ্ তা'আলা তা স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন। চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। তাই কুরআন চিরন্তন মু'জিযা, শাশ্বত নিদর্শন, ফলে ইসলাম চিরস্থায়ী দীন হিসাবে টিকে থাকবে। কারণ তার মু'জিযা চিরন্তন।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কাবাসীরা আল্লাহ্র রসূলকে বললো, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আমাদের কোন নিদর্শন দেখান। তিনি চাঁদকে দু' টুকরো করে দেখালেন। মুতয়িম বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)–র সময় চাঁদ বিদীর্ণ হয় এবং তা দু'টুকরো হয়ে যায়। তার এক খন্ড এ পাহাড়ে ও আর এক খন্ড সে পাহাড়ে দেখা গেল; তারা তা দেখে বললো, মুহম্মদ আমাদের যাদু করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে :

"কিয়ামত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে, তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু।' তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল–খুশির অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে।"

—সূরা কামার : ১–৩

www.pathagar.com

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'আয় বৃষ্টি বর্ষণ

অনাবৃষ্টির কারণে একবার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, ফসল বিনষ্ট হল, পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিল, মানুষ হয়ে উঠলো অতিষ্ঠ। প্রিয় রসূল (সা) মসজিদুন্নবীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে আরয করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমাদের সম্পদ বিনষ্ট হলো, আয়ের উপায় বন্ধ হয়ে গেল এবং উটের চলাচল থেমে গেল। বারিবর্ষণের উদ্দেশ্যে আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। সে সময় প্রিয় রসূল (সা) তাঁর দু'হাত তুলে দু'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্, আমাদের জন্য বারিবর্ষণ করুন, হে আল্লাহ্, আমাদের জন্য বারিবর্ষণ করুন, হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য বারিবর্ষণ করুন। হযরত আনাস (রা) বলেন, তখন আকাশে মেঘখন্ড বা অন্য কোন কিছু ছিল না। আমাদের ও সালা' পর্বতের মধ্যে কোন বাড়িঘর ছিল না। হঠাৎ সে পর্বতের পিছন দিক থেকে ঢালের মতো মেঘখন্ড প্রকাশিত হলো, মাঝ আকাশে উঠে সে মেঘ ছড়িয়ে গেলো। এরপর বৃষ্টি বর্ষালো। আল্লাহ্র কসম, ছয়দিন পর্যন্ত আমরা সূর্যের মুখ দেখিনি। পরবর্তী জুম'আতে সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। প্রিয় রসূল (সা) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো এবং বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্, সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল, পথঘাট টুটে গেল, বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। প্রিয় রসূল (সা) দু'আর জন্য উভয় হাত উঠালেন, এরপর বললেন, হে আল্লাহ্, আমাদের উপরে নয়, আমাদের চতুঃপার্শে, হে আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষিত হোক–ছোট ছোট টিলার উপর, পাহাড়ের চূড়ায় এবং গাছপালা উৎপন্ন হওয়ার স্থানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, এর পর মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আকাশ পরিচ্ছন্ন হলো এবং আমরা সূর্যের আলোতেই পথে বের হলাম।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'আয় বৃষ্টি বর্ষণের মু'জিযা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। এ হলো আসমানী মু'জিযা, যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ

www.pathagar.com

হওয়াটা আসমানী মু'জিযা। এতে আল্লাহ্‌র কুদরত ছাড়া অন্য কারো দখল নেই। এ মু'জিযা প্রিয় নবী (সা)-র নবুয়ত ও রিসালাতের নিদর্শন, এ ধরনের মু'জিযা একাধিকবার প্রকাশিত হওয়াতে সাহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শানে রচিত আবূ তালিবের এ কাসিদাটি বারবার পাঠ করতেন—

'ওয়া আবয়াযু ইয়ুস্‌তাস্‌কাল গামামু বিওয়াজহিহি-ছিমালুল য়াতামা ইসমাতুল্লিল আরামিলি।' অর্থাৎ-'প্রিয় রসূল (সা)-এর শোভাময় চেহারার অছিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, আর তিনি হলেন য়াতীমের অভিভাবক এবং বিধবার রক্ষক।'

প্রিয়নবী (সা)-র আঙ্গুল মুবারক থেকে ফুটে পানি বের হওয়া

প্রিয়নবী (সা)-র আঙ্গুল মুবারকের মাঝ থেকে ফুটে পানি বের হতো, এটা নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী (সা)-র খাদিম হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি দেখেছি আসরের সালাতের সময় হয়ে গেছে, লোকেরা ওযূর পানি অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হলো। একটি পাত্রে প্রিয় রসূল (সা)-এর কাছে সামান্য পানি আনা হলো, তিনি সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে তা থেকে ওযূ করার নির্দেশ দিলেন। আমি প্রিয় রসূল (সা)-এর অঙ্গুলির মাঝ থেকে ফুটে পানি বের হতে দেখলাম। লোকেরা সেই পানি দিয়ে ওযূ করলেন। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও তা থেকে ওযূ করলো। কাতাদা (রা) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা তখন কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, তিন শত লোকের কাছাকাছি।

এ ঘটনা হচ্ছে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট মু'জিযা। কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সাধারণত অঙ্গুলির ফাঁক থেকে পানি বের হওয়ার প্রচলন ও নিয়ম নেই। এ হলো নবুয়তের নিদর্শন-এ ঘটনাটি ঘটেছে মদীনার বাজারে। অন্তত তিন শত সাহাবী এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার কূপ থেকে প্রচুর পানি উঠা

হিজরী ষষ্ঠ সালে প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর চৌদ্দশত সাহাবীসহ হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে একটি পানির কূপ আছে; সে কূপ থেকে সকলেই পানি তুলেছেন, আর যা অবশিষ্ট ছিল তা বড় জোর এক গ্লাস পরিমাণ পানি হবে। তাঁরা পানি কষ্টের আশংকায় শংকিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা এ আশংকার কথা প্রিয়নবী (সা)–র কাছে প্রকাশ করলেন। প্রিয় রসূল (সা) এসে কূপের মুখে বসলেন এবং কিছু পানি চেয়ে নিলেন। পানি মুখে নিয়ে তিনি কুলি করে সে পানিটি কূপে ফেললেন, অল্পক্ষণ পর দেখা গেল সে কূপ পানিতে পরিপূর্ণ। সাহাবীরা (রা) সেখান থেকে পানি পান করলেন, তাঁদের পাত্র ও মশক ভর্তি করলেন। আর তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত জন। এঁরাই 'বায়'আতে রিদওয়ানে শরীক সাহাবায়ে কিরাম, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

"যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্র বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর।" –সূরা 'ফাত্হ' ঃ ১০

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

"মু'মিনরা যখন গাছতলায় তোমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন ; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।" –সূরা ফত্হ ঃ ১৮

যে কূপে এক পাত্র পরিমাণ পানি ব্যতীত কোন পানি অবশিষ্ট ছিল না সেরূপ একটি কূপ থেকে সেনাবাহিনীর সকলেরই পানি পান করা, ওযূ গোসল করা, মশক ও অন্যান্য পাত্রে পানি ভরে নেওয়া নবুয়তের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছু নয়। এ নিদর্শনের আহ্বান হলো, এ মু'জিযা যাঁর থেকে প্রকাশ পেল তোমরা তাঁকে রসূল মেনে নাও, তিনি যে আহবান জানাচ্ছেন তোমরা তা কবূল কর, কারণ তিনি তোমাদের কাছে প্রেরিত সত্য নবী।

www.pathagar.com

প্রিয় রসূল (সা)—এর বরকতে সাহাবীদের এক জামাত একটি মাত্র ক্ষুদ্র পাত্র থেকে দুধ পান করে তৃপ্ত হন

ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে। তিনি বলেন, 'অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় আমি মাটির সাথে আমার বুক জড়িয়ে রাখতাম, পেটে পাথর বেঁধে নিতাম। ক্ষুধার প্রচণ্ডতার এমন একটি মুহূর্তে আমি যাতায়াতের পথে বসে থাকলাম। সে পথ দিয়ে আবূ বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আশা ছিল তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। এরপর উমর (রা) আসলেন। আমি তাঁর কাছেও কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। খেয়াল ছিল তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। এরপর প্রিয়নবী আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমার চেহারার অবস্থা ও অন্তরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা, আমি বললাম, লাব্বাইকা, ইয়া রসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন, এসো। গৃহের কাছে পৌছার পর আমি অনুমতি চাইলাম, অনুমতি দেয়া হলো। আমি একটি পাত্রে দুধ দেখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ তোমরা কোথা থেকে পেলে। তাঁরা বললেন, অমুকে আমাদের কাছে হাদিয়া পাঠিয়েছেন। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, হে আবূ হির ! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন, তুমি যাও, সুফ্ফাওয়ালাদের ডেকে নিয়ে এসো। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সুফ্ফার বাসিন্দারা হলেন ইসলামের মেহমান। তাঁদের কোন পরিজন ও সম্পদ ছিল না। প্রিয় রসূল (সা)—এর কাছে কোন হাদিয়া আসলে তিনি তা থেকে তাঁদের কাছে একটা অংশ পাঠিয়ে দিতেন।আর সাদাকা আসলে তিনি তার সবটাই তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি নিজে কিছুই রাখতেন না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমার দুঃখ হলো। কারণ আমার আশা ছিল এ দুধ পান করে আজকার দিনটা কোন মতে অতিবাহিত করবো। আমি মনে মনে বললাম, আমিই তাঁদের

www.pathagar.com

ডেকে আনবো এবং তাঁদের মধ্যে দুধ বিতরণ করবো, এ সামান্য দুধ তাঁদের মধ্যে বিতরণ করার পর আমার জন্য আর কিইবা অবশিষ্ট থাকবে ? কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল (সা)-এর আনুগত্য ব্যতীত উপায় নেই। তাই অবশেষে আমি গিয়ে তাঁদের ডেকে আনলাম। তাঁরা আসলেন, অনুমতি প্রার্থনা করলেন। প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো, তাঁরা নবীগৃহে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। এরপর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, দুধের পাত্র নিয়ে যাও এবং এদের মধ্যে বিতরণ কর। আমি পাত্র নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করতে আরম্ভ করলাম। একজন পাত্র তুলে নিতেন এবং দুধপান করে তৃপ্ত হতেন, এমন কি তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও দুধ পান করে তৃপ্ত হলেন। আমি পাত্রটি প্রিয়নবী রসূল করীম (সা)-এর হাতে তুলে দিলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন। পাত্রে সামান্য দুধ অবশিষ্ট ছিলো। তিনি মাথা তুললেন এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসলেন আর বললেন, হে আবূ হুরায়রা। আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্, তিনি বললেন, এখন রয়েছি আমি আর তুমি, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সত্য বলেছেন। তিনি বললেন, এবার তুমি বসো ও দুধ পান কর। আমি বসে দুধ পান করলাম। তিনি পুনরায় আমাকে বললেন, আরো পান কর। আমি আবার পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে বলতে লাগলেন, পান কর, আর আমি পান করতে থাকলাম। অবশেষে আমি বললাম-যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমার মধ্যে আর কোন স্থান অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন, এবার পাত্র আমার কাছে দাও। আমি তাঁকে দিলাম, তিনি অবশিষ্ট দুধ পান করলেন।

এটা নবুয়তে মুহম্মদিয়ার নিদর্শন। কেননা। এক পেয়ালা দুধ ক্ষুধার্ত একদল লোককে তৃপ্ত করতে পারে না। এও লক্ষণীয় যে, তিনি পান করলেন সবার শেষে। যারা বলে যে, অন্যের উচ্ছিষ্ট পান করা ক্ষতিকর, এতে রোগের সংক্রমণ হয়, তাদের উক্তি সঠিক নয়। প্রিয়নবী (সা)-র শিক্ষা হলো, মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য। যাদের মধ্যে অহংকার রয়েছে তারাই উচ্ছিষ্ট আহারকে মন্দ ও ঘৃণার কাজ মনে করে।

www.pathagar.com

ঘি—এর পাত্র খালি হওয়ার পর আবার পরিপূর্ণ হওয়া

হাফেজ আবূ ইয়ালা রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খাদিম হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার মা উম্মু সুলায়ম-এর একটি বকরী ছিলো। তিনি এর দুধ থেকে কিছু পরিমাণ ঘি সংগ্রহ করে একটি পাত্রে ভরেন। এরপর এ ঘি নিয়ে তাঁর এক পালক মেয়েকে পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি ঐ ঘি প্রিয় রসূল (সা)-এর কাছে পৌছিয়ে দাও। তিনি তা ব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহার করবেন। পালক মেয়েটি তা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমীপে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এটা ঘি-এর পাত্র। উম্মু সুলায়ম আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, ঘি-এর পাত্রটি খালি করে তাকে দিয়ে দাও। পাত্রটি খালি করে তাকে দেয়া হলো। মেয়েটি বলল, আমি পাত্র নিয়ে ঘরে ফিরে দেখি উম্মু সুলায়ম ঘরে নেই, তিনিও কোথাও গিয়েছেন। আমি একটি কীলকে পাত্রটি ঝুলিয়ে রাখলাম। উম্মু সুলায়ম এসে দেখলেন, পাত্র থেকে ঘি টপকে পড়ছে। তিনি আমাকে বললেন, হে কন্যা ? তোমাকে আমি এ পাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌছিয়ে দিতে বলিনি ? সে বললো, হ্যাঁ, আমি তো পৌছিয়ে দিয়েছি। আপনার বিশ্বাস না হলে চলুন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি পালক কন্যাকে সাথে নিয়ে প্রিয় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি এক ডিবে ঘি সহ এ মেয়েটিকে আপনার সমীপে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে তার দায়িত্ব পালন করেছে, সে এসেছিল। উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, ডিবে তো পূর্বের ন্যায় ঘিতে পরিপূর্ণ দেখলাম, যা থেকে ঘি টপকে পড়ছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এতে কি তুমি আশ্চর্য বোধ করছো ; তুমি যেমন আহার করার জন্য আল্লাহ্র নবীকে ঘি উপহার দিয়েছো আল্লাহ্ও তেমনি আহার করার জন্য তোমাকে ঘি উপহার দিয়েছেন। এর থেকে নিজে আহার করো এবং

www.pathagar.com

অন্যকেও আহার করতে দাও। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, সে ভান্ড থেকে মাস দু'মাস পর্যন্ত আমরা খেতে থাকলাম।

এটাও প্রিয়নবী (সা)-র মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। কারণ খালি হওয়ার পর ঘি-এর ডিবে পুনরায় পরিপূর্ণ হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। সেই ঘিয়ের পাত্র পরিপূর্ণ দেখা এবং তা থেকে মাস দু'মাস ঘি নিয়ে আহার করা সাধারণ ব্যাপার নয়।

অল্প খাদ্যে অনেক লোকের পেট ভরা

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস বলেন, হযরত আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়মকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মৃদু স্বর শুনতে পেয়েছি। মনে হয় তাঁর খিদে আছে, তোমার কাছে কিছু আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তিনি কয়েকটি রুটি একটি গামছায় লেপটিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নিয়ে যাও। আনাস (রা) বলেন, আমি তা নিয়ে গেলাম। আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদে পেলাম, তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। আমি গিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালাম। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, তোমাকে আবূ তালহা পাঠিয়েছেন কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করেছেন কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। প্রিয় রসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা ওঠো। এরপর তিনি চললেন, আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম। আবূ তালহার কাছে পৌছে তাঁকে অবহিত করলাম। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে উম্মু সুলায়ম, প্রিয় রসূল (সা) এসেছেন, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সাহাবীরা। তাঁদের আহার করানোর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমাদের কাছে নেই। উম্মু সুলায়ম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা) অধিক জানেন। আবূ তালহা (রা) গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, হে উম্মু সুলায়ম, তোমার কাছে কি আছে

www.pathagar.com

দাও। তিনি রুটি উপস্থিত করলেন। প্রিয় রসূল (সা) এতে তাঁর লালা মিশালেন।। উম্মু সুলায়ম ঘি–এর ডিবে থেকে সামান্য ঘি সংগ্রহ করে ব্যঞ্জনের জন্য পেশ করলেন। এরপর প্রিয় রসূল (সা) দু'আ করলেন। এরপর বললেন, দশজনকে অনুমতি দাও। তাঁদের অনুমতি দেয়া হলো। তাঁরা আহার করলেন এবং তৃপ্ত হলেন। এরপর বেরিয়ে গেলেন, আবার বললেন, আরো দশজনকে অনুমতি দাও। এভাবে সকলেই আহার করলেন। তাঁরা ছিলেন সত্তর কিম্বা আশি জন লোক।

এটা কি রসূলুল্লাহ্ (সা)–র অন্যতম মু'জিযা নয়? এ যদি মু'জিযা না হয় তবে আর কোন্‌টি হবে মু'জিযা। অবশ্যই এ হচ্ছে অন্যতম মু'জিযা। কয়েকটি রুটি সত্তর আশিজন লোক আহার করা এবং প্রত্যেকেই পেট ভরে আহার করা, তা অস্বাভাবিক ব্যাপার ও অসাধারণ ঘটনা। এ হচ্ছে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের মহান নিদর্শন।

খাদ্য বৃদ্ধি পাওয়া

খাদ্যদ্রব্য বেড়ে যাওয়ার মু'জিযা অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ আর একটি এখানে উল্লেখ করছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা এক যুদ্ধে (তাবূক যুদ্ধ) প্রিয় রসূলুল্লাহ্ (সা)–র সঙ্গে ছিলাম। মুসলিমরা এ যুদ্ধে খাদ্যঘাটতির সম্মুখীন হলো, তাই তাঁরা উট যবাই করার জন্য প্রিয় রসূল (সা)–এর অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। হযরত উমর (রা) তা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা)–র কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্। এ উটগুলো তাদের বোঝা বহন করে, তারা এগুলো যবাই করবে ? আপনি তা করতে অনুমতি না দিয়ে বরং তাঁদের কাছে যা অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি আছে তা আপনার কাছে উপস্থিত করতে নির্দেশ দিন এবং তাতে বরকতের দু'আ করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। এরপর যার কাছে যা অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আছে তা নিয়ে আসার জন্য তিনি আহবান জানালেন। এ আহবানে সাড়া দিয়ে যার কাছে যা আছে তা এনে সকলেই প্রিয় রসূল (সা)–এর কাছে জমা দিলেন। তিনি বরকতের দু'আ

www.pathagar.com

করলেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। সকলেই নিজ নিজ পাত্র নিয়ে এলেন।

তাঁরা পাত্র ভরে নিয়ে গেলেন, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য আরো প্রচুর রয়ে গেল। এ দেখে প্রিয় রসূল (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। যে এ সাক্ষ্যদানের উপর স্থির ও অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে জাবির (রা)-এর ঋণ পরিশোধ হওয়া

ঘটনাটি বুখারী শরীফে হযরত জাবির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার পিতা ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেন। আমি প্রিয়নবী (সা)-র সমীপে এসে আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার পিতা ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেছেন। আমার কাছে বাগানের খেজুর ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নেই, আর যে খেজুর বাগানে উৎপন্ন হয়, তার কয়েক বছরের খেজুর দিয়েও এ ঋণ পরিশোধ হবে না। অতএব আপনি আমার সঙ্গে চলুন, যাতে ঋণদাতারা আমাকে দুর্বাক্য না শুনায়। প্রিয় রসূলুল্লাহ্ (সা) গিয়ে একটি খেজুরের স্তূপের চারপাশে ঘুরলেন এবং দু'আ করলেন। এরপর আরেকটি খেজুরের স্তূপের চারপাশে এরূপ চক্কর দিয়ে দু'আ করলেন এবং সে স্তূপের উপর প্রিয়নবী (সা) বসে গেলেন। তিনি জাবিরকে বললেন, খেজুর দিতে থাকো। তিনি দিতে আরম্ভ করলেন। দিতে দিতে দেখা গেল সকল ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলো কিন্তু খেজুর পূর্বের মতই রয়ে গেলো। কোন কমতি হলো না। অথচ এ পরিমাণ খেজুর কয়েক বছর পরিশোধ করলেও ঋণ থেকে যেত।

এ হচ্ছে প্রিয় রসূল (সা)-এর দু'আর বরকত, এটা মু'জিযা।

বৃক্ষের আনুগত্য

মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে- হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা একবার প্রিয় রসূল (সা)-এর সঙ্গে

www.pathagar.com

গমন করলাম। আমরা চলতে চলতে একটি প্রশস্ত উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন, আমি একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর সঙ্গে গমন করলাম। তিনি খোলা জায়গায় পর্দা করার জন্য কোন গাছপালা পেলেন না। উপত্যকার এক প্রান্তে দুটো গাছ দেখতে পেলেন। তিনি একটির কাছে গিয়ে তার ডাল ধরে বললেন, এসো, আল্লাহ্র হুকুমে আমার অনুসরণ ও আনুগত্য কর। উটের নাকে কাট দিয়ে যেভাবে তাকে অনুগত করা হয় সেভাবে গাছটি তাঁর অনুগত হয়ে গেল। দ্বিতীয় গাছটির কাছে গিয়ে তার ডাল ধরে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে আমার অনুগত হও, গাছটি তাঁর অনুগত হলো। তিনি দুটি গাছ টেনে এনে উভয়কে একত্র করে মিলিয়ে আড়ালের ব্যবস্থা করলেন। আবশ্যক কাজ সারার পর গাছ দুটো পৃথক হয়ে নিজ নিজ অবস্থানে চলে গেল।

এটাও অসাধারণ ব্যাপার, এটা মু'জিযা, যা আল্লাহ্র হুকুমে সংঘটিত হয়েছে।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুরাগে খেজুর গাছের রোদন

মুসনাদ–এ–আহমদে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রসূল (সা) একটি শুষ্ক খেজুর গাছে ঠেক দিয়ে খুতবা দিতেন। জনৈক আনসারী মহিলা–তাঁর ছিল এক ক্রীতদাস কারিগর–সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এক ক্রীতদাস কারিগর আছে, আমি তাকে আপনার খুতবা দেওয়ার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করতে নির্দেশ দেব কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে একটি মিম্বর তৈরি করল। প্রিয় রসূল (সা) জুমু'আর দিবসে খুতবা দিবার জন্য সে মিম্বরে আরোহণ করলেন। এদিকে বিরহ্ শোকে খেজুর গাছটি রোদন করতে লাগলো যেমন ছোট শিশু রোদন করে। প্রিয়নবী (সা) বললেন, এ গাছে ঠেক দিয়ে আমি যে খুতবা দিতাম তা থেকে বঞ্চিত হওয়াতে সে ক্রন্দন করছে। এরপর প্রিয়নবী (সা)

www.pathagar.com

তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন যেমন সান্ত্বনা দেওয়া হয় ক্রন্দনরত শিশুকে।

একটি শুষ্ক গাছের ক্রন্দন মহানবী (সা)–র অন্যতম মু'জিযা। এ তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের নিদর্শন।

প্রিয় রসূল (সা)–এর হাতে কঙ্করের তসবীহ্ পাঠ ও তাঁকে গাছ্ কর্তৃক সালাম করা

ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি য়ুয়াইদ ইবন ইয়াযীদ সুলামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ যর গিফারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি যে, আমি উসমান (রা)–এর একটি ব্যাপার দেখার পর তাঁর সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য করা ব্যতীত আর কিছু বলব না। তিনি ঘটনাটি বিবৃত করলেন। তিনি বললেন, আমি প্রিয় রসূল (সা)–এর অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোর সন্ধানে থাকতাম। আমি একদিন তাঁকে নির্জনে বসা দেখলাম। আমি এ সুযোগটি গ্রহণ করে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) এলেন এবং প্রিয় রসূল (সা)–কে সালাম জানিয়ে তাঁর ডান দিকে বসলেন। এরপর হযরত উমর (রা) এলেন। তিনি সালাম দিয়ে আবূ বকর (রা)–এর ডান পাশে বসে গেলেন।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখা ছিলো সাতটি কঙ্কর। তিনি সেগুলো হাতের তালুতে তুলে নিলেন। কঙ্করগুলো তাসবীহ্ পাঠ করলো। আমরা খেজুর গাছের ক্রন্দনের মতো সেগুলোর তাসবীহ পাঠের শব্দ শুনতে পেলাম। পরে তিনি কঙ্করগুলো রেখে দিলে সেগুলো নীরব হয়ে গেলো। এরপর সেগুলো তুলে নিয়ে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)–এর হাতে রেখে দিলেন। আমরা সেগুলোর তাসবীহ পাঠের শব্দ শুনতে পেলাম যেমন শুনতে পেয়েছি খেজুর গাছের রোদনের শব্দ। পরে কঙ্করগুলো তিনি রেখে দিলেন। সেগুলো নীরব হয়ে গেলো। প্রিয় রসূল (সা) সেগুলো তুলে নিয়ে হযরত উমর

www.pathagar.com

(রা)–এর হাতে রাখলেন। তাঁর হাতেও সেগুলো তাসবীহ পাঠ করলো। এদের গুঞ্জন শুনা গেলো যেমন শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম খেজুর বৃক্ষ থেকে। পরে তিনি সেগুলো রেখে দিলেন। কঙ্করগুলো নীরব হয়ে গেলো। এরপর প্রিয় রসূল (সা) সেগুলো তুলে নিয়ে উসমান (রা)–এর হাতে রাখলেন। সেগুলো তাসবীহ পড়তে লাগলো। আমি শব্দ শুনতে পেলাম খেজুর গাছের ক্রন্দনের শব্দের মতো। এরপর তিনি সেগুলো রেখে দিলেন, সেগুলো নীরব হয়ে গেল। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, এ হলো নবুয়তের খিলাফত।' এ মু'জিযার একটি অংশ হচ্ছে কঙ্করের তাসবীহ পাঠ, আর এক অংশ হলো, খিলাফতের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে তিন খলীফার যুগ পর্যন্ত। এর পরবর্তী যুগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

পাথরের সালাম

মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, প্রিয় রসূল (সা) বলেছেন, আমি মক্কার একটি পাথরকে এখনও চিনি, যে পাথরটি আমার নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত।

পাথরের সালাম করা অসাধারণ ব্যাপার। এ হলো নবুয়তের নিদর্শন।

উট কর্তৃক প্রিয় রসূল (সা)–কে সিজদা করা এবং তাঁর কাছে নিজের দুঃখ বর্ণনা করা

নাসায়ী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আনসারী একটি পরিবারে কূপ থেকে পানি উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত একটি উট ছিল। বিরতি না থাকার ও কাজটি কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে উটটি পানি টানতে অস্বীকৃতি জানাল। তাঁরা প্রিয় রসূল (সা)–এর সমীপে এসে উটের কথা বললো। প্রিয় রসূল (সা) সাহাবীদের বললেন, চলো সেখানে যাই। তাঁরা গেলেন, বাগানে গিয়ে উটটি দেখলেন; উটটি এক কোণায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রিয় রসূল (সা) উটের কাছে গেলেন। আনসারী বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, উটটি কুকুরের মতো কামড়ায়, আমরা আশংকা করছি, হয়ত আপনাকে কামড় দিবে।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, সে আমার কোন ক্ষতি করবে না। উটটি প্রিয় রসূল (সা)-কে দেখলে পর তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। প্রিয়নবী (সা) সেটির মাথার সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে নিয়ে ওকে কাজে জুড়িয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা নির্বোধ পশু, আপনাকে সিজদা করলো, আমরা আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, কোন মানুষের পক্ষে কোন মানুষকে সিজদা করা উচিত নয়। স্বামীর হক স্ত্রীর উপর এতো বেশি যে, যদি মানুষের পক্ষে কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হতো, তা হলে আমি নারী জাতিকে নির্দেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সিজদা করে।

আরেকটি ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার আনসারী এক সাহাবীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তাঁর সামনে একটি উট এসে কাঁদতে লাগলো। রসূল (সা) ওর মাথায় হাত বুলালেন। এতে সে শান্ত হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটটি কার? আনসারী এক যুবক বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটি আমার। তিনি বললেন, এসব নির্বোধ পশুর বিষয়ে তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর না? আল্লাহ্ তোমাকে সেগুলোর মালিক বানিয়েছেন? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ভুখা রাখো এবং অতিরিক্ত কাজ করিয়ে থাকো। কাজে কোন বিরতি দাও না।

রিসালাতের প্রতি বাঘের সাক্ষ্য প্রদান

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি-র মুসনাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একটি বাঘ একটি বকরী শিকার করলো। রাখাল বকরীটি তার থেকে ছিনিয়ে নিল। বাঘ তার লেজের উপর বসে বলল, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর না? আল্লাহ্ আমাকে যে রিযিক দিলেন তুমি তা ছিনিয়ে নিলে? রাখাল বলল, একী! বাঘ মানুষের মতো কথা বলছে। বাঘটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার বলবো? মুহম্মদ একজন মানুষ, তিনি মানুষকে বিগত ঘটনাবলীর

www.pathagar.com

সংবাদ দেন। রাবী বলেন, এরপর রাখাল তার বকরীগুলো মদীনায় নিয়ে এক জায়গায় রেখে দিলো। এরপর প্রিয়নবী (সা)-র কাছে এসে তাঁকে সংবাদ অবহিত করল। রসূলাল্লাহ্ (সা) সালাতের জন্য আহবান জানাতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি মসজিদে এসে রাখালকে বললেন, তুমি ঘটনা এদের কাছে বিবৃত করো। সে ঘটনা বর্ণনা করল। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, সত্য বলেছে। যাঁর হাতে মুহম্মদের প্রাণ তাঁর কসম, কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না, হিংস্র জন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে। আর যতক্ষণ না মানুষ তার বেত্র, তার জুতোর ফিতার সাথে কথা বলবে এবং তার উরু তার অবর্তমানে তার পরিবার কি করেছে তা বলে না দিবে।

বন্য পশুর প্রিয় রসূল (সা)-কে সম্মান করা

মুসনাদে আহমদে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্র পরিবারের একটি পশু ছিলো। প্রিয় রসূল (সা) বাইরে গমন করলে সেটি খেলাধুলা ও লম্ফ-ঝম্ফ করতো। আর তিনি ঘরে প্রবেশ করলে সে শান্ত থাকত, লাফ-ঝাফ করতো না। তিনি যতক্ষণ ঘরে থাকতেন তাঁর কষ্ট হবে খেয়ালে পশুটি লাফ-ঝাপ থেকে বিরত থাকতো।

উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ পশুকে কোন শিক্ষা দেন নি। পশু নিজ থেকেই এরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থেই এরূপ করতো। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আযাদকৃত ক্রীতদাসের প্রতি বাঘের সম্মান প্রদর্শন

আবদুর রাজ্জাক (র) তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আযাদকৃত ক্রীতদাস হযরত সাফীনা (রা) রোম দেশে সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ ভুলে যান, কিম্বা তিনি রোমীয়দের কাছে বন্দী হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

পালিয়ে এসে সেনাবাহিনীর সন্ধানে বের হন। জঙ্গলের পথে একটি বাঘ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি বললেন, হে আবুল হারিছ (বাঘের উপনাম)! জেনে রাখ আমি প্রিয় রসূল (সা)-এর ক্রীতদাস, আমার ব্যাপারে এই। বাঘ তা শুনে তাঁকে পথ দেখাতে দেখাতে সেনাদলের কাছে ছেড়ে দিয়ে আসে। যাওয়ার সময় তার ভাষায় আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়। সাফীনা (রা)-র প্রতি বাঘের এ সম্মান প্রদর্শন প্রিয়নবী (সা)-র ওসীলায় নসীব হয়েছে। প্রিয়নবী (সা)-র সাহাবী ও খাদেম বলে পরিচয় দেওয়াতে বাঘটি তাঁকে সম্মান করে রাস্তা বাতলিয়ে দিল। এ মু'জিযা প্রিয়নবী রসূল (সা)-এরই মু'জিযা।

হরিণীর কথা বলা

আবূ নু'য়াইম ইস্পাহানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'দালায়িলুল নবুয়ত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, প্রিয় রসূল (সা)-কে চলার পথে দেখলেন কিছু লোক একটি হরিণী শিকার করে বেঁধে রেখেছে। হরিণীটি প্রিয় রসূল (সা)-এর কাছে আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার দু'টো বাচ্চা আছে, এরূপ অবস্থায় তারা আমাকে ধরে এনেছে। আমাকে আপনি সুপারিশ করে যেতে দিন, আমি অঙ্গীকার করছি, আমি বাচ্চাদের দুধ পান করিয়ে পুনরায় ফিরে আসবো। প্রিয়নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, এ হরিণীর মালিক কে ? লোকেরা বললো, অমুক ব্যক্তি ইয়া রসূলাল্লাহ্ । তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও,তার বাচ্চাদের দুধ পান করিয়ে সে আবার ফিরে আসবে। তারা বললো-এর দায়িত্ব কে নিবে? তিনি বললেন, আমি। তারা ছেড়ে দিল। সে কথামত বাচ্চাদের-তার শাবকদের দুধ দিয়ে আবার ফিরে আসলো। তারা ওকে বেঁধে রাখলো। প্রিয় রসূল (সা) সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, এর মালিক কে ? তারা বললো অমুক। তিনি বললেন, তোমরা এটি আমার কাছে বিক্রি করবে ? তারা বললো, এটা আপনারই ইয়া রসূলাল্লাহ্। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এ হরিণীটি মুক্ত করে দাও। তারা ছেড়ে দিলে হরিণীটি সানন্দে বনে চলে গেল।

www.pathagar.com

অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ

'মুসনাদে আহমদ'-এ উসমান ইবন হানীফ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি একজন অন্ধ মানুষ। আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তিনি যেন আপনার দু'আর বরকতে আমাকে শেফা দেন। তিনি বললেন, তুমি যদি আখিরাতে এর প্রতিদান পেতে ইচ্ছা রাখ, আর তা তোমার জন্য উত্তম, তবে আমি এখন দু'আ না করি। আর তুমি এখন চাইলে আমি দু'আ করব। লোকটি বলল, না, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। রসূল (সা) তাকে ওযূ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতে বললেন এবং সালাতের পর এ দু'আটি পড়তে বললেন-'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি নবীয়্যিকা মুহাম্মাদিন নবীয়্যির রাহমাতি, ইয়া মুহাম্মাদ, ইন্নী আতাওয়াজ্জাহু বিকা ফী হাজ্তী হাজিহী ফাতারুযী, আল্লাহুম্মা শাফ্ফি'হূ ফিয়্যা।

লোকটি সে আমল করলে পর সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

হযরত আলী (রা)-র চোখের রোগ দূর হয়ে যাওয়া

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, খায়বার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের পতাকা দিব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলও তাঁকে ভালবাসে। আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন। ফজরে তাঁকে ডাকতে বলা হলে লোকেরা বলল, তাঁর চোখে ব্যাধি আছে। প্রিয় রসূল (সা) বললেন, তোমরা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাঁকে আনা হলে প্রিয় রসূল তাঁর সামান্য থুথু নিয়ে তাঁর চোখে দিলেন। এতে আলী (রা)-র চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। তিনি আর কোন সময় চোখের অসুখে ভোগেন নি।

www.pathagar.com

কাতাদা (রা)-র চোখ খুলে পড়ার পর পুনরায় তা প্রবিষ্ট করানো

হযরত কাতাদা ইব্‌ন নুমান (রা)-এর চোখ ওহূদ যুদ্ধে কাফিরের আক্রমণে খুলে পড়ে। প্রিয় রসূল (সা) তাঁকে পবিত্র হাতে সে চোখটি আবার ঢুকিয়ে দেন। এতে চোখটি ভাল হয়ে যায় এবং পূর্বের চাইতে অধিক জ্যোতির্ময় হয়।

শিশুর আরোগ্য লাভ

ইব্‌ন আবূ শায়বাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনায় আছে যে, খাস'য়াম গোত্রের এক মহিলা তাঁর এক শিশুকে নিয়ে আসে, যে আসীবের কারণে কথা বলতে পারে না, প্রিয়নবী (সা)-র সমীপে এলো। রাসূলাল্লাহ্ (সা) কুলি করলেন এবং তাঁর দু'হাত ধুলেন এবং বললেন, এ পানি তাকে খেতে দাও এবং তার শরীর মসেহ কর। তা করা হলো, এতে শিশুটি সুস্থ হয়ে গেলো এবং সাধারণ শিশুদের তুলনায় তার জ্ঞান অনেক বেড়ে গেলো।

একটি কাষ্ঠখন্ড তরবারিতে পরিণত হওয়া

হযরত ওক্‌কাসা ইবন মিহসান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর-র তরবারি ভেঙ্গে গেলো বদর যুদ্ধে। প্রিয় রসূল (সা) তাঁর হাতে একটি কাঠের টুকরা তুলে দিলেন এবং বললেন, এ দিয়ে আঘাত করো। কাঠটি তাঁর হাতে লম্বা, শুভ্র ও তেজ তরবারির রূপ ধারণ করলো। তিনি এ দিয়ে যুদ্ধ করলেন। এ তরবারি তাঁর কাছে অনেক দিন ছিলো। ধর্মত্যাগী মুরতাদ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত এ তরবারি তাঁর কাছে ছিলো।

এসব ব্যতীত আরো অনেক মু'জিযা প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর বর্ণনা সীরাত গ্রন্থ ও হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে। এ প্রবন্ধে এ পর্যন্তই উল্লেখ করা হলো। প্রিয় নবী (সা)-র শরীয়ত ও মু'জিযার ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করুন।

www.pathagar.com

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মওলানা মোহম্মদ আমিনুল ইসলাম

প্রিয় নবী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ ও সালামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনাতীত। এ সম্পর্কে শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা জাকারিয়া (র) লিখেছেন-প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলতে হলে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি পেশ করতে হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালামের হাদিয়া প্রেরণ করেন, হে মু'মিনগণ তোমরাও তাঁর প্রতি সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ করো।

এ পর্যায়ে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বহু হুকুম আহ্‌কাম বা বিধি-নিষেধ ইরশাদ করেছেন। যথা-নামায, রোযা ও হজ্জ প্রভৃতি আর এমনিভাবে বহু নবীর উচ্চ মর্যাদার কথাও পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের বিশেষ প্রশংসাও করেছেন। যেমন হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর তাঁকে সিজদা দিতে আদেশ দেন ফেরেশতাদেরকে।

কিন্তু কোন আদেশ অথবা প্রশংসাবাণীতে এই ভূমিকা সংযোজিত হয়নি যে, এ কাজ আমিও করছি, অতএব তোমরাও করো। এই উচ্চ মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য শুধু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি

www.pathagar.com

সালাত ও সালাম প্রেরণ করি, আমার ফেরেশতারাও তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে।

অতএব, হে মু'মিনগণ তোমরাও এই মহান দায়িত্ব পালন করে ধন্য হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। অতএব, তোমরা যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো। এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আর কি হতে পারে ?

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের মহান কাজে তাঁর ও ফেরেশতাদের সাথে মু'মিনদেরকে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত এই আয়াতটি 'ইন্না' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যা অত্যন্ত তাকীদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে 'ইউসাল্লুনা' শব্দটির তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করে থাকেন।

আল্লামা সাখাবী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এ আয়াতের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন তাই নয়, বরং সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলা ও তার ফেরেশতাদের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে।

'রূহুল বয়ান' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ ত'আলার দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো–প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 'মকামে মাহমুদে' পৌছিয়ে দেওয়া আর তা হলো মকামে শাফা'আত অর্থাৎ সেই কঠিন বিচার দিনে, গুনাহগার উম্মতের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শাফা'আত করার অধিকার লাভ করা। আর ফেরেশতাদের দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো --প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্তবা আরও বৃদ্ধি

www.pathagar.com

করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করা এবং তাঁর উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর মু'মিনদের দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হলো–প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ করা, তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ অনুসরণের শপথ গ্রহণ করা, তাঁর অতুলনীয় গুণাবলীর আলোচনা করা।

এই পর্যায়ে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা প্রদানের মাধ্যমে হযরত আদম (আ)–কে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর ও উচ্চতর মর্যাদা দেয়া হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মর্যাদা বৃদ্ধির কাজে তথা তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণে স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা শরীক হচ্ছেন।

পক্ষান্তরে হযরত আদম (আ)–এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তা হলো ফেরেশতাদের প্রতি এই আদেশের মাধ্যমে যে, 'তোমরা আদমকে সম্মানসূচক সিজদা দাও।'

বিবেক–বুদ্ধির কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, এমনি উচ্চ মর্যাদা, সম্মান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কোন নবী বা কোন ধর্ম প্রচারক লাভ করেন নি।

স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত প্রেরণ করেন, এমনিভাবে বিশ্ববাসীর নিকট তাঁর প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামোল্লেখ করেন নি, শুধু নবী বলেই বর্ণনা করেছেন, অথচ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে অন্যান্য নবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে, এতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এমনকি, একই আয়াতে যখন হযরত ইবরাহীম (আ)–এর নামের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামোল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ–

www.pathagar.com

আর যেসব আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিশেষ হিকমত এবং তাৎপর্যের কারণেই করা হয়েছে।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য আর তা হলো আলোচ্য আয়াতে 'সালাত' শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ এবং মু'মিনদের সাথে গড়ে তোলা হয়েছে। তাই এর অর্থ এবং তাৎপর্য পার্থক্য হবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত পেশ করেছেন বলা হবে, তখন এর অর্থ হবে আল্লাহ্ তা'আলা রহমত এবং দয়ার সাথে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) আবুল আলিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া প্রেরণের অর্থ হলো ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা। আর ফেরেশতাদের দরূদ পেশ করার অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করার জন্য ফেরেশতাদের দু'আ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) শব্দটির এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য বরকতের দু'আ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ এই কথাটি আবুল আলিয়ার কথার সমর্থন করে। হাফেজ ইবনে হাজার অন্যত্র সালাতের কয়েকটি অর্থ লিপিবদ্ধ করে বলেছেনঃ আমার নিকট আবুল আলিয়ার মতই গ্রহণযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সালাত প্রেরণের অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ফেরেশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য রহমতের প্রার্থনা করা।

www.pathagar.com

এ আয়াত নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে বিনীতভাবে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। হুযূরের দরবারে সালামের রীতিনীতি আমরা জানতে পেরেছি অর্থাৎ–নামাযে আত্তাহিয়াতের মাধ্যমে আস্সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিউ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' এবারে আমাদেরকে দরূদ শরীফ পেশ করার তালিম দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দরূদ পেশ করার এই পন্থা বাতলিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই প্রার্থনা কর, যেন তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি চিরদিন ধরে অধিক থেকে অধিকতর রহমত নাযিল করতে থাকেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত অনন্ত অসীম।

আর এটিও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত যে, তিনি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিকতর রহমত নাযিল করে থাকেন, আর আমাদের ন্যায় দীনহীনদের তরফ থেকে এই হাদিয়া পেশ করার কথা স্বীকার করা হয়।

অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, রহমত প্রেরণ করার ক্ষমতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। কোন বান্দার এই ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোথায় যে, বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি মর্যাদানুসারে ভক্তি উপহার পেশ করবে?

হযরত শাহ আবদুল কাদির (র) লিপিবদ্ধ করেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আল–আওলাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে রহমতের প্রার্থনা নিঃসন্দেহে কবূল হয়। আর এ কথাও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা অনুসারেই তাঁর প্রতি রহমত লাভ হয়। আর একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

জন্য রহমতের প্রার্থনা করলে তথা দরূদ শরীফ পাঠ করলে সেই পাঠকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়। অতএব যার যত ইচ্ছা, দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত নাযিল করার ব্যবস্থা করতে পারে।

এখানে এই প্রশ্ন অবান্তর যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ করি। আমরা তাঁর জবাবে বলছি--হে আল্লাহ্! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ কর। এতে যেন আমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হচ্ছি এবং আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্র নিকটই প্রার্থনা করছি। এই প্রশ্নের অবতারণা করে এর জবাব দিয়েছেন আল্লামা সাখাবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাওলে বদিয়ে' এবং আল্লামা আমীর মুস্তাফা তুরকামানী তাঁর গ্রন্থে। এমনিভাবে আল্লামা নিশাপুরীও তাঁর গ্রন্থ 'লাতায়েফ ও হিকামে' এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এই সমস্ত মনীষীদের জবাবের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন সকল পাপ থেকে পূত-পবিত্র এবং মুক্ত। তাই আমাদের ন্যায় পাপী-তাপী লোকদের পক্ষে তাঁর মহান দরবারে ভক্তি-উপহার পেশ করা যে সম্ভবই নয়, তাই আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরয পেশ করছি-তিনি যেন তাঁর প্রতি সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ করেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রার্থনা করে থাকি আমরা।

এতদ্ব্যতীত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্যিকার মর্যাদা সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। এইজন্য আল্লাহ্র হুকুম পালনার্থে আমাদের যে কর্তব্য রয়েছে, তা যথাযথভাবে পালনে আমরা ব্যর্থ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই ওয়াকিফহাল। তাই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রার্থনা করাই আমাদের উচিত, যাতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদানুসারে তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার শানে ইরশাদ করেছেন :

হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা করতে অক্ষম, আপনি ঠিক সেই রকমই, যে রকম আপনি স্বীয় প্রশংসা করেছেন।

তাই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবিকই তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করা উচিত এবং অধিক থেকে অধিকতর দরূদ পেশ করা উচিত। আর এই ব্যবস্থা সর্বদা অব্যাহত থাকা উচিত। কেননা, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়।

যাকে যে ভালবাসে, তাকে স্মরণ করে সে বারে বারে।

আল্লামা সাখাবী ইমাম জয়নুল আবেদীনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পেশ করা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পন্থী হবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লামা জরকানী শরহে মাওয়াহিবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, দরূদ শরীফের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আদেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে হক বা অধিকার আমাদের প্রতি রয়েছে, তা আদায় করার চেষ্টা করা। হাফেজ ইযাযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম বর্ণনা করেন যে, আমাদের দরূদ শরীফ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য সুপারিশ নয়। কেননা, আমাদের ন্যায় লোক তাঁর জন্য কি সুপারিশ করতে পারে ? কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দাতার দানের বদলা দেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বড় দাতা আর কেউ নন। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দান ও ইহসানসমূহের বদলা দিতে আমরা অক্ষম, তাই আল্লাহ্ আমাদের এই অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করে এই পথ নির্দেশ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা হোক। আর যেহেতু আমরা এই দায়িত্ব পালনেও অক্ষম, তাই আল্লাহ্ তা'আলার

www.pathagar.com

দরবারে এই আরজি পেশ করি যে, ইলাহী তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ কর তথা তাঁর প্রতি রহমত নাযিল কর।

যেহেতু উপরের আয়াতে দরূদ শরীফ পাঠের আদেশ রয়েছে, তাই উলামায়ে কিরাম দরূদ শরীফ পাঠকে ওয়াজিব বলে বর্ণনা করেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়, আর প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন আল্লামা রাযী তাঁর সুবিখ্যাত তফসীরে কবীরে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা দরূদ পেশ করেন, তখন আর আমাদের দরূদের কি প্রয়োজন থাকে? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের দরূদ আদৌ তাঁর প্রয়োজন নয়, যদি তা হতো তবে আল্লাহ্ তা'আলার দরূদের পর ফেরেশতাদের দরূদেরও কোন প্রয়োজন হতো না, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের দরূদ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্যই যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর যিকিরের আদেশ দিয়েছেন। অথচ আমাদের যিকির বা স্মরণের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

হাফেজ ইবনে হাজার লিপিবদ্ধ করেছেন : কোন কোন লোক আমার নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে 'সালাত' শব্দটি সম্পর্কে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সালামের নয়। আমি এর কারণ বর্ণনা করেছি যে, সালাম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক দু'আ, দুই–আনুগত্য ও অনুকরণ। মু'মিনদের ব্যাপারে উভয় অর্থই প্রযোজ্য। তাই তাদেরকে এর আদেশ দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'আলা এবং ফেরেশতাদের ব্যাপারে আনুগত্য ও অনুকরণের অর্থ অশুদ্ধ হয়। তাই আল্লাহ্র সাথে সালামের সম্পর্ক করা হয়নি। এই আয়াত শরীফ সম্পর্কে আল্লামা সাখাবী একটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও উপদেশমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আহমদ ইয়ামিনী থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সান'আ নামক শহরে ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, এক ব্যক্তির চার পার্শ্বে বহু লোক সমবেত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম--কি ব্যাপার। উপস্থিত অপেক্ষমান লোকেরা বলল যে, এই লোকটি অতি সুন্দর আওয়াজে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে সক্ষম ছিল, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের

www.pathagar.com

সময় যখন এই আয়াতে পৌঁছল তখন সে এর বদলে পড়েছিল, যার অর্থ হলো যে, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ হযরত আলীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, যিনি নবী। হয়ত এই ব্যক্তিটি রাফেজী হবে আর এইভাবে আয়াতটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বোবা হয়ে গেল এবং কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হয়ে গেল এবং আতুর হয়ে গেল। এটি অত্যন্ত ভয় ও সতর্কতার স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা হিফাযত করুন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করেন।

এ হাদীসটি মুসলিম শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একই দরূদ এবং একই রহমত সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একবার দরূদ পড়ার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা দশটি রহমত নাযিল করেন। দরূদ শরীফের এর চেয়ে অধিক গুরুত্ব ও ফযীলত আর কি হতে পারে?

হযরত আবূ হুরায়রা রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করেন। এই হাদীসটি মুসলিম শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একই দরূদ এবং একই রহমত সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য যথেষ্ট কিন্তু এতদসত্ত্বেও একবার দরূদ পাঠ করার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা দশটি রহমত নাযিল করেন। দরূদ শরীফের এর চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হতে পারে ? এমনি অবস্থায় সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিরা কত ভাগ্যবান, যারা দৈনিক সোয়া লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করেন। যেমন আমি আমার বুযুর্গানে দীন সম্বন্ধে শ্রবণ করেছি। আল্লামা সাখাবী আমের ইবনে রাবিয়া থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার

www.pathagar.com

প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করেন, অতএব তোমাদের ইচ্ছে কম অথবা বেশি রহমত লাভের ব্যবস্থা করা আর এই তথ্যই আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে এতটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণ দশ বার দরূদ প্রেরণ করেন। আর কয়েকজন সাহাবী থেকে আল্লামা সাখাবী এই তথ্যটি বর্ণনা করেছেন এবং এক স্থানে তিনি লিপিবদ্ধ করেন যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামকে স্বীয় পবিত্র নামের সাথে কালেমায়ে শাহাদাতে একত্রিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর মহব্বতকে স্বীয় মহব্বত বলে ঘোষণা করেছেন আর এইভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদকে স্বীয় দরূদের সাথে একত্রিত করেছেন যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি যিক্র সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করবো।' এইভাবে দরূদের ব্যাপারেও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি একবার দরূদ শরীফ পেশ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দশ বার দরূদ প্রেরণ করবেন, তথা রহমত নাযিল করবেন।

তরগীবের আর একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পেশ করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সেই ব্যক্তির প্রতি সত্তর বার রহমত নাযিল করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে কোন আমল সম্পর্কে তার সওয়াব বেশি বা কম যখন বলা হয় যেমন এক হাদীসে দশ এবং আর একটিকে সত্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তার সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের অভিমত এই যে, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র দান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এজন্য যে সব বর্ণনায় অধিকতর সওয়াবের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো পরে ঘোষিত হয়েছে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে দশটি রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতঃপর সত্তরের ওয়াদা করেছেন। কোন কোন ওলামায়ে কিরামের মতে

www.pathagar.com

বিষয়টিকে ব্যক্তি, পরিস্থিতি, সময় এবং পরিবেশের কারণে কমবেশি সওয়াবের উল্লেখ করা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী সত্তরটি রহমতের সুসংবাদ দানকারী হাদীসের মর্মকে জুমু'আর দিনের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা, অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, জুমু'আর দিন যাবতীয় সৎকাজের সওয়াব বা শুভ পরিণতি সত্তর গুণ বৃদ্ধি পায়।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির সম্মুখে আমার আলোচনা হয়, সে ব্যক্তির কর্তব্য হলো আমার প্রতি দরূদ পেশ করা। আর যে আমার প্রতি একবার দরূদ পেশ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করবেন, তথা রহমত নাযিল করবেন আর সেই ব্যক্তির দশটি গুনাহ মাফ করবেন আর তার দশটি মর্তবা বুলন্দ করবেন। এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও নিসায়ী।

আল্লামা মুনযরী তরগীবে হযরত বরার বর্ণনা থেকে এই বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন। আর তাতে এতটুকু বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ দশটি ক্রীতদাসকে মুক্তিদানের সমমর্যাদা লাভ করবে।

আর তিবরানীর বর্ণনা অনুসারে এই হাদীস নকল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পেশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করেন, তথা রহমত নাযিল করেন, আর যে আমার প্রতি একশত বার দরূদ পেশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কপালে লিপিবদ্ধ করে দেন যে, এই ব্যক্তি মুনাফিকী থেকে মুক্ত এবং পরকালীন বিপদ থেকেও আর কিয়ামতের দিন শহীদানের সাথে হবে তার হাশর।

আল্লামা সাখাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ পেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি একশতবার দরূদ প্রেরণ করেন, আর যে আমার প্রতি একশতবার দরূদ পেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি এক হাজার বার দরূদ প্রেরণ করেন, আর যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রেম মুহব্বতে তার চেয়ে বেশি দরূদ পেশ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হবো।

হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আওফ (রা) থেকেও এই মর্মের হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদের চার পাঁচ জনের মধ্যে যে কোন একজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে সর্বদা হাযির থাকতো, যাতে করে তাঁর প্রয়োজনের আয়োজন করতে সক্ষম হয়। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি বাগানে আগমন করেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করি এবং তাঁর খিদমতে হাযির হই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখানে গমন করে নামায আদায় করলেন এবং এতো দীর্ঘ সিজ্দা দিলেন যে, তাতে আমার এই আশংকা হতে লাগলো হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রূহ মুবারক তাঁর দেহ মুবারক ত্যাগ করেছে। আমি এই আশংকার কারণে কাঁদতে লাগলাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে দেখলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সিজ্দা সু-সম্পন্ন করে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুর রহমান ! কি ব্যাপার? আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি এতো দীর্ঘ সিজ্দা করেছেন যে আমার ভয় হচ্ছিল (খোদা না করুন) হয়তো আপনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার প্রতি বিরাট ইহ্সান করেছেন এবং আমাকে বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন, তার শুকরিয়া স্বরূপই এতো দীর্ঘ সিজ্দা করেছি, আর সেই নিয়ামত হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং দশটি গুনাহ্ মাফ করবেন। এই ঘটনার আরও একটি বিবরণ রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন-আবদুর রহমান ! কি ব্যাপার? আমি আমার আশংকার কথা প্রকাশ করলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এখন জীবরাঈল (আ) এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছেন, যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দরূদ পেশ করবেন। আর যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি সালাম প্রেরণ করবো। তবরানীতেও তা-ই রয়েছে। হযরত আল্লামা সাখাবী হযরত উমর (রা) থেকে এমনি তথ্য পরিবেশন করেছেন।

হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) বলেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, তাঁর নূরানী চেহারায় আনন্দের ঝলক পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। উপস্থিত লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! আপনার নূরানী চেহারায় আজকে আনন্দের চিহ্ন রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের ধারণা সঠিক। আমার নিকট আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম এসেছে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ একবার দরূদ প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেছেন। আর দশটি গুনাহ্ মাফ করবেন এবং দশটি মর্তবা বুলন্দ করবেন।

www.pathagar.com

বিশ্বনবী (সা)–র জীবনে মি'রাজ

উবায়দুর রহমান নদভী

সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেমন সৃষ্টির সেরা তেমনি আদমের শ্রেষ্ঠতম সন্তান। সমস্ত নবী–রাসূলদের সরদার। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিটির অসংখ্য বিশেষত্বের একটি হচ্ছে, 'ইসরা' বা মি'রাজ।

'ইসরা' শব্দের অর্থ ঃ নৈশকালে ভ্রমণ করানো। যেহেতু মহানবী (সা)–র উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিল রাতের বেলায়। তাই এর নাম 'ইসরা'। কুরআন মজীদে মি'রাজ বিষয়ক আলোচনায় এ শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে। সুবহানাল্লাযি আসরা...(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১) পবিত্র সে সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন নিশি কালে।

'উরুজ' হতে মি'রাজের উৎপত্তি। এর অর্থ ঃ আরোহণ করা, উপরে চড়া। মি'রাজ প্রসংগে বর্ণিত হাদীস শরীফে 'উরিজা বী' শব্দের ব্যবহার হয়েছে বলে এ ঘটনা মি'রাজ বলেই বেশি খ্যাত। পৃথিবীর ইতিহাসে যত রাসূল, বার্তাবাহক, নবী (আ)–দের আলোচনা দেখা যায় তাদের প্রত্যেকের নবুয়ত বা রিসালতের পদমর্যাদা প্রাপ্তির মুহূর্তে বা এ সুমহান সৌভাগ্যজনক পদের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার প্রাক্কালে এ ধূলির ধরণীর দুর্বল সীমিত মানসিকতা ও মননের বিস্তার সাধনের লক্ষ্যে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর অসীম কুদরত সম্পর্কিত ধারণা ও অদেখা বিশ্বাসের পাট চুকিয়ে চাক্ষুষ বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ ইয়াকীন জন্ম দিতেই আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তাঁর যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্মদক্ষতা অনুপাতে অপার্থিব ভুবনে, অলৌকিক পরজগতে ভ্রমণ করান অর্থাৎ প্রত্যেক নবী রাসূলের জিন্দেগীতেই মি'রাজ আছে। ইহজগতের সব প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক বাধ্যবাধকতা মুক্ত, তাপ, ভার, চাপ, ওজন, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদির

www.pathagar.com

শৃঙ্খলমুক্ত এক নূরের জগতে মানবিক গুণাবলীর উপর জান্নাতী পর্দা ফেলে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির পাখায় ভর দিয়ে, অভ্যর্থনাকারী ফেরেশতাদের বেষ্টনীতে এ উর্ধ্বলোক ভ্রমণ সংঘটিত হয়। এমন কি কোন কোন বিশেষ ব্যক্তির সফরকালীন হালত সম্পর্কে শোনা যায় যে, মহান প্রভুর সাথে তার নৈকট্য ধনুকের ছিলার দুই মাথার মত হয়ে গিয়েছিলো।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম যখন ইলাহী পয়গাম ও নবুয়ত লাভ করলেন, তখন ইরশাদ করা হলোঃ "ওয়া কাযালিকা নূরি ইবরাহীমা মালাকূতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ" (আর এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের বাদশাহী প্রত্যক্ষ করাই।) আল্লাহ্ পাকের সারা জাহানের শাহানশাহীয়ত দেখানো হয় ছোট পৃথিবীর সীমিত প্রয়াসী দুর্বল মানুষকে। এটাই মি'রাজ। একেই বলে ইসরা।

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম সম্বন্ধে তাওরাতে বর্ণিত হয়েছেঃ

ইয়াকুব সাবাঅ' কূপের কাছ থেকে চলে গেলো এবং হারান নামক স্থানে রওনা করলো এবং তথায় একটি স্থানে গিয়ে শায়িত হলো। কেননা সূর্য ডুবে গিয়েছিল এবং এ জায়গারই কিছু পাথর মাথার নিচে স্থাপন করলো এবং ওখানেই শুয়ে রইলো। সেখানেই স্বপন দেখলো যে যমীন হতে আকাশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি লাগানো রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা উঠা-নামা করছে আর আল্লাহ্ তাতে দাঁড়ানো। এবং তিনি বললেন, আমিই মহান প্রভু। তোমার পূর্বসূরী ইবরাহীম ও ইসহাকের রব । যে ভূখন্ডের উপর তুমি শায়িত তা আমি তোমার এবং তোমার বংশধরকে দান্ করবো।

–(তাকভীন–২৮) 'সীরাতুন্নবী ৩য় খন্ড'

হযরত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নূরের বন্যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটাই ছিলো তাঁর মি'রাজ। বহু নবী রাসূলের উর্ধ্বালোক পরিদর্শনের কাহিনী তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। খৃস্টানদের রচিত ইঞ্জিলে ইউহান্নায় বিধৃত হয়েছে অসংখ্য স্বর্গীয় পর্যটন উপাখ্যান। এতে পারলৌকিক দৃশ্যাবলী ছাড়াও কিয়ামতের ঘটনাপ্রবাহও চিত্রায়ন করা হয়েছে। অগ্নি উপাসক–মাজুসীরাও তাদের নবী যরদশ্‌ত সম্পর্কে দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী শুনিয়ে থাকে। এতে মহানবী খাতিমুন

www.pathagar.com

নাবীঈন (সা)-এর ইসরা কাহিনী অবলম্বনে গড়া হয়েছে কাহিনীর গাঁথুনি। চালানো হয়েছে নকল-প্রয়াস। বৌদ্ধরাও গৌতম বুদ্ধের জীবনে পরমেশ্বর দর্শনের কেচ্ছা বর্ণনা করে গর্বভরে। মি'রাজ কোন অস্বাভাবিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানবিক সীমাবদ্ধতার অনুপাতে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের আংশিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ বা তার ফয়েজ ও বারাকাতের একটু ঝলক দর্শন নতুন ঘটনা নয়। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এ সৌভাগ্য-দুয়ার উন্মুক্ত।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতেই একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণ ও প্রভুর সাক্ষাৎকার নসীব হওয়া অতুলনীয় মহাসুযোগ।বলা হয়েছেঃ আস সালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন'। রাসূলে মকবুল (সা)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীটি বড়ই যথার্থ। কারণ একান্ত সাক্ষাতের সেই বিশেষ লগ্নটির স্মৃতিবিজড়িত ইলাহী উপহার 'সালাত' সত্যিই প্রতিটি মু'মিনের মি'রাজ।

এতো গেলো সাধারণ পারলৌকিক বাস্তবতার তুলনামূলক প্রত্যক্ষকরণ। ইলাহী কুদরতের ছিটে-ফোটার প্রকাশ। কিন্তু সারা জাহানের সরদার, নবীকুলের শিরোমণি, আদম আলায়হিস সালাম-এর শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাজদারে মদীনা, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ্র হাবীবের পদযুগল যে বিশেষ স্থানে ফেলেছে নূরানী ছাপ, এঁকেছে সোনালী পদাংক, ঝরেছে তাঁর পবিত্র পদরেণু আরশে আযীমের একান্ত পাশে। যুল জালালের জালালী গালিচায়। যা আর কোন সৃষ্টির নসীবে জোটেনি। অতুলনীয় বে-নজীর অভূত ও অশ্রুতপূর্ব সম্মান।সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাযী আসরা বি আবদিহি...।

নবী করীম (সা)-এর জীবনে মি'রাজ মোট ক'বার হয়েছিল। এক বা একাধিক বার হয়ে থাকলে এর নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ক্ষণ কি? অথবা মি'রাজ কি শারীরিক না রূহানী? জাগ্রত না ঘুমন্তাবস্থায়? ইত্যাদি প্রশ্ন ইসলামী ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। রাসূলের মুখ নিঃসৃত ঘটনা এবং আল-কুরআনে আল্লাহ্ বিবৃত 'ইসরা' কাহিনীর আলোকে এ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ঘটনার বাস্তবতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত ও দিবালোক সম উজ্জ্বল। কিন্তু হাদীস শরীফের বর্ণনাশৈলী বা বিবরণী প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্যের দরুন নির্দিষ্ট দিন-তারিখ-ক্ষণ ও সংখ্যাটা রহস্যজনকভাবে

www.pathagar.com

রয়ে গেছে পর্দা ঢাকা। এটাও মি'রাজের মাহাত্ম্য বা গুরুত্বেরই নিদর্শন। ইসরার তারিখ সম্পর্কে উপমহাদেশের হাদীস শিক্ষার পথিকৃৎ শাহ্ আঃ হক মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ মা ছাবাত বিস্‌সুন্নাহ্ ফী আইয়াসিস সানাহ্'র 'রজব মাস' বিষয়ক অধ্যায়ে লেখেন।

আরব বিশ্বে জনশ্রুতি রয়েছে যে, ২৭শে রজব হযরত নবী করীম (সা)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয়। এ সময় আরব ভূখণ্ডের লোকেরা পালন করে 'রজবী' উৎসব। এ উৎসবের ধরনটা এরূপ, দূর-দূরান্তের মরু অঞ্চল হতে আরব মুসলমানরা দলে দলে এসে উপস্থিত হয় নবী মুস্তাফা (সা)-র রওজা শরীফের চারপাশে। কেউ কেউ বলেন যে, মি'রাজ ২৭ রজব হয়েছিল কথাটা সঠিক নয়। এবং অধিকাংশ লোকের মতে নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষের রমযান বা রবিউল আউয়ালের ১৭ তারিখ মি'রাজ হয়েছিল। আর এ মতটাই অধিকাংশ হাদীসবেত্তার নিকট বিশুদ্ধ বলে গৃহীত।

রেওয়ায়েতে বহু রকম দিন, তারিখ সন থাকলেও সামগ্রিক দিক বিবেচনায় এবং প্রাচীন যুগ হতে চলে আসা পালন পরম্পরা, রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার বিচারে রজব মাসকেই নির্দিষ্ট করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ২৭ তারিখের রাতকে সুনির্দিষ্টভাবে শবে মি'রাজ আখ্যায়িত করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে কুতায়বাহ্ (মৃ ২৬৭ হিঃ) এবং আল্লামা ইবনে আবদুল বার রজব মাসকেই নির্ধারিত করে বলেছেন। পরবর্তীকালের হাদীসবিশারদদের মধ্যে ইমাম রাফেয়ী' ও ইমাম নববী এ সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়তার সাথে পেশ করেছেন এবং ইমাম আবদুল গনী মুকাদ্দেসী মুহাদ্দিসে কবীর এ মাসকেই নির্দিষ্ট করেছেন এমনকি ২৭ তারিখের রাতকেও 'লায়লাতুল ইসরা' আখ্যা দিয়েছেন। —সীরাতুন্নবী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

আল্লামা যুরকানী লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষের আমল এটাই এবং অনেকের মতে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ণনা। কেননা মূল নিয়ম এটাই যে, যে সব ব্যাপারে প্রাথমিক সময়ের বড়দের মধ্যে ভিন্নমত দেখা যায় এবং কোন একটা মতকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণাদিও না থাকে, তবে যে

www.pathagar.com

মতটা জনসাধারণ বেশি জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক প্রচলিত ও যুগ পরম্পরায় পালিত সেটাকেই বিশুদ্ধ মনে করাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে ধারণা করা যায়।

–বিস্তারিত তথ্যঃ যুরকানী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৫৫–৩৫৮

মি'রাজের ঘটনার অকল্পনীয় মহাসত্যের প্রতি নিঃসংশয় বিশ্বাস ইসলামী আকীদার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) 'সিদ্দীক' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন 'আসরা'র ঘটনার প্রতি নিঃসংশচিত্তে অম্লান বদনে বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই। এবার ইসরার সন–তারিখ–সংখ্যার আলোচনা তুলে রেখে শবে মি'রাজের ঘটনার দিকে একটু যেতে চাই। হাদীসে বর্ণিত বহু রেওয়ায়েতের এ যুগান্তকারী ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী বর্ণনা পরম্পরায় সমৃদ্ধ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতখানাই পাঠক সাহেবানের খেদমতে পেশ করার প্রয়াস পাবো।

আল জামিউস সহীহ্ লিল ইমাম আল বোখারীর ১ম খন্ডে 'বাবকাইফা ফুরিজাতিস সালাতু ফিল ইসরা' অধ্যায়ে হযরত আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) মক্কায় ছিলেন। তার বাড়ীর ছাদ উন্মুক্ত হলো এবং হযরত জিব্রাইল (আ)) অবতরণ করলেন। তিনি প্রথমত হুযূরের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন, অতঃপর বক্ষস্থিত অংগ যমযম পানিতে ধৌত করেন।এরপর ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ একটি সোনার তশতরী ঢেলে দিয়ে বক্ষ মুবারক পুনরায় বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তাঁর হাত ধরে আসমানে নিয়ে গেলেন। যখন আসমানে পৌঁছলেন তখন হযরত জিব্রাইল (আ)) আসমানের প্রহরী ফেরেশতাকে বললেন, দরজা খোল।

প্রহরী বললো ঃ কে?

উত্তর দিলেন ঃ জিবরাইল।

ঃ তোমার সাথে কি আরো কেউ আছেন?

ঃ হ্যাঁ আমার সাথে আল্লাহর রাসূল, মুহাম্মদ রয়েছেন।

ঃ উনাকে কি ডাকা হয়েছে?

www.pathagar.com

হযরত জিবরাইল (আ) হ্যাঁ বাচক উত্তর দিলেন। সে যাক, যখন তিনি (সা) প্রথম আকাশে উঠলেন তখন দেখতে পেলেন একজন লোক বসে আছে তার চারপাশে বহু সংখ্যাক অশরীরী পরছায়া।

যখন ঐ ব্যক্তি ডান দিকে দেখতেন তখন হাসতেন আর যখন বাম দিকে ফিরতেন তখন কাঁদতেন। হুযূর (সা)-কে দেখে তিনি বললেনঃ মারহাবা। হে সৎ নবী, হে পুণ্য সন্তান। হুযূর জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন যে, লোকটি কে। জিবরাইল বললেনঃ ইনি হযরত আদম (আ) এবং তাঁর ডান, বাঁয়ের ছায়াগুলো তার সন্তানদের আত্মা।

ডান পাশের এরা জান্নাতী বাম পাশে জাহান্নামী। এজন্য যখন তিনি ডান দিকে চোখ করেন তখন হাসেন, আর বাম দিকে দৃষ্টিপাত করলে (তার কান্না আসে) তিনি কাঁদেন।

এর পর তিনি (সা) দ্বিতীয় আকাশে পৌছলে এমনি ধরনের প্রশ্ন-উত্তর হলো। এবং প্রত্যেক আকাশেই কোন-না-কোন পয়গম্বরের দেখা পেলেন। প্রথমাকাশে হযরত আদম (আ) ও ষষ্ঠাকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, হযরত আবূ যর আমাকে নবীদের স্তর নির্ধারণ করে কিছু বলেন নি। সে যাই হোক, হযরত জিবরাইল তাঁকে হযরত ইদ্‌রীসের পাশ দিয়ে নিয়ে গেলে তিনি বলেন ঃ মারহাবা ! হে নেক্‌কার নবী, হে নেকবখত ভাই ! তিনি নাম জানতে চাইলে হযরত জিবরাইল (আ) নাম বললেন। অতঃপর তদ্রূপ ঘটনা হযরত মূসা, হযরত ঈসা, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথেও ঘটলো। হযরত মূসা ও ঈসা সম্বোধন করলেন 'নবী ও পুণ্যময় ভ্রাতা' বলে। হযরত ইবরাহীম (আ) নবী সালেহ ও সৎ-সন্তান বলে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর হযরত জিবরাইল তাঁকে উর্ধ্বে নিয়ে গেলেন এবং তিনি (সা) এমন জায়গায় পৌছলেন, যেখান থেকে আল্লাহ্‌র কুদরতের কলম চালনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এখানেই মহান আল্লাহ্ তাঁর (সা) উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। হুযূর (সা) এ তোহফায়ে রব্বানী যা আল্লাহ্ প্রদত্ত উপহার দান নিয়ে হযরত মূসার কাছে এলেন। মূসা (আ) প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ্ আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করলেন। তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে পুনরায় যান। আপনার উম্মত এ ফরয বরদাশত করতে পারবে না। হুযূর (সা) গেলেন এবং আল্লাহ্ পাক একটি অংশ কমিয়ে দিলেন। এবার ফিরে আসলে মূসা (আ) পুনরায় বললেন ঃ 'আবার আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যান' আপনার উম্মত একটুকুরও শক্তি রাখে না। তিনি (সা) গেলেন এবং আল্লাহ্ আবারও একটি অংশ কমিয়ে দিলেন। মূসা (আ) আবার বললেনঃ আপনার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তিনি (সা) আবার গেলে আল্লাহ্ পাক সে সংখ্যক কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন এবং ইরশাদ করা হলো ঃ ''যদিও নামায হবে পাঁচ বার কিন্তু সওয়াব ঐ পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই হবে। কারণ আমার হুকুমের কোন পরিবর্তন হয় না। হযরত মূসা (আ) আরো হালকা করার লক্ষ্যে হুযূর (সা)–কে পুনঃগমনের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু মহানবী (সা) বললেন ঃ 'আমার লজ্জা করে।' অতঃপর তাঁকে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' ভ্রমণ করানো হয়। যা এমন বিচিত্র সব রংয়ে ঢাকা ছিল যা তিনি জানতে সক্ষম হন নি। এরপর জিবরাইল (আ) তাঁকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। সেথায় মণি-মানিক্যের প্রাসাদ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো এবং তিনি দেখলেন যে জান্নাতের মাটি, মুশকের। –(বোখারী)

www.pathagar.com

অনন্য অর্থনৈতিক বিপ্লবের স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

আহমদ আবুল কালাম

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মাদর্শকে মুহাম্মাদানিজম (Mohammadanism) কিংবা এ জাতীয় কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নামে অভিহিত করা যায় না। এ আদর্শের একটা সার্থক ও তাৎপর্যবহ বিশিষ্ট নাম রয়েছে। সেটি হলো ইসলাম। যার অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান। মূলত আল্লাহতে আত্মসমর্পণের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত শান্তি নিহিত। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও শান্তির জন্যই ইসলামের আগমন, অনন্য বিপ্লবের স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব।

ধনসম্পদ বা অর্থের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত ও চিরন্তন। মানুষের সুখ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অর্থ ও অর্থ ব্যবস্থার ভূমিকা অবিসংবাদিত। ব্যক্তির ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে আন্তর্জাতিকতার প্রশস্ত অঙ্গনে পর্যন্ত কোন পর্যায়েই ধনসম্পদকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা ছাড়া সামগ্রিক জীবনে সুখ শান্তির আশা করা সুদূর- পরাহত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মখলুকাতের রহমতরূপে প্রেরিত। মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য তাঁর আদর্শ চির অনুসরণীয়। ইসলাম সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য জীবনযাত্রার অন্যান্য দিক ও বিভাগের মতো অর্থনৈতিক দিকের প্রতিও যথাযথ গুরুত্বারোপ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) যে আমূল পরিবর্তন

www.pathagar.com

আনয়ন করেন তার প্রকৃতি ও ফলাফল ছিলো সত্যিই বৈপ্লবিক। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছিলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী সমাজ।

মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন অনেক। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে সম্মুখীন হতে হয় প্রচুর অভাব এবং প্রয়োজনের। এর মধ্যে বেশ ক'টি প্রয়োজন নিতান্তই মৌলিক, যা পূরণ না করলে সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। যথা–

১. কর্ম ও ভোগের প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা।

২. মুক্ত মন নিয়ে চলাফেরার মত প্রকাশ ও ইপ্সিত পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা।

৩. সহজাত আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন।

এই সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সব সময়ই উদগ্রীব ও আগ্রহপ্রবণ। এ প্রয়োজন পূরণের নামে যুগে যুগে গড়ে ওঠেছে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত অনেক পথ আর মানুষ এ পথে শোষিত, নিষ্পেষিত হয়েছে বারবার। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ কিংবা ধর্মের নামে বৈরাগ্যবাদ–এর কোনটাই মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে সমর্থ হয়নি। পুঁজিবাদ কর্ম, ভোগ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করেছে বিপুল আর্থ–সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যের অবসানকল্পে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরে জন্ম নেয় সমাজতন্ত্র। এতে কর্মের ব্যবস্থা ও জীবন ধারণের সীমিত সুযোগ থাকলেও মুক্তমনের অনুশীলন কিংবা আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। মানুষ ব্যবহৃত হয় কেবল উৎপাদনের যন্ত্ররূপে। অন্যদিকে কোন কোন ধর্ম মতবাদ জীবনের বাস্তবতা–বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকে। এই তিনটি ধারার ইতিবাচক দিকগুলো খুঁজে পাওয়া যায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠিত অর্থ ব্যবস্থায়। এটা সত্য যে, ইসলামী অর্থনীতি এমন করে সাম্যপূর্ণ একটি অনুপম সমাজ ব্যবস্থায় স্থান করে, যেখানে ব্যক্তি এবং সমষ্টির সম্পর্ক এবং অর্থ বন্টন কোনক্রমেই সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। এর উদাহরণস্বরূপ খুলাফায়ে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ সম্পর্কে আদর্শরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত।

প্রিয়নবী (সা) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় উল্লিখিত মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। তাঁর প্রদর্শিত অর্থব্যবস্থার ভিত্তি সমাজ সংসারের প্রতি পূর্ণ দায়িত্বশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 'আর বৈরাগ্যকে তো তারা নিজেরা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। আমি (আল্লাহ্) তো বৈরাগ্যের নির্দেশ দেই নি। তারা এ বৈরাগ্য সৃষ্টি করেছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়। অবশ্য তার মর্যাদাও তারা যথার্থভাবে আদায় করেনি।' —সূরা হাদীদ ঃ ২৭

রসূল (সা) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।

প্রিয়নবী (সা) এ প্রেক্ষিতে যে অর্থনৈতিক দর্শন পেশ করেন, তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'মানুষ তো সম্পদের প্রতি প্রবল আসক্ত।'

—সূরা আদিয়াত ঃ ৮

'বল, কে হারাম করেছে উত্তম জীবিকা ও সুশোভিত দ্রব্যাদি যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' —সূরা আ'রাফ ঃ ৭

'আর আল্লাহ্ তো নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু।' —সূরা জাছিয়া ঃ ১৩

আল্লাহ্র কালাম ও নবী (সা)-র হাদীস শরীফ থেকে মানুষ উপলব্ধি করল আল্লাহ্র দেয়া এ বিশ্বজগত তাদেরই কল্যাণের জন্য নিয়োজিত। সুতরাং আল্লাহ্ প্রদত্ত এসব সম্পদ থেকে উপভোগ গ্রহণ করা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, ''হে আমাদের রব তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।'' —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৯১

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সা) যে মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করেন তা অবাধ নয় এবং স্বেচ্ছাচারিতা থেকে দূরে। এ ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল রূপে পেশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান–এসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণে প্রিয়নবী (সা)–র প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা অনন্য। প্রিয়নবী (স) বলেন, কোন ব্যক্তির উপর যদি আল্লাহ্ মুসলমানদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং সে যদি তাদের প্রয়োজন ও সমস্যাবলীর সমাধানে উদাসীনতা প্রদর্শন করে তা হলে আল্লাহ্ও তার প্রয়োজন পূরণে উদাসীন হন। –আবূ দাঊদ শরীফ

এখানেই শেষ নয়, সমাজে কেউ একাকী, ঋণগ্রস্ত কিংবা নিরুপায় থাকলে তাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণেরও দায়িত্ব বর্তায় তাঁর সমাজ ব্যবস্থার উপর। প্রিয়নবী (স) ইরশাদ করেন ঃ

০ যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সেই ব্যক্তির অভিভাবক। –কিতাবুল ফরায়েয ঃ তিরমিযী শরীফ

০ আমি মুসলমানদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং কোন মুসলমান ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে তার ঋণ পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। (অর্থাৎ তা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য)।

–কিতাবুল আমওয়াল ঃ আবূ উবায়দ

০ মৃত ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি রেখে গেলে তা হবে তার পরিবারবর্গের। কিন্তু পরিবারবর্গকে নিরুপায় রেখে গেলে তাদের ভরণ–পোষণের দায়িত্ব আমার উপর (অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের উপর) । –বাবুল ফরায়েয ঃ তিরমিযী শরীফ

মক্কী জীবনে সম্পদ বন্টন

মক্কী জীবনে হযরত রসূলে করীম (সা) ও তাঁর অনুসারীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এ সময় প্রিয়নবী (সা)–র ঈপ্সিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়নি, তবে এ সময়টা ছিল সে সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের একটা প্রস্তুতিকাল। এ প্রেক্ষাপটে প্রিয় নবী (সা) অর্থনৈতিক ভাবে কি নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন, তা আমরা একটা হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারি। হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ

আশ্আরী গোত্রের লোকদের মধ্যে একটা নিয়ম প্রচলিত ছিল। কোন যুদ্ধে তাদের নিকট কিছু খাবার উদ্বৃত্ত হলে কিংবা ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা পেলে

www.pathagar.com

সবার জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করা হত। তারপর একটি পাত্রে সমান ভাগ করে সবাই বন্টন করে নিতেন। এ প্রসঙ্গটা জানতে পেরে প্রিয়নবী (সা) বলেন, তারা আমাদের আর আমি তাদের। –বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

এ হাদীস প্রমাণ করে সে সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম অর্থনৈতিকভাবে সমবন্টনের নীতি চালু করেছিলেন।

মদীনা জীবনে অর্থ ব্যবস্থা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর ইসলামী সমাজ–ব্যবস্থা কায়েম করেন। সে সময় মদীনার মাটিতে প্রচুর স্বর্ণরৌপ্য আসে। অথচ এত সমৃদ্ধ অবস্থায়ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দরিদ্র জীবন–যাপন করেন। হযরত আয়েশা (রা)–র ভাষায় ঃ

ভাঁজ করে রাখার মতো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম–এর কোন কাপড়–চোপড় ছিল না। যে কাপড় পরা অবস্থায় তিনি ওফাত গ্রহণ করেন তাঁর উপরে ও নিচে তালি লাগানো ছিল। অধিকাংশ সময় তাঁর পরিবারকে উপোস থাকতে হত। রাতের বেলায় প্রায়ই তিনি ও তাঁর পরিবার অনাহারে থাকতেন। মদীনায় অবস্থানকাল থেকে ওফাত পর্যন্ত কোন দিনই পেট ভরে তিনি দু'বেলা আহার করেন নি।–সীরাতুন্নবী ঃ ১ম খণ্ড

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, প্রিয়নবীকে আল্লাহ্ অভাবমুক্ত করেছেন, এতদসত্ত্বেও তিনি এই দারিদ্র্য কেন বরণ করে নিলেন, তার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা হলো রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল বিরাট। তাঁর সমাজে একটা লোক অনাহারে থাকলে তার আহারের ব্যবস্থা ছিল তাঁরই দায়িত্বে। ফলে প্রিয়নবী (সা) সমাজের কল্যাণে তাঁর সম্পত্তি দান করেন। আর তাঁর এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহাবায়ে কিরামও একই পন্থা অবলম্বন করেন। ফলে এমন একটা সমাজ–ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে যেখানে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করাই ছিল ব্যক্তির সাধনা।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

প্রিয়নবী (সা) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কতগুলো মূলনীতির প্রতিষ্ঠা করেন–যার উপর ভিত্তি করে সর্বকালেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব। যথা–

১. সম্পদের মালিকানা ঃ আল্লাহ্‌র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্‌র।"

–সূরা বাকারা ঃ ২৮৪

২. জীবনোপায়ে সমান–অধিকারঃ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, পৃথিবীর কল্যাণ সামগ্রীতে রয়েছে যাচনাকারীদের সমান–অধিকার। –

–সূরা হা–মীম–আস–সিজদা ঃ ১০

৩. ব্যক্তির স্বত্বাধিকার ঃ কুরআনে ইরশাদ হযেছে, তারা তো এগুলোর স্বত্বাধিকারী। –সূরা য়াসীন ঃ ৭১

অবশ্য এ স্বত্বাধিকার অবাধ নয় বরং সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্যক্তির সম্পদে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার ন্যায়সঙ্গত।

৪. পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার অপনোদনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্পত্তি থেকে তাদের দিয়ে দাও যে সম্পত্তি আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন। –সূরা নূর ঃ ৩৩

এখানে 'তোমাদের সম্পত্তি' এর স্থলে 'আল্লাহ্‌র সম্পত্তি' ব্যবহার করে যেমনি পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি উপড়ে ফেলা হলো তেমনি 'যে সম্পত্তি আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন' বলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার মূলোৎপাটন করা হলো। –(দ্র. ইসলামে ধন বন্টন ব্যবস্থাঃ মু. শফী)

৫. পারস্পরিক সম্মতি ও সহযোগিতা অবলম্বনঃ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে সব রকমের লেনদেন কর। –

–সূরা নিসা ঃ ২৯

৬. সম্ভাব্য সমতা বিধানঃ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে বিত্তবানরা নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে তাদের অধীনস্থদের প্রদান করে না যাতে তারা

www.pathagar.com

তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্বীকার করে না?

প্রিয়নবী (সা) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামনে প্রেরণের সময় স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন-বিত্তবানদের থেকে সম্পত্তি গ্রহণ করা হোক আর তা বিতরণ করা হোক বিত্তহীনদের মধ্যে। -মিশকাত শরীফ

আর এরূপ বিধানের কারণ রূপে কালাম মজীদে ইরশাদ হয়েছে, যাতে সম্পত্তি কেলমাত্র বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তন না করে। -সূরা হাশর ঃ ৭

উৎপাদন

রসূলে করীম (সা) লোকদের আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি সম্পদ উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করে তোলেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সালাত সমাপ্ত হলে যমীনের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড় আর অন্বেষণ কর আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনোপকরণ। -সূরা জুম'আ ঃ ১০

হে আমার লোক সকল, তোমরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজ করে যাও। আমিও তো কাজ করে থাকি। -সূরা সুমার ঃ ৩

এর কারণ হিসাবে বলা হয় অকর্মণ্য অলস ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শত্রু আর উপার্জনকারী কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বন্ধু। বস্তুত রসূলে করীম (সা) নিজে যেমন শ্রম দিতেন, তেমনি তাঁর কাছে শ্রম ও স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা ছিল অপরিসীম। তিনি বলতেন ঃ

নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউই খায়নি। আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপর্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। -(বুখারী শরীফ)

রসূলে করীম (সা) উপার্জন ও উৎপাদনের জন্য কেবল উৎসাহই দেন নি, পাশাপাশি উৎপাদনের বিভিন্ন পথ ও পন্থাও বাতলিয়ে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে জীবজন্তু, বৃক্ষগুল্ম, জড় পদার্থ, শিল্প, পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (দ্র.ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ ঃ ডঃ ইউসুফ উদ্দীনঃ অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ.)

www.pathagar.com

ক. জীবজন্তু ঃ রসূলে করীম (সা) লোকদেরকে মৎস্য শিকার, জীবজন্তু শিকার, পশুপালন, পশু বংশোন্নয়ন প্রভৃতি থেকে জীবিকা নির্বাহের উপদেশ দিতেন।

কোন এক সাহাবী প্রিয়নবী (সা)-র খিদমতে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! শিকারই হচ্ছে আমার পেশা। আর এ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন জামা'আতে সালাত আদায় করা আমার জন্য সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। সুতরাং আমি কি করতে পারি বলুন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন এ পেশাটি কতই না সুন্দর! আমার পূর্বের নবীরা সকলেই শিকারী ছিলেন। তাঁরা শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন অনেক দূরে। আর জামা'আতে সালাত আদায় করা তো মুকীম (স্থায়ী আবাসে অবস্থানরত) ব্যক্তির জন্য। অতএব তুমি যখন জীবিকার সন্ধানে থাকার দরুন জামা'আতে উপস্থিত হতে না পার, তখন জামা'আতে অংশগ্রহণকারী এবং আল্লাহ্র ভালবাসা অন্তরে অব্যাহত রেখো। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি তোমার পরিবার পরিজনদের জন্য বৈধ পন্থায় বেশি করে উৎপাদন কর। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

—তাবারানী শরীফ

খ. বৃক্ষগুল্ম ঃ এ পর্যায় জংগল কাটা চারণভূমি, কৃষিকাজ, উদ্যান রচনা প্রভৃতি পন্থায় সম্পদ উৎপাদনের জন্য হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, তোমাদের কেউ রশি নিয়ে পাহাড়ের উপর চলে যাক আর নিজের পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে উত্তম, আর ভিক্ষার ক্ষেত্রে তো এমন ঘটে যে মানুষ তাকে দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। —বুখারী শরীফ

গ. জড় পদার্থঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বৃক্ষগুল্মের মত জড় পদার্থ ও খনিজ সম্পদ থেকেও সম্পদ আহরণের আহবান জানান। সমুদ্রগর্ভ থেকে সম্পদ আহরণের কথা তিনিই প্রথম জানিয়েছেন তাদেরকে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আর তিনি তো সাগরকে তোমাদের বশীভূত করেছেন

www.pathagar.com

যাতে তোমরা তাজা মৎস আহার করতে পার আর আহরণ করতে পার ব্যবহার্য অলংকোরাদি। —সূরা নহল ঃ ১৪

ঘ. শিল্প ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুরআনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রতি আরবদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এগুলোর মধ্যে খনিজ শিল্প, চামড়া শিল্প, রেশম শিল্প, অলংকার শিল্প, মৃৎশিল্প, কার্পেট শিল্প, জুতা তৈরি শিল্প, বর্মশিল্প ও নির্মাণ শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পগুলো প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঙ. পরিবহনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময় জীব-জানোয়ার ও নৌযানই ছিল প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে আর উহারা (অর্থাৎ পশুরা) তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় (দূর-দূরান্তের) নগরগুলোতে অথচ প্রাণপণ পরিশ্রম ব্যতীত তোমরা সেখানে পৌছতে পারবে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অতিশয় স্নেহপরায়ণ কৃপানিধান।

তোমাদের প্রভু তো তিনিই, যিনি সাগরে নৌযানগুলোকে পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর নিয়ামত লাভ করতে পার। তিনি হচ্ছেন তোমাদের প্রতি কৃপানিধান। —সূরা ইসরা ঃ ৬৬

চ. ব্যবসা বাণিজ্যঃ আরব সমাজে উৎপাদন ও উপার্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে মক্কা ছিল তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশিম বছরে দু'টো বাণিজ্য সফরের ব্যবস্থা করেন, একটি শীতকালে ইয়ামনে আরেকটি গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি রয়েছে। আসক্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের (বাণিজ্য) সফরে। অতএব তাদের উচিত তারা যেন এই (কা'বা) গৃহের প্রভুর দাসত্ব করে। —সূরা কুরায়শ ঃ ১, ২ ও ৩

আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটে একজন ব্যবসায়ীর যে মর্যাদা ও সম্মান তা হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

সত্যবাদী মু'মিন ব্যবসায়ী নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত।

-মিশকাত শরীফ

উপার্জনে বিধি-নিষেধ

সময়ের ব্যবধানে উপার্জনের প্রক্রিয়া ও উপায়ের মধ্যে পরিবর্তন আসে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উৎপাদনের বিভিন্ন খাত ও পন্থা বাতলিয়ে দিলেও তা আজকের যুগে এসে বিস্তার লাভ করেছে সীমাহীনভাবে। ভবিষ্যতে হয়ত আরো অনেক অজানা প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্ভবপর হবে। এ পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল-কুরআনের মাধ্যমে কতগুলো বাঁধা নিষেধের কথা জানিয়ে দিয়েছেন যেগুলোর প্রতি যে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য। যেমনঃ

ক. আত্মসাৎ ঃ তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করো না।

-সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

খ. উৎকোচ ঃ জেনেশুনে মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের উৎকোচ দিও না। -সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

গ. চুরি-ডাকাতিঃ চোর পুরুষ হোক কি নারী হোক তার হস্তচ্ছেদন কর।

-সূরা মায়িদা ঃ ৩৮

ঘ. বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থোপার্জনঃ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত করে কশাঘাত কর। -সূরা নূর ঃ ২

ঙ. মদের উৎপাদন, ব্যবসা ও পরিবহন ঃ জুয়া, মূর্তি পূজার সরঞ্জাম এবং ভাগ্য গণনা প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থোপার্জন নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর-এগুলো নিতান্ত ঘৃণ্যবস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং এসব তেমরা পরিহার কর। -সূরা মায়িদা ঃ ৯০

চ. যে কোন প্রকার প্রতারণামূলক লেনদেনঃ ধ্বংস তাদের অনিবার্য যারা প্রবঞ্চনা করে। যারা লোকদের থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। কিন্তু যখন তাদের জন্য মেপে দেয় কিংবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।

-সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ১-৩

www.pathagar.com

ছ. অশ্লীলতার উপায়–উপকরণের যে কোন ব্যবসাঃ নিশ্চয়ই যারা মু'মিন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি। –সূরা নূর ঃ ১৯

জ. সূদ ও সূদতুল্য যাবতীয় উপার্জন ঃ আল্লাহ্ ব্যবসা হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম। –সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

তোমরা যদি সূদী কারবার ছেড়ে না দাও তবে জেনে রাখ এটা হবে আল্লাহ্ ও তার রসূলের সংগে যুদ্ধ। –সূরা বাকারা ঃ ২৭৯

ভোগ

প্রিয় নবী (সা)–র অর্থ–ব্যবস্থায় ভোগের ক্ষেত্রে দু'টো মূলনীতি বিদ্যমানঃ

১. অপব্যয় না করাঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আহার কর, পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ্ অপব্যয় কারীদের পছন্দ করেন না। –সূরা আরাফ ঃ ৩১

২. ভারসাম্য রক্ষা করা ঃ উপার্জিত সম্পত্তি যেমনি সবটা নিজে ভোগ করা নিষিদ্ধ তেমনি সবটা সমাজের ভোগেও ব্যয় করা যাবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

আর তারা যখন ব্যয় করে তো তারা অসঙ্গত ব্যয় করে না, আবার কুক্ষিগতও করে না; বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যে ভারসাম্যমূলক পন্থা অবলম্বন করেন। –সূরা ফুরকান ঃ ৬৭

প্রিয়নবী (সা) ছিলেন অর্থ পুঞ্জীভূত বা কুক্ষিগত রাখার ঘোর বিরোধী। তিনি বলতেন–'আমার নিকট যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে তবুও তার একটি দীনার অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমার উপর তিনটি রাত্রি অতিবাহিত হোক তা আমি কখনো পসন্দ করি না। –বুখারী শরীফ

এর কারণও সুস্পষ্ট। স্বয়ং প্রিয়নবীর ভাষায়,–যারা ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে ব্যয় করে না, বিচার দিনে তাদের কপালের পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠে আগুনের দাগ কেটে দেয়া হবে। প্রিয়নবী (সা) এ সতর্কতা প্রদানের পাশাপাশি কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে

www.pathagar.com

রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদের তুমি মর্মন্তুদ শাস্তির সু-সংবাদ দাও। –সূরা তাওবা ঃ আয়াত ৯ মিশকাত শরীফ

সম্পদ বন্টন

প্রিয়নবী (সা) প্রবর্তিত ধনবন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্যান্য মতাদর্শ থেকে ভিন্নতর। এ ব্যবস্থায় দুই পর্যায়ের লোকের মধ্যে সম্পদ বন্টন হয়ে থাকেঃ

প্রথম পর্যায়ের লোক উৎপাদন ও উপার্জনে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের মধ্যে সম্পদের বন্টন করা হবে। এতে ভূমি ভাড়া হিসাবে শ্রম, মজুরি হিসাবে এবং মূলধন ব্যবস্থা হিসেবে উৎপাদনের অংশ পাবে। মূলধন যেমন সূদ পাবে না তেমনি মূলধনের মালিককে সংগঠন তথা লাভ লোকসানের ঝুঁকি নিতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক দুস্থ, অসহায়, বেকার প্রভৃতি লোক যারা উৎপাদনে অংশ- গ্রহণ করেনি, কিন্তু উৎপাদক ও বিত্তবানরা তাদের মধ্যে সম্পত্তি বিতরণ করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। দ্র ঃ ইসলামে ধনবন্টন ব্যবস্থা মু. শফী

এ পর্যায়ের খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. যাকাতঃ নগদ টাকা, অলংকার, ব্যবসায়ের পণ্য এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত গাড়ি বাড়ি থেকে শতকরা ২.৫০% (আড়াই টাকা) হারে যাকাত দিতে হয়। আর এসব যাকাত বন্টনের খাত আটটা যথা-১. নিঃস্ব, পংগু ২. অভাবী বেকার ৩. যাকাত সংস্থার কর্মচারী. ৪. অমুসলিমদের অন্তরাকর্ষণ ও নওমুসলিম ৫. দাস ও বন্দী মুক্তি ৬. ঋণ মুক্তি ৭. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ ও ৮. অভাবী পথিক। সূরা তাওবা ঃ ৬০

২. ওশর ঃ ভূমির উৎপাদন থেকে ওশর দিতে হয়। প্রিয়নবী (সা)–র নির্দেশ মতে স্বাভাবিকভাবে সিক্ত ভূমি থেকে ১০ ভাগের ১ ভাগ এবং কৃত্রিমভাবে সিক্ত ভূমি থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ প্রদান করা অপরিহার্য। এটাও যাকাতের খাতসমূহে বন্টিত হবে।

www.pathagar.com

৩. সদকায়ে ফিত্‌র ঃ এটা প্রধানত গরীব-দুঃখীদের আনন্দ উল্লাসের জন্য ঈদুল ফিত্‌রের সময় আদায় করতে হয়।

৪. কাফ্‌ফারা ঃ কেউ ইচ্ছা করে রোযা ভঙ্গ করলে কিংবা জিহার করলে অথবা অনিচ্ছায় কাউকে হত্যা করলে নগদ টাকা খোরাকি হিসাবে কাফ্‌ফারা দিতে হয়।

৫. নাফাফাত ঃ স্ত্রী, সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে বলা হয় নাফাফাত।

৬. ওয়ারাসাত বা পরিত্যাজ্য সম্পত্তি ঃ কোন লোক মারা গেলে তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি আত্মীয়তা নৈকট্যানুসারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বন্টন করে দিতে হয়।

৭. খিরাজ ঃ বিজিত অমুসলমানদের সম্পত্তি ও যিম্মীদের মালিকানাধীন জমি থেকে তারা যে অংশ প্রদান করতে বাধ্য তাকে বলা হয় খিরাজ।

৮. জিযিয়াঃ জানমালের নিরাপত্তার বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমকে জিযিয়া প্রাদন করতে হয়।

৯. এছাড়া ফায়, গনীমাহ প্রভৃতি খাত থেকেও সম্পদের একটা নির্দিষ্ট অংশ সমাজের কল্যাণে বন্টন করতে হয়।

সম্পদ বন্টনের যে খাতসমূহের উল্লেখ করা হলো, তা মূলত সমাজের প্রতি ব্যক্তির ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমাজ ব্যবস্থায় এ একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিধান। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা মহৎ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্যভাবে কার্যকর। আর তা হচ্ছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে মানুষের মধ্যে এমন এক দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করেন যাতে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে স্বার্থের চেয়ে পরার্থের, নিজের চেয়ে সমাজের কল্যাণ সাধনে সদা তৎপর থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঠিক এমনই একটা সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। ফলে তাঁর সমাজের লোকেরা নিজেদের স্বার্থ ও উন্নতির কথা ভুলে গিয়ে কেবল জিজ্ঞেস করতেন তাঁরা

www.pathagar.com

কিভাবে দান করবেন, তাঁরা কি ব্যয় করবেন। কিভাবেই বা করবেন সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

তারা (হে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? বলে দিন, তোমরা প্রয়োজনীতিরিক্ত সব বিলিয়ে দাও।

–সূরা বাকারা ঃ ২১১

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে এক সফরে ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে আমাদের ডানে বামে দেখতে লাগল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত যানবাহন আছে, যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে দাও। যার নিকট পথ খচ বেশি আছে যার নেই তাকে দিয়ে দাও। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ রকম অনেক কিছুর উল্লেখ করলেন। তাতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন সম্পদ রাখার আমাদের অধিকার নেই। –দ্র. মুসলিম শরীফ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পদের কোন প্রকার অপচয় পছন্দ করতেন না। বরং একটা সামান্য বিষয় থেকেও যাতে উপযোগ লাভ করা যায় সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

একবার একটা মৃত বকরী দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–তোমরা এর চামড়া থেকে ফায়দা নিচ্ছ না কেন? লোকেরা বলল এটা তো মৃত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–কেবলমাত্র এটা ভক্ষণ করা তো হারাম (অন্য সব ফায়দা নেয়া তো আর হারাম নয়)।

–দ্র. বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

ইবন খালদূনের মতে গ্রাম্য আরবরা শুস্তক, ফড়িং ,বিচ্ছু প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করত। এমনকি ক্ষুধায় অস্থির হলে তারা উটের লোম রক্তের সংগে মিলিয়ে গিলে ফেলত। কুরায়শদের অবস্থাও ছিল মোটামুটি একই ধরনের।

–ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ ঃ ডঃ ইউসুফ উদ্দীন

www.pathagar.com

অনন্য অর্থনৈতিক বিপ্লবের স্রষ্টা মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দীন-ই-ইসলাম প্রচারের পর এই ক্ষুধাতুর নিঃস্ব আরব তথা ইসলামী সমাজভুক্ত বৃহত্তর এলাকার অবস্থা এত সচ্ছল হয়ে ওঠে যে, পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজে যাকাত গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

বাংলা সাহিত্যের বিশাল আঙিনা জুড়ে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বৈভবের ঋজুতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসলামী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারবিন্বিত এক মহা কাব্যাঙ্গন, সমৃদ্ধশালী সাহিত্য ভান্ডার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আজকে যে দিগন্তব্যাপী উজ্জ্বলতা, জগত জোড়া অভিব্যক্তির সৌরভে ভাস্বর, এ স্থপতি নির্ণয়ে আমাদের যেতেই হয় মুসলিম সুলতানী যুগে। মুসলমান সুলতানদের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা গতিবান ও বিকাশমান ভাষার রূপ নেয় এবং তাই হয়ে উঠে আধুনিক বাংলার আদি রূপ। মুসলমানদের পূর্বে বাংলা ভাষাকে বিকশিত করার প্রক্রিয়া কেউ করার চেষ্টা করেনি। বাংলা ভাষা তাঁর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অবয়ব নিয়ে এ দেশের মানুষের মুখে ভাব বিনিময়ের, কথোপকথনের মাধ্যম হিসেবে নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবহমান ছিলো। তখন ব্রাহ্মণরা এই ভাষাকে ইতরজনের ভাষা রূপে চিহ্নিত করে। মুসলমানরা এসে সেই নিগৃহীত ও উপেক্ষিত ভাষাকে শুধু গতিই দেয়নি, সংগে সংগে একে করে তোলে জাতীয় ঐতিহ্যমন্ডিত। সমহিমায় বাংলা ভাষা পদ্মার ঢেউয়ের মতো, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মতো এক প্রাণ স্পন্দনে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠে, উজ্জীবিত হয়ে উঠে।

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ৬৪০ খৃস্টাব্দ নাগাদ অর্থাৎ ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালে। যতদূর জানা যায় প্রথম যে দলটি এখানে ইসলাম প্রচারার্থে আগমন করেন তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুদ ও হযরত মুহায়মিন। ইসলাম এখানে নিয়ে আসে তৌহিদী বাণী 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্।' ইসলামের এই কলেমায় বিমুগ্ধ ও বিমোহিত এ দেশের মানুষ দলে দলে এই কলেমা পড়ে সার্থক জীবন লাভ করে। জীবনের সঠিক সন্ধান, মুক্তির প্রকৃত দিশা পেয়ে তারা স্পন্দিত হয়ে উঠে। অন্ধকার থেকে তাদের উত্তরণ ঘটে আলোয়। তাদের অন্তরে গেঁথে যায় ঐ তৌহিদী কালাম 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন ইতিহাস জানার আগ্রহও তখন থেকেই এ দেশের মানুষের হৃদয়ে জাগরিত হয়। ইসলাম প্রচারক সূফীয়ায়ে-কিরাম তাঁদেরকে মহফিলের মাধ্যমে, ওয়াজের মাধ্যমে, প্রিয়নবী (সা)-র জীবন কথা শোনেন। কুরআনুল করীম ও হাদীস শরীফ পাঠ করে প্রিয়নবী (সা)-র জীবন কথা জানার প্রক্রিয়াও এখানে চলতে থাকে হিজরতকালীন। প্রিয়নবী (সা)-র সম্বর্ধনায় মদীনবাসী যে ছন্দায়িত বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলেন হৃদয়ের তালে তাও এখানে সুরের মূর্ছনায় গীত হতে থাকে। মদীনার বাণীধারা বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করতে থাকে। ঘরে ঘরে সম্মিলিত উচ্চারণে ধ্বনিত হতে থাকে ঃ

তালা'আল বদরু আলায়না,
মিন সানিয়াতিল বিদা'য়ী
ওয়াজাবাশ শুকরু 'আলায়না,
মাদা'আলিল্লাহি দা'য়ী।

প্রিয়নবী (সা)-র উদ্দেশ্যে সালাত এবং সালামের ধারাও এখানে তখন থেকেই সমানভাবে চলতে থাকে। প্রাণের সবটুকু শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্যে এদেশের মানুষ গাইতে অভ্যস্ত হয়, আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া নবীআল্লা আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া হাবিবাল্লাহ--- কিম্বা ইয়া নাবী সালামু আলায়কা, ইয়া রাসূল সালামু আলায়কা, ইয়া হাবিব সালামু আলায়কা, সালাওয়া তুল্লাহ আলায়কা । পরবর্তীকালে বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদদুজা বিজামালিহি, হাসুনাত জামি'উ খিসালিহি, সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি এবং মিলাদ মহফিলের রেওয়াজও এখানে ব্যাপকভাবে চালু হয় প্রথমদিকে আরবী, ফারসী, তুর্কী ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রিয়নবী (সা)-র জীবনাদর্শ, জীবনকথার

www.pathagar.com

চর্চা হতে থাকে। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সাথে সাথে প্রিয়নবী (সা)–র জীবনাদর্শ ও সীরাত সম্পর্কিত গ্রন্থরাজি প্রকাশ হতে থাকে ব্যাপকভাবে। এদেশের মানুষের সামনে এক তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক আস্বাদনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন ইতিহাস, কর্ম ও আদর্শের ইতিহাস ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশের ধারায় প্রস্ফুটিত হতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী (সা)–র পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' প্রথম ব্যবহার হয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রামাই পন্ডিতের পুঁথি শূন্যপুরাণের কলেমা জাল্লাল বা রুদ্র বাক্য (নিরঞ্জনের রুষ্মা)–তে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সংগে সংগে বাংলা ভাষায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঁথি রচনা শুরু হয়। সম্ভবত এই শতাব্দীর শেষার্ধে কিম্বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের দরবার–কবি জৈনুদ্দীন রসূল বিজয় কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রিয়নবী (সা)–র দিগ্বিজয় কাহিনী অবতারণা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিজয় অভিযানের বর্ণনা দিতে যেয়ে বলা হয়েছেঃ

"তার পাছে মাগে সাজ নবী রাজেশ্বর।
মুকুতা মন্ডিত তাজ অতি মনোহর।।
লাল যে কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সভা পরম সুন্দর।
নবীর কিঙ্কর ছিল নামে যে বিল্লাল।
বিবিধ বিধানে অশ্ব সাজায় তৎকাল।।
সুচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ মন্ডিত।
হীরার লাগাম জিন মুকুতা শোভিত।।

সেই অশ্ব পরে নবী আরোহণ যবে।
আদ্য ছত্র ধরি ছায়া করিলেন্ত তবে।।

www.pathagar.com

সুসজ্জ হইয়া নবী যুদ্ধ যাত্রা কৈলা।
মঙ্গল বিধানে সৈন্য বলিতে বলিলা।।

'রসূল বিজয়' কাব্য নামে এই সময় আর একখানি পুঁথি রচনা করেন শাহ্ বিরিদ খান। অবশ্য ভাষার প্রাচীনত্ব যাচাই করতে গেলে শাহ বিরিদ খানের 'রসূল বিজয়' কাব্যখানি সর্ব প্রাচীন সীরাত গ্রন্থ্ বলে অনুমিত হয়। জৈনুদ্দীনের রসুল বিজয় এবং শাহ বিরিদ খানের রসুল বিজয়ের কাহিনী এক হলেও কাব্য বিচারে শাহ বিরিদ খানের রচনা অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল। শাহ্ বিরিদ এই গ্রন্থ্ রচনা সম্পর্কে বলেনঃ

সাবিরিদ খানে কহে রসুল বিজয়।
শুনি বুধ কর্ণ পুরি সুধা বরিখয়।।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সৈয়দ সুলতান ওফাৎই রসূল, রসুল বিজয়, নবী বংশ, শবই মিরাজ ইত্যাদি সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ্ রচনা করেন। 'নবী বংশ' কবির শ্রেষ্ঠ কর্ম। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এই কাব্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি মহান আদর্শ বলে মন্তব্য করেছেন। কবি নিজেও এই গ্রন্থ্ রচনা সম্পর্কে বলেছেনঃ

কহে ছৈয়দ ছোলতানে শুন নরগণ।
এহি হিন্দি নবী-বংশ শুন দিয়া মন।।
আছিল আরবী ভাষে হিন্দী করিলু।
বঙ্গ দেশী বুঝে মত প্রচারিয়া দিলু।।

এই সময় অন্যান্যের মধ্যে শেখ পরাণের 'নূরনামা', মীর মুহম্মদ শফীর 'নূর কন্দিল' উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি গ্রন্থেই নূর-ই মুহম্মদী সৃষ্টি রহস্য এবং তাঁর থেকে সারা মখলুকাত সৃষ্টির বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, নূর নামা ও রসুল বিজয় নামে পরবর্তীকালে আরও বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ্ রচিত হয়।

প্রিয়নবী (সা)-র জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আবদুল গফুর 'খায়ের বরকত' নামক গ্রন্থ্ রচনা করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় জমিরউদ্দীনের 'ওয়াজিয়াতুন্নবী'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাদেক আলীর 'হালাতুন্নবী'(১৮৭৪ খৃ), অতুল কৃষ্ণ

www.pathagar.com

মিত্রের ধর্মবীর মোহাম্মদ (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ), গিরিশ চন্দ্র সেনের মোহাম্মদের জীবন চরিত (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ), শেখ আব্দুর রহিমের হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জীবন চরিত ও ধর্ম নীতি (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ), মুনশী বুরহান উল্লাহ্‌র হালাতুন্নবী (১৮৯৬ খৃ), গিরিশ চন্দ্র সেনের মহাপুরুষ মোহাম্মদ (স) ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম।

মূলত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর ৮০ দশক থেকে নতুন আঙ্গিকের সূচনা হয়। বিংশ শতাব্দী নিয়ে আসে এই রচনা ধারায় এক বৈপ্লবিক উদ্দীপনা। আমরা লক্ষ্য করেছি প্রিয়নবী (সা)–র সীরাত সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু লেখকরাও বই লিখেছেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রিয়নবী (সা)–র জীবন ইতিহাস ও না'ত রচনায় এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কবি মোজাম্মেল হকের হযরত মোহাম্মদ (সা) (১৯০৩), রাম প্রাণ গুপ্তের হযরত মোহাম্মদ (১৯০৪), কবি মুহম্মদ দাদ আলীর আশেকে রসূল (১৯০৭), মহেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর শেষ পয়গম্বর (১৯১০), সরাফত আলীর 'হযরত মুহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও ধর্মোপদেশ ' (১৯১০) প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় প্রিয়নবী (সা)–র জীবন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর এই ৮০ দশক পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় চার শ'র মতো। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। প্রিয়নবী (সা)–র উপর প্রশংসামূলক না'ত ও গযলের সংখ্যাও বোধ করি সংগ্রহ করলে প্রায় ২/৩ হাজার পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে যিনি বিশেষভাবে সর্বস্তরে একটি গযল দিয়েই আলোড়নের সৃষ্টি করেন, তিনি হচ্ছেন যশোরের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্। সম্ভবত তাঁর রচিত 'গাওরে মোছলেমগণ নবীগুণ গাওরে, পরান ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে' মিলাদ ওয়াজ মাহফিলে এককালে সর্বাধিক গীত গযল। এর সুরের আবেদন আজও বহুলাংশে রয়েছে। নিম্নে সম্পূর্ণ গযলটি পত্রস্থ করা হলো ঃ

গাওরে মোছলেমগণ নবীগুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে।।
আপনা কালামে নবীর ছালামে

www.pathagar.com

তাকিদ করেন বারি
কালেবেতে জান কহিতে জবান
যে তক থাকেগো জারি
যে বেশে যে ভেসে যে দেশেতে যাওরে
গাও গাও গাও সবে ছাল্লে আলা গাওরে।।
হযরত আদম গোনাতে যেদম
বেদম কাঁদিয়াছিল
পাইল রেহাই মোস্তফা দোহাই
যে দমে দিয়াছিল
তাই বলি পাপী যদি পাপ ক্ষমা চাওরে
ত্বরা করি প্রাণ তরি ছাল্লে আলা গাওরে।।
নূহ পয়গম্বর হুকুমে আল্লা'র
জাহাজ বানান যবে
উপরে তাহার নাম মোস্তফার
লিখেলে ভাসিল তবে
ভব পারে যেতে যার বাসনা সে আওরে
হৃদয় জাহাজে লিখে নবী গুণ গাওরে।।

উল্লেখ করা যেতে পারে, তখনও আমাদের মিলাদ মাহফিলে বাংলা গান (গযল) চালু হয়নি। তাই দেখা যায় কি মিলাদ মাহফিলে, কি ওয়াজের জলসায় মুনশী সাহেবের এ গান মুখে মুখে ফিরছে। আজও তার বিরাম নাই। (দ্র. মুহম্মদ আবু তালিব। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবনাদর্শ সর্বকালে সব মানুষের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ। সত্য, সুন্দর ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে পথের দিশা দিয়ে গেছেন, মানবতার যে বাণী শুনিয়ে গেছেন তা জানার, শোনার, উপলব্ধি করার ও আত্মস্থ করার আগ্রহ প্রতিটি মুসলমানের। এই আগ্রহ

www.pathagar.com

থেকেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থ ও তাঁর হাদীস বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রসারিত ও প্রচারিত হয়। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আত্মিক অনুভবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। মদীনা মনওয়ারা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারক বাংলা সাহিত্যে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। উপস্থাপিত হয়েছে নবতর আঙ্গিকে, প্রেমের উত্তাল তরঙ্গায়িত অনুভব আর উচ্ছ্বাসের আকুল আবেদনে। সীরাত গ্রন্থের পাশাপাশি অসংখ্য গযল-না'ত রচিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সীরাত গ্রন্থের মধ্যে বিংশ শতাব্দী এলে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। প্রিয়নবী (সা)-র জীবনচরিত গদ্যে ছাড়া পদ্যেও রচিত হয়। তাছাড়াও এমন কিছু সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়, যেগুলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ও জীবন-বৈশিষ্ট্য জানার পথ সুগম করে দেয়। সেকালে খৃস্টান পাদরীরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত নিয়ে নানা অপপ্রচারে মেতেছিলো, তখন বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। সে সবের জবাব দেবার জন্য তাঁর মধ্যে উল্লেখ করা যায়, শেখ মুহম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদের ইঞ্জিলে হযরত মুহম্মদ (সা) ও পাদ্রী রউফ সাহেবের সাক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন ইত্যাদির কথা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতসমূহের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে এসে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম খয়েরা তুল্লাহর 'তারিফে রসূল,' শেখ ফজলুল করীমের পরশমণি, হযরত পয়গম্বরের জীবনী, সারা তৈফুরের স্বর্গের জ্যোতি, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহর ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ, নাজেম উদ্দীন আখতারের হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, খান বাহাদুর আলিমুদ্দিন আহমদের সম্রাট পয়গাম্বর, মেয়রাজ উদ্দীনের শান্তি কর্তা বা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী, আফতাবউদ্দীন আহমদের আদর্শ মানব, ইয়াকুব আলী চৌধুরীর নূর নবী, মানব মুকুট, সূফী সদরুদ্দীনের আমার প্রাণের রসূল (সা), মওলানা ফজলুল করীমের আদর্শ মানব বা হযরতের আদর্শ জীবনী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মরু ভাস্কর, মোজাম্মেল হকের হযরত ও মোহাম্মদ,

www.pathagar.com

আবদুল জব্বার সিদ্দিকীর মানুষের নবী, এ. এফ. এম. আবদুল মজিদ রুশদীর রাসূলুল্লাহের (সা) সৈনিক জীবন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নবীর সন্ধানে, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (সা), মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঙ্গীর নগরীর নবীশ্রেষ্ঠ, মোঃ আবদুল হাকিমের শ্রেষ্ঠ নবী প্রভৃতি সহ প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু ও ফারসী ভাষা থেকে বেশ কিছু সীরাত গ্রন্থ বাংলা ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। মওলানা আকরম খাঁর মোস্তফা চরিত, কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী এবং প্রফেসর মওলানা সূফী আবদুল খালেকের সাইয়েদুল মুরসালীন মৌলিক সীরাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশ্বনবী ও সাইয়েদুল মুরসালীন গ্রন্থ দুখানি এক অনন্য ভাষা ব্যঞ্জনায় পাঠক মন কেড়ে নেয়। বিশ্বনবীর প্রকাশভংগী কাব্যিক আঙ্গিকে বিকশিত, যেমন এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমিনার কোলে শিরোনামে লেখক বলেছেনঃ

রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ।

সোমবার।

শুক্লা-দ্বাদশীর অপূর্ব চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। সুবৃহে সাদিকের সুর্খনূরে পূর্ব আসমান রাঙা হইয়া উঠিতেছে। আলো আঁধারের দোল খাইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলিতেছে।

বিশ্ব প্রকৃতি আজ নীরব। নিখিল সৃষ্টির অন্তরতলে কি যেন একটা অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনা রহিয়া রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ স্বপ্নসাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত সেই নিরাশার বেদনা আজ যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটিরে একটি নারী ঠিক এই সময়ে সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

নাম তাঁর আমিনা।- - - - - - - - - - - - - - - -

আমিনা কুটিরেই বা আজ কী অপরূপ দৃশ্য,

কারা ওই শ্বেতবসনা পুণ্যময়ী নারীরা ? বিবি হাওয়া, বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়াম সবাই আজ তাঁহার শিয়রে দন্ডায়মান। বেহেশতী নূরে সারা ঘর আজ আলোকিত। বেহেশতী খুশবুতে বাতাস আজ সুরভিত। - - - -

www.pathagar.com

আরবের মরু দিগন্তে আজ একি আনন্দোচ্ছ্বাস ! মরি ! মরি ! আজ তার কী গৌরবের দিন। - - -

বিশ্ব ভুবনে আল্লাহ্‌র অনন্ত আশীর্বাদ ও অফুরন্ত কল্যাণ নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, জড়-চেতনে আজ যেন সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার এক মহাতৃপ্তি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মহাকাল-ঋতুচক্রে আজ কি প্রথম বসন্ত দেখা দিল ? প্রকৃতির কুঞ্জবনে আজ কি প্রথম-কোকিল গান করিল ? কে এই নব অতিথি--কে এই বেহেশতী নূর-যাঁহার আবির্ভাবে আজ দ্যুলোকে-ভূলোকে এমন পুলক-শিহরণ লাগিল ?

এই মহামানব শিশুই আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর-নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ--মানব জাতির চরম এবং পরম আদর্শ-স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ-সাল্লাম)।

বিশ্বনবী গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ্ সূফী আবূ নসর মুহম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (রহ) মন্তব্য করেন - - উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা কোরআন ও হাদিস শরীফ এবং তাছাউফের অনুকূল ও সুন্নাতুল জামায়াতের আকায়েদ মোয়াফক। (দ্র. বিশ্বনবীর অভিমত পৃষ্ঠা)। বিশ্বনবী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে।

প্রফেসর মওলানা সূফী মুহম্মদ আবদুল খালেক (রহ)-এর সাইয়্যেদুল মোরছালিন গ্রন্থখানি দুই খন্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থখানিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন-ইতিহাসের বিস্তারিত ও প্রামাণ্য বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এতো বিস্তারিত ও প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ দ্বিতীয়টি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমাদের দেশের মুসলিম কবিগণ কমবেশি সবাই প্রিয়নবী (সা)-র প্রশংসামূলক কবিতা,না'ত, গযল ইত্যাদি রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ। তিনি না'ত রচনার যে প্রাণবন্যা ও শব্দ সংযোজনের বৈপ্লবিক ধারা সৃষ্টি করেন তা অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রাণ

www.pathagar.com

স্পন্দনের এক প্রত্যক্ষ আবেদন দিয়ে রচিত হয়েছে কবি নজরুল ইসলামের না'তগুলো। তাঁর প্রতিটি না'তেই নবীপ্রেমের নিবিড় আকর্ষণ বিরাজমান। কবি প্রচুর না'ত লিখেছেন। তাঁর প্রতিটি না'তই বিখ্যাত এবং পরিচিত। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত না'ত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

নাম মোহাম্মদ বোল্‌রে মন্‌ নাম আহমদ বোল্‌
যে নাম নিয়ে চাঁদ–সিতারা আসমানে খায় দোল।।
পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা
ত্রিভুবনে যে নাম মাখা,
যে নাম নিতে হাসীন্‌ উষার রাঙে রে কপোল।।
যে নাম গেয়ে ধায়রে নদী
যে নাম সদা গায় জলধি,
যে নামে বহে নিরবধি পবন হিল্লোল।।
যে নাম বাজে মরু সাহারায়,
যে নাম বাজে শ্রাবণ–ধারায়,
যে নাম চাহে কা'বার মসজিদ মা আমিনার কোল।।

কবি নজরুল ইসলাম না'ত যেমন লিখেছেন পাশাপাশি ফাতেহা–ই দোয়াজ দহম নামে কবিতাও রচনা করেছেন। তাছাড়াও মরু ভাস্কর নামে তিনি কাব্যে প্রিয় নবী (সা)–র পূর্ণাংগ জীবনচরিত রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই পূর্ণাংগ জীবনচরিত সম্পূর্ণ লেখার আশা পূরণ হবার পূর্বেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি এর শেষ পরিচ্ছেদের মাত্র ষোলটি লাইন রচনা করেছিলেন। এই অসম্পূর্ণ শেষ পরিচ্ছেদের শেষ দু'টি লাইন হচ্ছে ঃ

ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল ঃ মোহাম্মদ
আমীন
করে নাকো পূজা কা'বার ভূতেরে ভাবিয়া
তাদেরে হীন।

www.pathagar.com

না'ত রচনায় আর যাদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কবি গোলাম মোস্তফা, কবি ফররুখ আহমদ, কবি আজিজুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। ইদানিংকালেও অনেকেই লিখেছেন। কবি ফররুখ আহমদ 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। গ্রন্থখানির ১-১১২ পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রচিত হয়েছে 'সিরাজাম মুনীরা' নামক কবিতা। এখানে উল্লেখ্য, কালাম মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ

ইয়া আইউহান্নাবীউ ইন্না আর্ সাল্নাকা শাহিদাঁও ওয়া মুবাশ্শিরাঁও ওয়া নাযীরা ওয়া দা 'ঈয়ান ইলাল্লাহি বিইয্নিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা।-হে নবী, আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে ও সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্র আদেশে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। —সূরা আহ্যাব ঃ ৪৫-৪৬

তাই কবি 'সিরাজাম মুনীরা' নামটি বেছে নিলেন তাঁর গ্রন্থের জন্য। তিনি গ্রন্থের নাম-কবিতায় এক অপূর্ব ছন্দ মাধুরী দিয়ে এক প্রাঞ্জল আবেদনশীল বাক্য বিন্যাস ও শব্দ চয়নে প্রিয়নবী (সা)-র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আবির্ভাবের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড়ে যায়
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া !
জাগে সুষুপ্ত মৃতজনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের
পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো
প্রিয় আবহায়াত।
জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে
কোটি প্রভাত।

মৌলিক রচনা ছাড়াও বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে প্রচুর সীরাত গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, অনূদিত হয়েছে প্রিয়নবী (সা)-র পত্রাবলী ও হাদীসসমূহ।

www.pathagar.com

অনূদিত সীরাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে বিপ্লবী নবী, মূল ঃ মওলানা আজাদ সুবহানী, অনুবাদ মুজিবুর রহমান, রহমতে আলম, মূল ঃ মওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, অনুবাদ ; মাজহারুদ্দীন আহমদ ; বিশ্বনবীর আবির্ভাব, মূল ঃ মওলানা আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদ ঃ নূরুদ্দীন আহমদ, যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, মূল ঃ মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), অনুবাদ ঃ মওলানা মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, আদাবুন্নবী, মূল ঃ ইমাম গাযযালী (রহ), অনুবাদ মওলানা কাজী আছাদুল্লাহ্, নূরে মোহাম্মদী, মূল ঃ হযরত মওলানা কেরামত আলী (র), অনুবাদ ঃ মওলানা শাহ মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ ; সীরাতুন্নবী ১ম খন্ড, মূল আল্লামা শিবলী নু'মানী (র), অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মওলানা মুহিউদ্দীন খান ; ঐ ২য় খন্ড মূল ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র), প্রধান অনুবাদক ঃ ঐ ; সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, মূল ঃ মুফতী মুহম্মদ শফী (র), অনুবাদ ঃ মুহম্মদ সিরাজুল হক। অনূদিত সীরাত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পত্রাবলীও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ ও মোস্তফা হারুনের পত্রাবলী নামে পৃথক পৃথক দু'খানি গ্রন্থ বাংলায় বের হয়েছে। বেশ কয়েকখানি মৌলুদ শরীফ শীর্ষক গ্রন্থ যাঁরা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, আবুল আলী চৌধুরী (১৮৭৪), গোলাম মৌলা সিদ্দিকী (১৮৯৬), মীর মোশাররফ হোসেন (১৯০২), সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৯০৫), ইব্রাহীম খাঁ, ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন (১৯২৪), খান বাহাদুর আবেদ আলী, মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ প্রমুখ। এছাড়াও আবদুল করিম ও উমর শাহ রচনা করেন মহফিলনামা (১৮৭৫); নইমুদ্দীন আহমদ, জলসায়ে মৌলুদ ; কফিল উদ্দীন সিদ্দিকী, মজমুয়া মৌলুদে সিদ্দিকী (১৯২৩); খান বাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদ, মৌলুদ নফিসা (১৯২৬)। প্রকাশিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুলিয়ানামা, বাংলা সাহিত্যের বিরাট আঙিনা জুড়ে যে ইসলামী সাহিত্য জ্বলজ্বল করছে তার সমুজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেছে প্রিয়নবী (সা)-র সীরাত গ্রন্থ এবং অসংখ্য না'ত গযল ও কবিতা। নবী প্রশস্তিমূলক না'ত গযল ও কবিতার সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বাংলা লোক-

www.pathagar.com

সাহিত্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য না'ত গযল। লালন শাহ্, দুদ্দু শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, হাছন রাজা সহ এদেশের মরমী কবিদের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে না'ত। লালন শাহের এই বিখ্যাত না'তটি লক্ষণীয় ঃ

রসূল নামে কে এলো ভাই
কায়াধারী হয়ে কেন তাঁর ছায়া নাই।।
কি দিবো তুলনা তারে
খুঁজে পাইনা এই সংসারে
মেঘে যার ছায়া ধরে ধুপের সময়।।
ছায়াহীন যাহার কায়া
ত্রিভুবন তাঁরই ছায়া
একথার মর্ম নেওয়া
অবশ্যই চাই।।
কায়ার শরীর ছায়া দেখি
ছায়া নেই তার লা শরিকী
লালন বলে তার হকিকী
বলিতে ডরাই।।

বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রাণের চেয়েও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে। তাঁরা হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে পেতে চায় প্রিয়নবী (সা)-কে। তাই এ দেশের লেখক-কবিগণ সেই ভালোবাসার মরমী অনুভবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত বিষয়ক যাবতীয় কিছু নানাভাবে কোথাও ছন্দের ব্যঞ্জনায়, কোথাও সুরের ব্যঞ্জনায় আবার কোথাও প্রাঞ্জল মর্মস্পর্শী গদ্যের গাঁথুনিতে প্রকাশ করেছে আর এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল সাহিত্যাংগন, যার গতিধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

www.pathagar.com

আরবী, ফার্সী ও উর্দূ কাব্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

মহানবী হযরত রাসূলে করীম (সা) হলেন ইব্‌রাহীম (আ)-এর দু'আ ও হযরত ঈসা (আ)-র সুসংবাদ। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূল ও বিজ্ঞ ধর্ম াজকগণ তাঁর আগমনী সংবাদ ও পরিচয় তুলে ধরেছেন বিশ্বের কাছে। তিনি রহমতের নবী, শান্তির দূত, উম্মতের তরণীর কান্ডারী এবং মনযিলের দিশারী, তিনি হেরা গিরি থেকে দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে আগমন করলেনএবং নিমেষে যুগের পুঞ্জীভূত আঁধার দূরীভূত করলেন। যেই তাঁর সংস্পর্শে আসলো সেই হয়ে গেল যুগের নকীব, পথের দিশারী। মহানবী, সকলেরই নবী, সকলের জন্য রহমত, সকলেরই হাদী ও দিশারী। তিনি বিশ্বমানবের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। চাঁদ-সূর্য যেমন সকলের জন্য, বিশ্বনবী (সা)-ও সকলের জন্য রহমত এবং তাঁর জ্যোতি সবার জন্য। বিশ্বের সবার উচিত ছিল তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁর জ্যোতি থেকে আলো গ্রহণ করা। কিন্তু নানা স্বার্থের বশীভূত হয়ে অনেকে তা করলো না, গ্রহণ করলো আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে, তারা প্রত্যাখ্যান করলো সত্যকে, প্রত্যাখ্যান করলো আল্লাহ্‌র রহমত ও নিদর্শনকে, কিন্তু স্বার্থবাদী ও গোঁড়া ছাড়া আর সকলেই ঈমান আনলেন। পরশমণির পরশে এসে সন্ধান পেলেন চির সৌভাগ্যের।

বিশ্বনবী (সা)-র মধ্যে এমন সব গুণের সমাবেশ হয়েছিল, যা একজন আদর্শ মানব ও বিশ্বনবীর জন্য প্রয়োজন। এসব গুণ স্বয়ং আল্লাহ্‌ই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই মহানবী (সা) বিবিধ গুণে সমৃদ্ধ। তাঁর গুণগ্রাহিগণ গুণাবলীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। শরীক হয়েছেন মহানবী

www.pathagar.com

(সা)-র গুণগ্রাহীদের মধ্যে। অর্জন করেছেন সৌভাগ্য। উম্মতে মুহাম্মদীর বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞানী-গুণীরা রাসূল প্রশস্তিতে অংশ গ্রহণ করেছেন, উম্মতের কবি সাহিত্যিকগণও এতে পিছিয়ে নেই। তাঁরা রাসূল প্রশস্তিতে বিরাট অবদান রেখেছেন। রেখেছেন না'ত ও প্রশস্তির মূল্যবান ভান্ডার। আমার এ লেখা সে ভান্ডারেরই সামান্য সংগ্রহ মাত্র। উদ্দেশ্য, নিজেকে না'ত সংগ্রহকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা, এ ওসিলায় হয়ত কিয়ামত দিবসে নবীজী (সা)-র সুপারিশ নসিব হতে পারে। কোন উপায় হতে পারে এ অধমের। আর এ সংগ্রহ থেকে কেউ যদি উপকৃত হন তবে এর কৃতিত্ব আমাদের কবিগণের। এ সংগ্রহে প্রথমে আরবী, এরপর ফার্সী, তারপর উর্দূ কবিদের কবিতা স্থান পেয়েছে। সময়ের অভাব, কলেবর বৃদ্ধির আশংকা, এ দু'কারণেই আরো অনেক কবির কবিতা এ সংগ্রহে তুলে ধরতে পারিনি। ভবিষ্যতে আরো সঞ্চয় ও সংগ্রহের বাসনা রইলো। আল্লাহ্ তাওফীক দাতা, তাঁরই কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

আরবী কাব্য

আস'আদ ইব্‌ন কারব আল-হিময়ারী

[আস'আদ ইবন কারব আল হিময়ারী। তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সাতশত বছর পূর্বে বিশ্বনবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর অনেক কবিতায় তাঁর বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন। নিম্নে কয়েকটি কবিতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা হলো]।

'আহমদ (সা) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল (সা), আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। যদি আমার আয়ু বর্ধিত হয় এবং তাঁর যুগ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি তাঁর সাহায্যকারী হবো এবং ভাই-এর মত তাঁর সহযোগী হবো।'

খাতর ইবন মালিক

[তিনি ছিলেন বনি লাহব গোত্রের বয়োবৃদ্ধ গণক। যখন তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল দু'শত আশি বছর।]

www.pathagar.com

'শক্তিশালী হাত দ্বারা নিক্ষিপ্ত শিহাব-ই-সাবিক' (জ্যোতির্ময় নক্ষত্র) দ্বারা অবাধ্য নাফরমান জীনদেরকে উর্ধ্বজগতের খবর শোনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তা এ জন্য যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনসহ আজিমুশশান নবী (সা)-র আবির্ভাব হবে, তাঁকে দেওয়া হবে ঈমান ও কুফরের এবং সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তু এবং সঠিক পথের সন্ধান, তিনি এর দ্বারা প্রতিমার অর্চনা বন্ধ করে দিবেন।'

'তিনি প্রেরিত হবেন দারুল হিমস মক্কাতে, তাঁর দলীল প্রমাণ হবে সূর্যের জ্যোতির মত উজ্জ্বল, তিনি প্রেরিত হবেন সন্দেহ ও দ্বিধামুক্ত অকাট্য কুরআনসহ। মানুষের এ শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুগামী হওয়া আমার গোত্রের লোকের জন্য আমি পছন্দ করি, যেমন আমি তা পছন্দ করি আমার নিজের জন্যও।'

হযরত সাওয়াদ ইবন কারিব (রা)

[হযরত সাওয়াদ ইব্ন কারিব (রা) রাসূলুল্লাহ্র সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসার একটি কাসিদা রচনা করেন এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পড়ে শুনান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রচিত কাসিদার প্রশংসা করেছেন এবং স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র) 'আতইয়াবুন নুগাম ফি মাদহি সায়্যিদিল আরব ওয়াল আজম' নামক না'তিয়া কাসিদায় এ সাহাবীর নাম এবং তাঁর রচিত কাসিদার কথা উল্লেখ করেছেন।]

'আমার অন্তরংগ যাকে আমি কোন সময় মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করতে দেখিনি। সে তিনরাত যাবত এসে প্রতিরাত আমাকে স্বপ্নে বলতে লাগলো, লুয়ান ইবন গালিব-এর বংশে রাসূলের আবির্ভাব হবে।'

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই, হে রাসূল, আপনি অদৃশ্য জগতের আমানতদার।'

'আর আপনি রাসূলগণের মধ্যে সবচাইতে আল্লাহ্র নিকটবর্তী। হে সম্মানিত ও পবিত্র পিতার সন্তান।'

www.pathagar.com

'যেদিন সাওয়াদ ইবন কারিব-এর সামান্য সুপারিশও কেউ করতে পারবে না, হে রাসূল, সেদিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন।'

'আল্লাহ্‌র নবী (সা)-র ওফাতও তাঁর হায়াতের মত, সত্য হিসেবে সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর সত্যের জন্য জিহাদও প্রচলিত থাকবে।'

'যদি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য উৎসর্গিত হওয়ার আহবান জানানো হয়, তবে আমি আমার সন্তান ও যাবতীয় সম্পদ তাঁর জন্য উৎসর্গ করবো।'

ওরাকা ইবন নওফেল

[তিনি আসমানী কিতাব তাওরিত ও ইঞ্জিলে অভিজ্ঞ ছিলেন, মহানবী (সা)-র আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন। হিরা গিরিতে প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর হযরত খাদীজা (রা) মহানবী (সা)-কে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর কাছে জিবরীল ফেরেশতা আসমানী বার্তা নিয়ে এসেছেন, আমি বেঁচে থাকলে তাঁকে সাহায্য করবো।]

'আমি অনেক পূর্ব থেকে যাঁর আগমনবার্তা শুনে আসছি আজ খাদীজা (রা) তাঁর আগমনীর সে শুভ সংবাদ শুনাতে আমার কাছে আসলেন।'

'সংবাদটি হলো, জিবরীল (আ) আহমদ (সা)-এর সমীপে এসে বার্তা শুনালেন যে, হে আহমদ, আপনি মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহ্‌র নবী (সা)।'

'পাদ্রি কুস ইবন সা'য়িদা বলেছিলেন তা অসত্য হওয়ার নয়-'মুহাম্মদ (সা) অচিরে তাঁর কওমের নেতা হবেন। তিনি জব্দ করবেন তাঁর দুশমনকে।'

'দেশ-দেশান্তরে তাঁর নূর, তাঁর জ্যোতি বিস্তৃত হবে, তাঁর জ্যোতির বদৌলতে পৃথিবী ফিতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা পাবে এবং হিদায়তের পথে পরিচালিত হবে।' 'যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে তাঁরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আর যাঁরা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং তা অনুসরণ করবে তাঁরা হবে সফলকাম।'

'আল্লাহ্ যেমন হূদ, সালিহ, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ্ তেমন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (সা)-কেও রসূলরূপে প্রেরণ করবেন।'

www.pathagar.com

আবূ তালিব

[আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা-এর চাচা, কুরায়শের সম্মানিত নেতা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনেননি, তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-র নিরাপত্তা বিধান এবং ইসলামের প্রচারে তাঁর সাহায্য- সহযোগিতা ভোলার মত নয়।]'সেই নূরানী চেহারার অধিকারী যার চেহারার বরকতে মেঘমালা হতে বারি বর্ষিত হয়, তিনি এতিমদের আনন্দ এবং বিধবাদের রক্ষক।'

'বনী হাশিমের নিঃস্ব ও দুস্থরা তাঁর আশ্রয়ে বেঁচে থাকে- ওরা তাঁর কাছে সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রতিপালিত হয়।'

'তিনি ধৈর্যশীল, সত্য পথের দিশারী, তিনি ক্রোধান্ধ নন, তিনি এমন এক ইলাহ-এর ইবাদত করেন, যে ইলাহ তাঁর থেকে গাফেল নন।'

'লোকেরা জানে যে, আমাদের এ পুত্র আমাদের কাছে সত্যবাদী, আর তিনি অনর্থক কথা বলেন না।'

'তুমি আমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছ, আমি জানি, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তুমি সত্যবাদী এবং আমীন।'

'যে ধর্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তুমি আমাকে সে ধর্মের প্রতি আহ্বান করেছ।'

'যদি গালমন্দ ও অপবাদের আশংকা না থাকতো তবে আমি এ দীন অবশ্যই গ্রহণ করতাম এবং এর প্রতি উৎসর্গপ্রাণ হতাম।'

কা'ব ইবন যুহায়র (রা)

[হযরত কা'ব প্রসিদ্ধ কবি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য না'তিয়া কাসিদা রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।]

'তিনি আল্লাহ্র রাসূল, মানব জাতির জন্য জ্যোতিস্বরূপ, আর তিনি হলেন আল্লাহ্র উন্মুক্ত তরবারি।'

হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)

[তিনি প্রসিদ্ধ আরব কবি, তাঁকে মুসলমানদের জাতীয় কবি বলা যায়, তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে। এখানে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা উদ্ধৃত করা হলো।]

www.pathagar.com

'আমার পিতামাতা এবং আমার মানমর্যাদা সবকিছু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সম্মান ও ইজ্জতের জন্য উৎসর্গিত।'

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (র)

জন্ম-১১১৪ হি. ওফাত-১১৭৬

০ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন বীর পুরুষ, তাঁর পদক্ষেপ হতো মহৎ কার্যাবলীর জন্য, সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্য তিনি অগ্রগামী হতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর দিকে তিনি মানুষকে আহ্বান জানাতেন।'

০ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফির সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে শত নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালানোর পরও তিনি ওদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'য়ার হাত প্রসারিত করেছেন।

০ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মানসে তিনি দুনিয়ার আয়েশ-আমোদ এবং আজমীদের বিলাসিতাকে বর্জন করেছেন।

০ আল্লাহ্র নবী (সা) ইয়াহূদীদের কোন বিদ্যায়তনে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং তাদের কোন লেখকের লেখাও পাঠ করেননি।

০ প্রত্যেক হিদায়ত প্রার্থীর জন্য তিনি হিদায়তের পথ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন এবং উৎসাহী সকলকে শরী'আত শিক্ষা দিয়ে তাঁদের প্রতি দয়া করেছেন।

০ তিনি যাবতীয় অন্যায় ও অসৎ কর্মকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহ্র গযব ডেকে আনে-এরূপ যাবতীয় অবিচার ও জুলুমকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন।

০ জীবজন্তু ও পাথর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কথা বলেছে-মানুষের সাথে ওদের কথা বলা সম্পূর্ণ অলৌকিক।

০ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরহে বৃক্ষশাখা ক্রন্দন করেছে-কারণ প্রিয়ের বিরহ নিতান্তই বেদনাদায়ক।

০ তাঁর আঙুলের ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ খণ্ডিত হয়েছে। মু'জিযাসমূহের মধ্যে এ হচ্ছে অত্যাশ্চর্য মু'জিযা।

www.pathagar.com

০ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে একরাত আসমান অভিমুখে রওয়ানা হলেন-আরোহী যেমন উত্তম-বাহকও ছিল তেমন উত্তম।

০ তিনি ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ্র নূর দেখেছেন-যে নূর প্রজাপতির মতো পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল।

০ আমার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র নূরানী চেহারা, তখন আমি আমার প্রাণ ও আমার স্বজনদের উৎসর্গ করি তাঁর পবিত্র চরণে।

০ হে সৃষ্টির সেরা, আপনার প্রতি আল্লাহ্র আশিস বর্ষিত হোক -হে দানবীর, হে আমার আশার আলো ভরসার কেন্দ্রস্থল।

০ হে রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর রহমত বর্ষিত করবেন, আর আপনি হলেন আল্লাহ্র রহমতের ভান্ডারের চাবি।

০ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি পয়গাম্বরগণের সেরা, আপনি সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়, অন্যান্য পয়গাম্বর হলেন তারকা রাশির মতো।'

০ হে আল্লাহ্র রাসূল, যেদিন কারো সুপারিশ চলবে না সেদিন আপনি সবার জন্য সুপারিশ করবেন।-যেমন বর্ণনা করেছেন সাওয়াদ ইবন কাবির।

০ যদি তোমার বাসনা হয় কারো প্রশংসা করার -তবে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র প্রশংসা করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

০ সবিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত মর্যাদা ও মাহাত্ম্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র সত্তার মধ্যেই রয়েছে মওজুদ ও স্থিরীকৃত, রাসূলের সত্তা সকল মাহাত্ম্যের জন্য কষ্টিপাথর ও মানদন্ড স্বরূপ।

০ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র বরকতেই আদম সন্তানের গুণাবলী গুণে পরিগণিত হয়েছে এবং গুণরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

০ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রশংসা বর্ণনাকারী যখন নিজেকে অপারক ও অক্ষম বলে মনে করবে-

০ তখন তার অবস্থা হবে এই-

০ বিনয় ও মিনতিসহ কেঁদে কেঁদে রহমতের রাসূলকে আহ্বান করবে এবং বলবেঃ

www.pathagar.com

০ হে রাসূল, হে সৃষ্টির সেরা-হাশর দিবসে এ অধম আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশী।

০ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যখন মহাবিপদ উপস্থিত হবে-

তখন সংকটকালে আপনিই আমার আশ্রয়স্থল ও ত্রাণকর্তা।

ফার্সী কাব্য

মীর্জা মাজহার জানেজানা (র)

[মীর্জা মাজহার ছিলেন রূহানী সাধক ও কবি। তাঁর একটি ফার্সী কাব্যগ্রন্থ আছে। তিনি দিল্লীতে অবস্থান করতেন। তিনি জনৈক আততায়ীর হাতে শাহাদত বরণ করেন।]

'প্রিয়নবী (সা)-র ছায়া ছিল না, তা তিনি হিসাবের দুর্দিনে উম্মতের ছায়ার জন্য রেখে দিয়েছেন।'

'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাম্‌দ বা প্রশংসার অপেক্ষায় থাকেন না, অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও আমাদের প্রশস্তির জন্য তাকিয়ে থাকেন না।'

'মহানবী (সা)-র প্রশংসার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আর আল্লাহ্র হামদ ও গুণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।'

'মুনাজাতের জন্য যথেষ্ট একটি কবিতাইঃ

'হে প্রিয়নবী (স), আপনার সাহায্য ওসীলায় আল্লাহ্কে পেতে চাই, আর হে মা'বূদ, তোমার কাছে চাই নবী মুস্তফা (সা)-র ভালবাসা।'

আমীর খসরু (র)

[তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র)-র অন্যতম খলীফা, তিনি প্রতিভাবান কবি। দিল্লীতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার ওসীয়ত অনুযায়ী তাঁর মাযারের পাশে দাফন করা হয়।]

'হে জ্ঞানী, তুমি নবী প্রেমে দেওয়ানা হও এবং দুনিয়ার সুরা ত্যাগ করে নবী মুস্তফা (সা)-র প্রেমের সুরা পাত্র থেকে এক চুমুক সুরার সন্ধান কর।'

www.pathagar.com

'আসমান উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে নবী আহমদ (সা)-এর মর্যাদা মাহাত্ম্য থেকেই, আর সব মর্যাদায় আসীন হয়েছেন তাঁরই মর্যাদা ও মাহাত্ম্য থেকে।'সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখতে পাবে, আহমদ-এর 'মীম' 'আহাদ'-এর নকশার মত, প্রিয়নবী আহমদ (সা) সর্বশেষ নবী।'

'লালসা তোমাকে অধোমুখী করে, তুমি দীনের পথ ধর, কেননা, নবী মুস্তফা (সা)-র তরীকা ছাড়া উন্নতি হবে না।'

'এই আমরা আর আমাদের পাপ তো পর্বত সমান, কিন্তু চিন্তা করি না কারণ, সমস্ত পাপ ক্ষমা করানোর গুরুভার রয়েছে আপনার কোমল কাঁধের উপর। 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনার নূরানী চেহারার বদৌলতে বিষণ্ন মুখ পাপী বান্দাদের ক্ষমা করে দিবেন।'

'আল্লাহ্‌র পরিচয় আপনার মত আর কেউ পায়নি, আর আপনার প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বুঝেননি।

'প্রতি গৃহেই যখন আপনার প্রশস্তি ও তা'রীফ করা হয় আর মু'মিনগণ যখন প্রতি গৃহেই নামায পড়েন, তখন আপনার দীনের সম্মানার্থে মু'মিনদের প্রতি ঘরকেই আল্লাহ্‌র ঘর বলা যায়।'

'আমি প্রিয়নবী (সা) দু'জাহানের বাদশাহ্‌র না'ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলি যে, আমার নবী (সা) দু'জাহানের বাদশাহ যদি খসরুকে মিসকীন ও ফকির বলে ডাকেন তবে তা হবে খসরুর জন্য শাহী গৌরবের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।'

'আপনার পবিত্র পয়গাম হচ্ছে 'আল-কুরআন', এ কুরআনের বাহক হলেন আল্লাহ্‌র পবিত্র ফেরেশতা 'রুহুল আমীন।'

হযরত মওলানা কাসিম নানূতবী (র)

জন্ম-১২৪৮ হি. ওফাত-১২৯৭ হি.

[তিনি মুহাজির-ই-মক্কী হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ (র)-র অন্যতম খলীফা। তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত।]

www.pathagar.com

০ হে রব, সারা বিশ্ব থেকে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই পছন্দ করেছেন, অবশিষ্ট দুনিয়া রেখেছেন আমাদের জন্য।

০ বাগানের পুষ্প থেকে আপনি তাঁকেই মনোনীত করেছেন এবং সকল রঙ ও সুবাসকে তাঁর জন্য ব্যয় করেছেন।

০ তাঁরই জন্য সব নে'মতকে নিযুক্ত করেছেন।

০ তাঁরই মনোরঞ্জনের জন্য আপনি সৃষ্টি করেছেন উভয় জাহানকে।

০ তিনি হলেন 'রাহমাতুল-লিল-আলামীন-

তিনি অপরাধীদের জন্য আপনার দরবারে সুপারিশ করবেন।

উর্দু কাব্য

ড. মুহম্মদ ইকবাল (র)

জন্ম ১৮৭৩ ইং, ওফাত-১৯৩৮

'হে রাসূল, মারিফতের সুরায় আমার হৃদয় পাত্র যেন পরিপূর্ণ হয়-আমিও আপনার পথে বের হয়েছি যাচক হয়ে।'

'আপনার প্রেমের জ্বালা হৃদয়ে না থাকলে মানুষ প্রকৃত ইনসান হতে পারে না।'

'আপনি কখনো মদীনায় উয়াইস করনী থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, আবার কখনো মূসা ইবনে ইমরানের চোখে বিদ্যুতের ন্যায় নিজেকে প্রকাশিত করেন।'

'আপনি আল্লাহ্র অতি সন্নিকটে আবার আপনি বান্দা বলেও স্বীকার করেন। কখনো আবরণ তুলে নেন আর কখনো গোপন হয়ে যান।'

'আপনার মুহাব্বতে বিলীন হয়ে আরবের বায়ুর প্রতি পূর্ণরূপে উৎসাহিত হওয়াতেই রয়েছে আমার আনন্দ।'

'আপনার পবিত্র মুখ-মন্ডলের দর্শনে হতবুদ্ধি হওয়াটাই হচ্ছে আমার ঈমান ও ইসলাম।'

''মদীনার মরু পথে আমার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমি এ আনন্দে জান্নাতের শত উদ্যানকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।"

www.pathagar.com

'গুনাহগার উম্মত যখন কিয়ামতের ময়দানে লজ্জার ঘামে ডুবে যাবে তখন রহমতের নবী (সা) সুপারিশ করে তাদের উদ্ধার করার জন্য কত উপায় করবেন এবং কতই না আয়াস স্বীকার করবেন।'

মা'আরাফনা [অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার , আপনাকে আমরা চিনতে পারি নাই।] ইহা আপনার মহত্তকে ঢেকে রেখেছে পক্ষান্তরে 'দু'ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা এর চাইতেও কম' দ্বারা আপনার প্রকৃত হাকীকত ও মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে।'

'আমার চোখ আপনার সৌন্দর্য-জ্যোতি যখন অবলোকন করলো তখন থেকে চাঁদ ও নক্ষত্রের জ্যোতি আমার চোখে তীরের মত বিদ্ধ হতে লাগলো।'

'আপনার মুহাব্বতে মাটি হয়ে এ সম্মান পেয়েছি যে, আমার মাটিকে ফেরেশতারা তাইয়াম্মুমের জন্য গ্রহণ করেছেন।'

'মদীনার কোন গলিতে আমার মৃত্যু উপস্থিত হলে, হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং এসে 'উঠো' বললেও আমি আর উঠবো না।'

'আপনি সেই নবী প্রলয়ংকরী তুফানের সময় হযরত নূহ (আ) আপনার পবিত্র সত্তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন এবং নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে আপনিই ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপায় ও ভরসা।'

'পৃথিবীর অন্ধকারে আপনার নূরই ছিল মশাল স্বরূপ, আপনার ছায়া ছিল আরশে ইলাহীর চোখের জ্যোতি।'

'আপনার হাতেরই প্রতিচ্ছায়া হচ্ছে চাঁদের নূর। চাঁদ আপনার আংগুলের ইঙ্গিতেই চাঁদ বনেছে।'

'আপনার সৌন্দর্য পর্দাবৃত থাকলেও 'লাওলাকা-এর দ্বারা আপনার পদমর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।'

লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাকা' [এটি হাদীসে কুদসী, এর অর্থ-

'আপনার উদ্দেশ্যেই এ জগত সৃষ্টি করা হয়েছে, আপনাকে সৃষ্টি না করলে এ বিশ্ব সৃষ্টি করা হতো না।' এতে বিশ্বনবী (স)-র মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।

'হযরত মূসা (আ) তাঁর হাতের জ্যোতির কারণে গর্বিত ছিলেন অথচ আপনার পদচিহ্ন হতে বিকশিত হয়েছে শত তজল্লী ও শত জ্যোতি।'

www.pathagar.com

'হে নূহের নৌকার তরণীর উদ্ধারকর্তা, আজ কিন্তু আপনার উম্মতের তরণী দুর্যোগের শিকার।'

'মুসিবতের সময় আপনিও যদি আমাদের ফরিয়াদ না শুনেন, তবে আমরা আমাদের দুঃখের কাহিনী আর কার কাছে গিয়ে বলবো।'

'আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত করুন। আর বিলম্ব ঠিক হবে না, আমাদের অস্তিত্ব বর্তমান না থাকারই সম্ভান হয়েছে।'

'সকলের ভরসা হচ্ছে সম্পদের উপর, আমার ভরসা আপনি ছাড়া আর কিছুর প্রতি নয়।'

'আপনার পবিত্র সত্তার বরকতে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে, ব্যথিত হৃদয়ের জন্য আপনার পবিত্র নামই হচ্ছে প্রকৃত শিফা।'

'মানুষের হৃদয়ের প্রেম-ব্যথার উৎপত্তি আপনারই সত্তা থেকে, প্রেমের লোহিত সাগরে তরঙ্গ উঠেছে আপনার নয়নাশ্রু থেকেই।'

'প্রেমের তৃষ্ণার্তদের জন্য আপনি হলেন 'আব-ই-কাওসার। যার প্রতি ফোঁটা হতে শত মোতির জন্ম-আপনিই হচ্ছেন সেই সাগর।'

'আপনিই ছিলেন তূর পর্বতে মূসা কালিমুল্লাহ্‌র চোখের নয়নমণি, ইয়াসিন-এর অর্থ এবং 'আও আদন' অথবা আরো কাছে' এর তাৎপর্য হলেন আপনি।'

'মীম ছাড়া আহমদ-এর রহস্য যে অনুধাবন করে নাই সে আপনার নূরানী সত্তার পরিচয় লাভ করতে পারে নাই।'

'আপনি বিশ্বের সম্মানিতদের মাহফিলের সৌন্দর্য, আপনার শুভাগমন পরে হলেও আপনি সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে।'

'আপনার পবিত্র কদমের বরকতে হেরো গুহার অঞ্চল সিনাই পর্বতের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।'

www.pathagar.com

'আপনার কদম মুবারকের চুম্বনে এ জমি আসমানের মত সমুচ্চ হয়েছে, 'আরশে মুয়াল্লার' সম মর্যাদাসম্পন্ন।'

'হযরত ইউসুফ (আ)-কে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হলো, তখন যদি সাঁকি-ই-কাওসার হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নাম তাঁর মুখ দিয়ে বের হতো তবে হযরত ইউসুফ কূপে সামাল দিতে পারতেন এবং কূপে পড়তেন না।'

হযরত মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (র)

দুনিয়ার সব গুণ আপনার মধ্যে বিদ্যমান-

দু'চারটি ব্যতীত আপনার গুণাবলী অন্য কারো মধ্যে নেই।' -জামাল-ই-কাসিমী

০ আমার মৃত্যুর পর বাতাস যেন আমার কবরের মাটি নিয়ে- হুযূর (স)-এর রওযার আশপাশে উৎসর্গ করে।

০ কিন্তু কাসিম এ মর্তবা কোথায় যে, তার মাটি ধূলো হয়ে মদীনার পবিত্র গলিতে পৌঁছাবে।

০ আমার লাখো বাসনার মধ্যে বড় বাসনা হলো-মদীনার কুকুরদের মধ্যে যেন আমার নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।

০ জীবিত থাকলে যেন আমি ঘুরে বেড়াই মদীনার কুকুরের সাথে-আর মরে গেলে যেন খায় মদীনার সাপ বিচ্ছু আমায়।

০ পূর্ববর্তী নবী (আ) গণের গর্ব, সেই রসূলে আরবী (স) যাঁর আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে বিশ্ব।

০ 'হয়েছে যাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন-ই-কামিল, জিন্, ইনসান ও ফেরেশতাকুল যাঁর অনুসারী।

০ নবুয়তের জ্যোতির্মান সে শিখার দীপ্তি ও প্রভার বিকাশে, অন্ধকারে নিমজ্জিত সারা বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো।

০ যুগে যুগে আসছেন নবী পয়গাম্বর, আসছেন ঋষিমুণি, মুলক্ ও মিল্লাতের সংস্কারক।

www.pathagar.com

০ আরো আসছেন সত্যের সন্ধানী এবং আল্লাহ্‌র ওলী, আসছেন চিরস্থায়ী রহস্য জগতের সূক্ষ্ম রহস্যরাজির অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ।

০ পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে অনেক পবিত্রাত্মা মহামান্য ব্যক্তিবর্গের, কিন্তু 'রহমত-ই-আলম' বা সারা বিশ্বের রহমত উপাধি নিয়ে আর কেউ তো আসেন নি।

০ কে তিনি যিনি সকলকে তৌহিদের সুরা পান করালেন, যিনি সাম্যের বাণী শুনালেন সবাইকে ?

০ কে তিনি যিনি সকলকে হাকীকতের পথ দেখিয়েছেন ? যিনি সবাইকে আল্লাহ্‌র সত্তা বা হাকীকতের দিওয়ানা বানিয়েছেন?

০ তোমরা তাঁর পয়গামের অনেক দপ্তর দেখেছ, যদি তাঁর মত আর কারো আবির্ভাব হয়ে থাকে তবে তার নাম বলো।'

০ তোমাদের আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে সিদ্দীক-এর মত কেউ থাকলে তোমরা দেখাও, ফারুকের মত কাউকে তোমরা দেখে থাকলে তাকেও দেখাও।

০ তোমাদের মধ্যে উসমানের মত কেউ এসে থাকলে, তোমরা হায়দরের মত কাউকে পেয়ে থাকলে তবে দেখাও।

০ মীম ব্যতীত আহমদ (স)-এর তুলনা পেশ করা তো দূরের কথা, তাঁর উম্মতের দৃষ্টান্ত পেশ করাও তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

-জাযবাত ও তাখাইয়ুলাত-ই-জিগর

কবি আরযু

[তিনি ভারতীয় কবি, তিনি বসবাস করতেন লাখ্‌নৌতে। তাঁর কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।]

সরওয়ার-ই-কাওনাইন (স)

'ধরাপৃষ্ঠে ছিল অন্ধকারের রাজত্ব, জমি থেকে আসমান পর্যন্ত সর্বত্র ছিল অন্ধকারের ছড়াছড়ি।'

'মানব সভ্যতা বা তমদ্দুন অনায়াসে পড়ে উঠছিল অসভ্যতা ও অজ্ঞতার ছাঁচে, কুফরী কীর্তিকলাপ ছিল মানব-সভ্যতার শোভা।'

www.pathagar.com

'জীবন বিধান থেকে মানব জীবন ছিল অনেক দূরে, যমানায় ছিল অন্ধকারের প্রাচুর্য।

বিত্তহীন ও অসহায়দের দুনিয়ায় ছিল জুলুম ও অন্যায়ের হাত প্রসারিত ও বিস্তৃত, দেশ শাসনের যত নিয়ম-কানুন ছিল সবই ছিল গলদ।

'উৎপীড়ন-নিপীড়ন ছিল সর্বত্র ব্যাপক, আরো ছিল ক্রীতদাসদের উপর পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র অধিকার।'

'প্রকৃতপক্ষে এ পৃথিবী ছিল অশ্লীলতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত পৃথিবী' মূর্তিপূজার কুরুচিতেই ছিল শয়তানী প্রসাদের বিশেষ সমারোহ ।

'আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষরূপী পশুরই ছিল প্রাধান্য, শয়তানী প্রতাপ ও রাজনীতির বাতাসে নশ্বর জগত ছিল পাগলপারা ।

'খু'দী বা আত্মগর্বে নিমজ্জিত হয়ে এ পৃথিবী 'আল্লাহ্‌'কে ভুলে গিয়েছিল, বিশ্বকে আরো আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কুফর ও জিহালতের ঘোর অমানিশা।'

'অবশেষে পৃথিবীতে সৃষ্টি হলো রহমতের পরিবেশ, আরব ভূখণ্ডে একজন মহামনীষী মর্দে খোদার আবির্ভাব হলো ।

'যিনি আসার সাথে সাথেই যমানার পরিবেশ পরিবর্তন করে দিলেন এবং ক্ষুদ্রকে করলেন চন্দ্র-সূর্যের মত দীপ্তিমান ।

'বহুত্বের বিকাশ ও প্রকাশের রহস্য যিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, দু'জাহানে যিনি তাওহীদ ও একত্বের সিলসিলা জারি করেছেন ।'

'সেই উম্মী নবী যিনি বিশ্ববাসীর কাছে হাকীকতকে সমুজ্জ্বল করেছেন, যিনি প্রেমের জ্যোতিঃপথ আবিষ্কার করেছেন নতুন নিয়মে, যিনি নব হাকীকতের মঞ্জিল-এর মশাল, যিনি দিশারী, যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনাকারী।

'যিনি পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছাচারিতার যুগকে নিশ্চিহ্ন করে মানব জাতির মধ্যে সাম্যের ও একত্বের মনমানসিকতা সৃষ্টি করেছেন ।'

'যিনি আযাদ করেছেন বিশ্বের গোলামদের, যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে সৃষ্টি হলো বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিবেশ।'

www.pathagar.com

'যিনি নতুন বিধানে জীবনকে করেছেন সৌন্দর্যমন্ডিত, নতুন রাগে যিনি আমলের সারিন্দাকে সজ্জিত করেছেন।'

'হে কা'বার সৌন্দর্য, বুতখানার বিনাশকারী, আপনার প্রতি সালাম, আপনি অধিপতি বা শাসক হয়েও ফকিরী শানে ও হালে জীবন যাপন করতেন ।'

'বিশ্ববাসীর প্রতি আপনার দয়া ও স্নেহের বর্ষণ এখনও বিখ্যাত, আপনার বদান্যতা ও বীরত্বের কথা জগত এখনও স্মরণ করে ।'

'আপনার চেরাগ কোন প্রলয় নিভাতে পারবে না, বুতখানায় গিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করুক আপনার খলীলীশানের কথা।'

'এ সবকিছুই হলো আপনারই গুণাবলীর অলৌকিকতা, আপনি কোথাও কা'বার প্রভাব, কোথাও বুতখানার সন্ধ্যা।'

আপনার পবিত্র অংগন হলো লা-মাকানের সুশোভিত অন্তরংগতা, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ই আপনার প্রতি আসক্ত।'

আপনার পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ থেকে বর্ষিত হয় আল্লাহ্র বাণী, আপনার প্রতিটি বাণীই হচ্ছে তাওহীদের পরিচ্ছন্ন পয়গাম ।'

'আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করে যদি বিশ্ব অগ্রসর হয়, তবে সারা বিশ্ব কেবল দর্পণই হবে না বরং পরিণত হবে দর্পণ তৈরীর কারখানায় ।'

সালাম সেই নবীর উপর, যিনি উভয় জাহানের নেতা, সালাম তাঁর প্রতি যাঁর অধিকার ও আধিপত্য আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির উপর।'

'সালাম সেই নবীর প্রতি যিনি যাত্রীকে পথের দিশা দিয়েছেন, সালাম তাঁর প্রতি যিনি প্রতিটি মঞ্জিলের পথ প্রদর্শন করেছেন।'

'সালাম সে নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ্র গুণাবলী ও সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন, সালাম সে নবীর প্রতি যিনি প্রেমের তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।'

'সালাম সেই নবীর প্রতি যিনি তরণীকে তুফান থেকে রক্ষা করবেন।'

'সালাম তাঁর প্রতি যিনি অন্যের জন্য দুঃখ সহ্য করতেন ।'

'সালাম সে নবীর প্রতি যাঁর উপাধি ছিল' রাহ্মাতুল্লিল আলামীন।'

'সালাম তাঁর প্রতি যাঁর পদচিহ্ন ছিল আরশ-ই-মুয়াল্লার শোভা।'

www.pathagar.com

জোশ মলীহ্ আবাদী

[জন্ম–১৮৯৪ ইং। তাঁর নাম সিবিবর হাসান, লাখ্নৌতে তাঁর জন্ম, তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ই কবি ছিলেন, উর্দু সাহিত্য পত্রিকা 'কালিম' এবং 'আজকাল'–এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল, তিনি ইন্তিকাল করেন করাচীতে।]

পয়গাম্বর–ই–ইসলাম

০ এমনি তো ফিতরাতের চোখের আলোক স্ফূরণে পৃথিবীর প্রতিটি অণুকণা ঝলমল করছে, উৎকর্ষিত হচ্ছে প্রতিটি শক্তি, প্রস্ফুটিত হচ্ছে প্রতিটি চারা ।

০ ধূলিকণার হাজারো রহস্যের ভান্ডার লুকায়িত রয়েছে, আদি থেকেই খড়কুটা ও কাঁটাবনে সৃষ্টি হয়েছে পুষ্পোদ্যান।

০ প্রতিটি উদ্যান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ক্রমোন্নতির বায়ুর ঝাঁকি, চমনের প্রতিটি গুচ্ছ শোভামগ্ন এবং প্রতিটি মুকুল সাজে লিপ্ত ।

০ আদিতে যেভাবে স্থবিরতাকে গতিশীলতার অনুমতি মিলেছিল, পৃথিবীর শিরায় শিরায় সেভাবে বেগবান হচ্ছে জীবন প্রবাহ ।

০ যদিও অনেক শতাব্দী গত হয়েছে, হয়েছে যুগের চেহারা কত আবরণে আবৃত তবুও কিন্তু যুদ্ধের আবরণ এখনও যৌবনে টইটুম্বর।

০ এখনও পৃথিবীর গুলবাগিচায় সুন্দর ভংগিতে বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হয়, এখনও যুগ উপকৃত হয় রহমতের নব নওয়াজিসে ।

০ রজনীর লায়লার ললাট চাঁদের রূপালী সে এখনও রয়েছে সমুজ্জ্বল, প্রভাত–কুমারীর বাহুতে সোনালী চিরুনী এখনও হাসছে ।

০ এখানে সব সময় অনুগ্রহ ও কল্যাণের ফেরেশতার আনা–গোনা রয়েছে, আদিকালের প্রভাত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে করুণার মেঘরাজির বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে ।

০ কিন্তু এসব অগণিত তোহ্ফা যা ফিতরাত পৃথিবীকে দান করে থাকে, এসবের মধ্যে প্রকৃত কোন তোহফা বা নি'মত থাকলে তা হচ্ছে একজন আজাদ মনীষী।

www.pathagar.com

০ সেই আযাদ মনীষী, যাঁর সৃষ্টি প্রক্ষালিত জীবন ঊর্মি দ্বারা, প্রতি প্রহর যাঁর সামনে খোলা রয়েছে হিকমত ও প্রজ্ঞার গ্রন্থ।

০ হে রাসূল, আপনার পয়গাম্বরির বড় প্রমাণ হলো এই, আপনি পথের ভিখারীকে দিয়েছেন কায়সারী মর্যাদা ও সম্মান ।

০ আপনি বিপথগামীদের করেছেন খিযির-এর ঈর্ষার পাত্র, আপনি ডাক দিলেন রাহমন বা দস্যুদলকে, তাঁরা বনে গেল রাহবর বা হিদায়তের দিশারী ও মশাল বরদার ।

০ শুভাগমন করেছেন সেই রাসূল যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাসূল যাঁর রাজত্ব হলো রূহে ফিতরাতের উপর ।

০ সেই রাসূল, যাঁর প্রতিটি ইঙ্গিতে রয়েছে আসমানী নির্দেশনা, সেই রাসূল যিনি মৃত্যুকে জীবনে পরিণত করেছেন ।

০ দুনিয়ার পরিবর্তন আপনার দীনের ইমারতকে ভাংতে পারবে না, কোন ঝন্‌ঝা নিভাতে পারবে না আপনার জ্বালানো মশালকে ।

০ সে মানব যাঁর তীক্ষ্ণ সতেজ দৃষ্টি বিশ্বের রহস্যাদির অনুধাবনে পারদর্শী- সে মানব জীবনে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও অস্থিরতার নাড়ির উপর যাঁর আঙ্গুল ।

০ সেই আজাদ মনীষা, যাঁর দৃষ্টি প্রক্ষলিত জীবন ঊর্মি দ্বারা, যাঁর সামনে প্রতি নিঃশ্বাসে উন্মুক্ত রয়েছে হিকমত ও প্রজ্ঞার কিতাব ।

০ সেই মানব যাঁর প্রেমপাত্র থেকে তারকারাশি প্রেমসুধা পান করেছে, সেই মানব যাঁর আশপাশ ফেরেশতারা আবৃত করে রেখেছেন ।

০সেই মানব যাঁর পবিত্র হৃদয়ে গুপ্ত রয়েছে ফিতরতের পয়গাম, সেই মানব যাঁর উষ্ণ নখ অস্তিত্বের বেহালাকে স্পর্শ করছে ।

০ সেই মানব যিনি বাগানের সুরভিত বায়ু থেকে জ্ঞান পুষ্প আহরণ করছে- সেই মানব যিনি বায়ু প্রবাহে আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনছেন।

০ যদিও আসমান আদি থেকে তাঁর পদচিহ্নের উপর সিজদারত-কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিশ্বে রয়েছে এখনও সে মহামানবের প্রতি নিস্পৃহতা।

www.pathagar.com

০ এমনিত এরূপ অনেক লোক ছিলেন যাঁরা জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন–যাঁরা প্রতিমাভীতি বিনাশ করেছেন এবং করেছেন প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্‌র পরাক্রমশালিতাকে।

০ কিন্তু আরবের নীরব নিথর দিগ্বলয়ের রাসূলরূপে এমন কিরণ প্রস্ফুটিত হলো যে, সে কিরণের বরকতে অমানিশার যত খড়কুটা ছিল সব লাল পুষ্পের ন্যায় চমকিত হয়ে উঠলো।

০ এখনও রাসূল (সা)–কে অস্বীকারে ওরা একগুঁয়ে, ওদের কাফিরী দিমাগ উন্মাদনাপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত, কুদরতের চিরন্তন নীতি থেকে তাঁর পয়গম্বরীর প্রমাণ সুস্পষ্ট।

০ কোন কৃষিবিদ থাকলে সে এই হাকীকত প্রকাশ করুক–কাঁটার বীজের থেকে কয়েক শতাব্দীতে কোন গোলাপ ফুল পয়দা হয়েছে কি?

০ পানি দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে, এর কোন উদাহরণ মিলবে কি ? মাটি থেকে তারার বিচ্ছুরণ আর পাথর থেকে মোতি সৃষ্টি হয়েছে কি?

০ কখনো কোন বস্তু তার বিপরীত অভিমুখে ফিরেছে কি? মুকুল থেকে কখনো অগ্নিস্ফুলিংগ উঠেছে কি? আর অগ্নিশিখা থেকে কখনো শিশির ঝরেছে কি?

০ বাতিলের দেশের যাত্রীদল কখনো দীন ও মিল্লাতের সন্ধান পেয়েছে?– শুষ্ক মাটিতে বীজ বপন করে কখনো কেউ সাগরের ফল লাভ করেছে কি ?

০ যে ইটের প্রকৃতি জানে না, পাথরের ধরন সম্বন্ধে যে অজ্ঞ–সে স্তম্ভ ও মিহরাবের বর্ণনা শুনাবে?

০ যে রাজমিস্ত্রি স্থপতি বিদ্যা কি তা জানে না–মহল তো দূরের কথা সে একটি ঝুপড়িও বানাতে পেরেছে কি ?'

০ সে কোন কিছু নির্মাণে সক্ষম হলেও তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য–তার তৈরী সে ঘর অবশ্যই একদিন মাটির স্তূপে পরিণত হবে ।

০ অনুরূপ যে অন্যের জ্ঞানভান্ডার হতে আহরণ করে–অনুরূপ যে বলে– 'আমি নবী' অথচ সে নবী নয়।

www.pathagar.com

০ সে এমন এক বৃক্ষ পৃথিবীতে যা প্রসার করবে না- সেই বিভ্রান্ত মস্তিকের মতবাদ দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

০ মিথ্যার উপর একটি চিরস্থায়ী ধর্মের ভিত্তি হবে তা কি সম্ভব- মূল্যবান যুগের ললাটে পদচিহ্ন একটি শ্রান্ত পায়ের?'

০ মিথ্যার এরূপ প্রসার, মানব হৃদয়ে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যুগ যুগ ধরে তার সত্যবাদিতার উপর কোটি কোটি মানুষ সাক্ষ্য দেয়?

০ মানলাম মিথ্যাও কোন সময় উন্নতি লাভ করে, কিন্তু তা হয় এরূপ- যেমন প্রবাহিত হলো বায়ুর একটি ঝাপটা কোমল মুকুল রাশির উপর দিয়ে ।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ আল্লাহ্‌র বান্দার মনের মণি কোঠায় যে ব্যক্তিত্বের স্থান সে হবে ঐন্দ্রজালিক-প্রতারক, হে নাদান, বল, তোমার অন্তর্দৃষ্টি কোথায় ?

০ কেউ মরীচিকার যতই না পূজা করুক কিন্তু সে এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারবে না, স্মরণ রাখো, মিথ্যা যুগ যুগ ধরে টিকে থাকতে পারে নাই, থাকতে পারবেও না ।

০ আল্লাহ্‌র অগণিত বান্দা যারা তাঁর নওয়াযিশ ও করুণার পাত্র-তারা ঘৃণ্য ও নাপাক ষড়যন্ত্রের সব সময় অসহায় শিকার হয়ে থাকবে ।

০ যদি আমরা মেনে নিই- এ পৃথিবীটা শয়তানের ভোজবাজির জায়গা- তবে আল্লাহ্‌র রুচিজ্ঞানের প্রতি আমাদের উপহাস করতে হয় ।

০ যে সর্বাপেক্ষা মিথ্যাভাষী সে-ই আল্লাহ্‌র পথের দিশারী-তাই যদি হয়, তবে আল্লাহ্‌র মহিমা-গৌরব একটি প্রতারণা ও ভান মাত্র ।

০ শোন, যার অন্তরে নবুয়তের রঙ ও জওহর রয়েছে সে কখনো মিথ্যাচারী হতে পারে না-এতে সন্দেহ থাকলে, তবে পয়গাম্বরের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করো।

০ সেই রূহ্ যাকে আমরা অটল ও চিরস্থায়ী আইনের ভিত্তি বলতে পারি- মনের নীরব গহনে যে-রূহ সর্বদা আবগাহন করছে ।

০ যে হৃদয় মানবতার স্থায়িত্বের জন্য রহস্যরাজির সন্ধানে রত-যে হৃদয় সৃষ্টি-রীতি ও জগতাত্মার সাথে গোপন সংবাদ বিনিময়ে বিভোর ।

www.pathagar.com

০ যে পবিত্র সত্তা মানব জাতির কল্যাণ সাধনে মহা উদ্বিগ্ন–মানুষের অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতিও তাঁর প্রখর দৃষ্টি নিবেশিত থাকবে।

০আসমানের নকশাসমূহ যাঁর অন্তরে সদা অঙ্কিত–জীবন ও মরণের টানা-পড়েন সর্বদা যাঁর দৃষ্টির সামনে ।

০ এ নশ্বর পৃথিবীর সভায় প্রতি মুহূর্ত তিনি নতুন দীপ প্রজ্বলিত করেন– তাঁর হৃদয়ে ইল্‌ম ও আমলের প্রশ্নের স্ফুলিঙ্গের বিস্ফোরণ ঘটে।

০ এ সব হাকীকত নিয়ে যিনি ব্যস্ত ও নিমজ্জিত থাকেন, তিনি কি সীমা লঙ্ঘন করতে পারেন ?–ফিতরতের রহস্য সম্পর্কে যিনি পরিচিত তিনি কি মিথ্যা বরদাস্ত করতে পারেন ?

০ এ সমস্ত প্রমাণের আলোকে এটা অবশ্যই মানতে হবে যে–পয়গম্বর–ই–আরব (সা)–এর বার্তা প্রকৃতপক্ষে মহামহিম আল্লাহ্‌রই বার্তা ।

০ মানবজাতি এ বার্তা শুনেছে–এর পর যদিও বহু শতাব্দী গত হয়েছে–অনেক জাতির উত্থানের পর পতন হয়েছে, হাজারো মানুষ পয়দা হয়ে মরে গেছে ।

০ কিন্তু তাঁর বাণীর প্রতিটি অক্ষর এখনো জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল–তাঁর বাণীর প্রতিটি বিন্দু থেকে জীবনের সহস্র স্ফুলিংগ বিস্ফোরিত হচ্ছে।

০ তুমি তোমার অন্তরে একটু ভেবে দেখ– এ দীন–এ পদ্ধতিতে এ জিনিস কেন ?–যদি এ দীন সত্য না হয় তবে এর এরূপ স্থায়িত্ব কেন?

০ যদি এটা কুরআন না হয় তবে আল্লাহ্‌র হাত এর হিফাজত করছেন কেন?–যদি এটা গলদ হয় তবে আল্লাহ্‌র মহিমা কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?

০ এ যদি স্পন্দনহীন কোন বিষয় হয় তবে মানবজীবনে এ আলোড়ন কেন?–

যদি এটা ঝুঠলানোরই উপযোগী হয় তবে ফিতরাতের জবান নীরব কেন?

০ যদি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে হয় তবে সকল দিক থেকে আমরা যাচাই করি না কেন ?

এসো, পয়গাম্বরীর প্রমাণের জন্য আরব ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

www.pathagar.com

০ লু হাওয়া ও উড়ন্ত উত্তপ্ত বালির জগত-মরীচিকার ভয়ংকর এ দুনিয়া - রক্তিম অণুর সাগর 'তাপপূর্ণ ভয়াবহ মরুভূমি'।

০ বু-কুরাইশ ও ফারান -এর মসনদ 'খাওর'-এর তাখ্ত ও সিংহাসন যেথায় রয়েছে যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ, সম্পদ লুন্ঠন, তীর ধনুক ও তলোয়ারের ঝন্ঝনা।

০ ছিল না সেখানে নিরাপদ ও শান্তির কোন বিধি-বিধান , ছিল না কোন শালীনতা ।

মেঘ গর্জনে আসমানে কম্পন, জমিতে থরথরানি ।

০ রণশঙ্কায় ফিকে-লড়াই-এর ধূলোতে চতুর্দিক অন্ধকার - বিশ্ব-বেরাদরী থেকে পৃথক, সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ।

০ ফিতনার ভূমি, বিশৃংখলার দেশ, কান্নাকাটির মকাম এবং হা-পিত্যেশের স্থান-

ছিল না তথায় জাহেরী ইলম, ছিল না বাতেনী নূর, ছিল না মানব প্রেম, না ছিল সেথায় আল্লাহ্র ভয়।

০ সেই উঁচুনিচু তপ্ত টিলা, লু-হাওয়া-ঝাটিকাবর্তের ভয়-

সেই শাহ-ইখাওর'-এর প্রতাপ ও শক্তিমত্তা, সেই মেঘমেদুর আকাশের বর্ষণ কৃপণতা।

০ সেই পাহাড়ী উপত্যকায় উটের কাতারের আড়ম্বর-

এদিকে সেদিকে উত্তুঙ্গ উদ্ধত পর্বতরাজি, গর্ব গরিমায় মাথা উচুঁ করে দাঁড়ানো ।

০ ওদিকে আবাদীর বাইরে প্রচন্ড উত্তপ্ত কঙ্করময় ভূমি-

এদিকে আবাদীর অভ্যন্তরে ধনুক কামানের গর্জন ধ্বনি ।

০ এদেশ আর সেথায় একজন ইয়াতিম বালক যাঁর নেই কোন ওয়ারিশ, নেই কোন অভিভাবক-

যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন শত ক্লান্তি ও শ্রান্তির শিকার একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।

www.pathagar.com

০ বঞ্চিত যে পিতৃস্নেহ থেকে মাতৃছায়া থেকে, যিনি দুঃখে জর্জরিত, বালা মুসীবতে ভারাক্রান্ত–

যিনি সদা চিন্তামগ্ন, ব্যথা বেদনায় যাঁর নয়নাশ্রু শুষ্ক, যার নেই আমোদ, নেই কোন আনন্দ ।

০ যিনি কিতাব থেকে অজ্ঞ, শিক্ষা–দীক্ষা এবং তরবিয়ত থেকে মুক্ত–

তিনি যখন চোখ খুললেন সর্বদিক থেকে সাহায্য–সহযোগিতার পথ পেলেন রুদ্ধ ।

০ পিতৃহীন যে বালক এরূপ দুঃখক্লিষ্ট ও প্রতিকূল অবস্থায় আরবে লালিত পালিত হলেন–

তিনি পয়গাম্বর না হলে পয়গম্বরী সম্পর্কে ওয়াকিব হলেন কিরূপে ?

০ বিশ্ব সভ্যতা ও তমদ্দুনের সাথে যিনি সম্পর্কহীন তাঁর বাণী কি সভ্যতার ও তাহযীবের ভিত্তি?

নিরস মরুতে লালিত যিনি, তাঁর মস্তিষ্ক বিশ্বকে আদর্শের ছাঁচে গড়ে তোলবে?

০ যে শিশুর জীবন গড়ে উঠছে আজরী মূর্তির দেশে–

সে শিশু তৌহিদের ধ্বনি নিয়ে ফাটল সৃষ্টি করবে কাফিরী মিহরাবে ।

০ যদি এ উম্মী নবীর ধ্বনি আসমানী ধ্বনি না হয় –

তবে এ ফয়েজ এ শক্তি তিনি কোথা থেকে প্রাপ্ত হলেন ? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই ।'

০ আরবের হীরু আজমের সুলতান, আসমান জমিনের অভিভাবক–

পৃথিবীতে তুমি অনুগ্রহ ও পরদুঃখ–কাতরতার সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর ভিত্তি স্থাপন করেছ।

০ বসন্তের মেঘপুঞ্জরূপে প্রভাতের বায়ুর জন্যে স্কন্দে আরোহী হয়ে তোমার পয়গাম যখন চললো, তখন বাতিলের প্রস্তর কঙ্করগুলো বৃক্ষ পল্লবরূপে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

০ হয়ত নিয়তির ইচ্ছা থেকে আপনার বুদ্ধিমত্তার সৃজন–

www.pathagar.com

নয়ত ঝন্‌ঝা বায়ুর খিলানে আপনার দীনের বাতি প্রদীপ্ত কেন? সমুদ্ভাসিত হওয়ার মত জীবনের অনেক মণিমুক্তা বক্ষস্থলে চাপা পড়ছে—

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এ অধমের দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করুন, হে হৃদয়ের জাগ্রত দিশারী।

দাগ দেহলবী

[জন্ম ১৮৩১ ইং। ওফাত ১৯০৫। তাঁর নাম নওয়াব মির্জা খান। দিল্লীতে তাঁর জন্ম। তিনি উর্দু কবি 'জাওক'—এর সাগরেদ ছিলেন।]

০ এলাহী, আমার অন্তরে যেন রসূলুল্লাহ্‌ (সা)—র কালেমা স্থায়ী থাকে, উভয় জাহানে হযরত মুহাম্মদ (সা)—এর পবিত্র নামের বদৌলতে যেন আমার সম্মান রক্ষা পায়।

০ মি'রাজের রাতে ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে, তালেব মতলুবের মধ্যে আলাপ হয়েছে কতই না ভাল হয়েছে।

০ হাশরে গুনাহগারদের আদরের কোন সীমা থাকবে না, আপনি তাদের ক্ষমার ব্যবস্থা করবেন, কতই না উত্তম।

জাফর আলী খান

'যদি আসমান ও জমিনের এ মহফিলে 'লওলাকা লামা—'এর গুঞ্জন না হতো, তবে না নক্ষত্ররাজিতে নূর থাকতো, না থাকতো বাগানের সৌন্দর্য ও রঙ।'

মওলানা আবুল ইরফান মুহাম্মদ উসমান বিহারী

[তাঁর রচিত কবিতা গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৪০ হিজরী লিপিবদ্ধ আছে]

০ মা'আরিজ কিতাবের বর্ণনায় রয়েছে যে, জীবরাঈল (আ)—এর দু'চোখের মাঝখানে, স্পষ্টরূপে কলেমা—ই—লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লিপিবদ্ধ আছে।'

০ কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 'হামদের পতাকা হাতে তুলে নিবেন, অতঃপর আদম (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত সকল নবী (আ) তাঁদের অনুসারীদেরসহ লিওয়া—ই—মুস্তফা —এর আশ্রয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

০ মা'আরিজ কিতাবে বর্ণনা আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে বোরাকে আরোহণ করে মি'রাজে গমন করেছিলেন সে বোরাকের ললাটে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিপিবদ্ধ ছিল ।

কলন্দর বখ্‌ত জুরআত

['ইনশা' ও 'মাসহাফী'-এর সমসাময়িক কবি। 'গুলশন-ই-বিখার' নামক কবিতা গ্রন্থে তাঁর পরিচিতিতে বলা হয়, বিশ বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়, গ্রন্থটির মুদ্রণকাল ১৮৭৪ ইং]

০ মুহাম্মদ (সা) হলেন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রশংসিত নবী, বান্দা তাঁর কি প্রশংসা করবে ? কারণ তা হবে অনেকটা খোদায়ীর দাবী তুল্য ।

আকবরইলাহাবাদী

০ হে দিল, আমায় নিয়ে চল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে, আমাকে দেখাও-জান্নাত মুহাম্মদ (স)-এর পথ।

০ সকলই মুহাম্মদের চূর্ণকুন্তলে প্রেমিক মুহাম্মদের মুখমন্ডল আল্লাহ্‌র নূরের প্রতিচ্ছবি।

০ কুরআন হচ্ছে ফুল বাগান , আর তার প্রতিটি অক্ষর হচ্ছে ফুল-এর প্রতিটি পুষ্পে লুকিয়ে আছে মুহাম্মদের সুবাস।

০ বিশ্ববাসীকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও-মুহাম্মদের চরিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ ।

০ যাঁর তাওয়াজ্জোহ্ হয় মুহাম্মদের দিকে।

আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন ।'

হযরত আবু জা'ফর সিদ্দিকী ফুরফুরা

'আদি থেকে তোমার জন্য সবাই
অধীর হলো হে রসূল
আমি হলাম মসৃত দেওয়ানা
তোমার জন্য হে রসূল ।----

www.pathagar.com

বিশ্বনবী (স) - র প্রশাসনিক পদ্ধতি

মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ

অবতরণিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়কর অবদান সর্বজনস্বীকৃত । তাঁর আবির্ভাবের প্রাক্কালে বিশ্ব মানবতা ছিল পাশবিকতার জঘন্য শৃংখলে আবদ্ধ । মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও পরবর্তী হযরত মূসা -ঈসা (আ) প্রমুখ নবী-রসূলের প্রচারিত একত্ববাদের শাশ্বত আদর্শ তখন ধূলায় অবলুণ্ঠিত । একদিকে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মত অহমিকা, অন্যদিকে সৃষ্টিকেই স্রষ্টা ও মনিব মনে করার হীন মানসিকতার ফলে মানুষ হারিয়ে বসেছিল এ বসুন্ধরায় তার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা । এক কথায় সেদিনের সমাজে বিরাজ করছিল অন্তহীন নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা। এ নৈরাজ্য ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে বুদ্ধিনিষ্ঠ সামাজিক জীব হিসেবে পরিচিত মানবগোষ্ঠী অধঃপতন ও কুসংস্কারের অতল গহ্বরে নিপতিত ছিল। ফলে মানব সমাজে মুক্তি, শান্তি ও প্রগতির আশা হয়েছিল সুদূরপরাহত । মানবেতিহাসের এই চরম যুগ সন্ধিক্ষণে মুক্তির মহাপয়গাম নিয়ে ধরিত্রীর কোলে আবির্ভূত হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পাশবিকতার বিনাশ সাধন করে মানুষকে তার স্বকীয় আসনে সমাসীন করার মহাপরিকল্পনা পেশ করলেন তিনি বিশ্বমানবতার সামনে । তিনি ঘোষণা করলেন, মানুষ যেমন খোদা নয়, তেমনি সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও গোলামও নয়- অসংখ্য মিথ্যা খোদার গোলামীকে অস্বীকার করে মানুষ এভাবেই নতুন রূপে তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করলো ।

www.pathagar.com

বিশ্বনবী একাধারে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন । তিনি একদিকে ছিলেন শাসক; অপরপক্ষে ইমাম। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ কর্মকান্ডের শীর্ষে ছিলো তাঁর অবস্থান। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে তাওহীদভিত্তিক ধর্ম দর্শনের নিরিখে তিনি তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতায় মনোনিবেশ করেন । এ পর্যায়ে তিনি "ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ , গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধ , আল্লাহ্‌র একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস, নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁর নেতৃত্বের স্বীকৃতির আলোকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রচনা করেন । উক্ত রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে গৃহীত হয়। তবে নাগরিক সাধারণের মতামতের যথার্থ মূল্য দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হননি ।" তিনি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিলেন পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান বলে খ্যাত "মদীনার সনদ " । এ সনদের মর্মমুকুর হচ্ছে সাধারণতন্ত্র। আর এই সাধারণতন্ত্রই পৃথিবীর ইতিহাসে 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের নিকট পরিচিত ।

মহানবী (স)-র যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরের এলাকা মুসলমানদের হাতে আসেনি। আর শতধা বিচ্ছিন্ন আরব সমাজকে সংঘবদ্ধ করে একটি পূর্ণাংগ রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিপূর্ণভাবে দাঁড় করানোর সুযোগও তাঁর হয়নি। তবুও ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপরেখার বুনিয়াদ তিনি রচনা করে গেছেন তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালের সারা বিশ্বে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত মুহম্মদ (স)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের শাসনবিধি পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলো উদ্ভাসিত হয় তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অংগ। তবে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে বা সার্বভৌমত্ব-র অবস্থান কোথায় তা নিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শে বাগবিতন্ডার অন্ত নেই। গণতান্ত্রিক সরকার

www.pathagar.com

জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে জনগণকে ভোট প্রয়োগের যে ক্ষমতা দেয় তা ব্যতীত জনগণের হাতে কোন ক্ষমতাই থাকে না। তাই এ ধারণা কাল্পনিক। নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকার প্রথাও সঠিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। মানুষ নশ্বর জীব। তাই সে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। এই পর্যায়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

''বল, হে আল্লাহ্‌ তুমিই রাজ্যাধিপতি, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর, তোমার হাতেই মংগল ভান্ডার। তুমি সর্ব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।"

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য

যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত তারা আল্লাহ্‌র আইনের অধীন এবং একদিকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করবেন, অপরদিকে জনগণের নিকটও দায়ী থাকবেন। আইন প্রণয়নকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌, আর মহানবী (সা) ছিলেন তার বাস্তব প্রয়োগকারী।

হযরত মুহম্মদ (স) রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতেন, যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করতেন। তিনি জনগণের উপর কর ধার্য ও আদায় করতেন এবং প্রশাসনিক কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। বিচারক হিসাবে তাঁর সকল রায়ই ছিল চূড়ান্ত এবং জুম'আর নামাযে তিনি ইমামতি করতেন। তাঁর ক্ষমতা সকল বিষয়েই ছিল সার্বভৌম। এমন কি মুসলিম আইনবিদদের অনেকের মতে 'অনেক ক্ষেত্রে রসূলের সুন্নাহ আল্লাহ্‌র কুরআনকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।"

রসূলে করীম (স)-এর সার্বভৌমত্ব প্রসংগে ডঃ এস. এ. কিউ হোসাইনী মন্তব্য করেন ঃ He regulated social relations; he formulated laws in the light of the Quran and enforced them ; he raised armies and commanded them ; he acquired territories and administered them.

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ্ আইনত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং বিশ্বনবী কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার

মহানবী (সা) ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের Key stone of the Pyramid-সদৃশ। তাঁকে ঘিরেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো আবর্তিত ছিলো। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান বিচারপতি, প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও আইনপ্রণেতা।

মদীনার সনদের সংক্ষিপ্তসার

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরতে হলে মদীনার সনদ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা জরুরী ।

ক. মদীনার আনসার, মুহাজির, খৃস্টান, ইহুদী, তাদের কাওয়ালী ও মিত্রবর্গ সকলে মিলে একটি অখন্ড জাতি (উম্মাহ) বলে পরিগণিত হবে। এই রাষ্ট্রে সকলের জন্য সমানাধিকার স্বীকৃত । আবার দুশমনের হামলা থেকে মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্বও সকলের উপর বর্তাবে । যুদ্ধের সময় প্রত্যেকে স্ব স্ব ব্যয়ভার নির্বাহ করবে । সনদের অংগীভূত সকল জাতি নির্বিঘ্নে স্ব ধর্ম পালন করবে।

খ. উম্মাহভুক্ত কেউ নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে গমন করতে পারবে না। বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কারো সাথে কেউ পৃথক চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না, মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না । মদীনা আক্রান্ত হলে সকলেই সমভাবে প্রতিরোধ করবে।

গ. মদীনায় বসবাসরত ইহুদীরাও মুসলমানদের সাথে এক জাতি হিসাবে সম্পৃক্ত । যতদিন তারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয়, ততদিন তারা সমানাধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে ।

ঘ. যুদ্ধ বা শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই মদীনায় রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়।

www.pathagar.com

ঙ. বিচার ব্যবস্থায় মহানবীর সর্বময় কর্তৃত্ব ঘোষণা করা হয় এবং নিজেদের মধ্যে যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার দায়িত্ব তাঁর উপর সোপর্দ করা হয়।

চ. মক্কায় কুরাইশরা সাধারণভাবে মদীনা রাষ্ট্রের প্রকাশ্য দুশমন। তাদেরকে বা তাদের মিত্রদেরকে সহায়তা করতে নিষেধ করা হয়।

ছ. সনদে আরও বলা হয় যে, প্রত্যেকটি গোত্র সামগ্রিকভাবে হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সার্বভৌম ক্ষমতা ও নেতৃত্ব মেনে চলবে। তবে স্ব-স্ব গোত্রপতিদের গোত্রীয় প্রাধান্যও অক্ষুণ্ন থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র পূর্ববর্তী চুক্তিবদ্ধ এবং দেয় 'মৃত্যুগণ' ও 'মুক্তিপণ' সমস্ত এককভাবে প্রদান করবে। সেখানে রাষ্ট্র কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

রাষ্ট্রীয় প্রধান

মহানবী (সা) তাঁর প্রদত্ত সনদের আলোকে মদীনা রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতির মর্যাদায় ভূষিত হন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে সরকার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সকলের সমান নাগরিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করেন।

মহানবী (সা)-র সচিবালয়

সরকার পরিচালনার কোন আদর্শ তাঁর সামনে ছিলো না। তিনি তাঁর অপরিসীম প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও প্রখর বুদ্ধি বলে মদীনার মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে একটি সচিবালয় গড়ে তোলেন। পৃথিবীর রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদীনায় এই রাষ্ট্রটি ছিলো মানব সভ্যতার ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ছিলো বিভিন্ন দফতর ও বিভাগ। দফতর ও বিভাগগুলো ছিলো নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ : বিশ্বনবী (সা) ছিলেন মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মহানায়ক। হযরত হানযালা ইবনে আররাবী (রা)

www.pathagar.com

ছিলেন রসূলে করীম (সা)-এর একান্ত সচিব। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীল সংরক্ষণ করতেন।

২. ওহী লিখন বিভাগ : এই দফতরের সাথে সংশ্লিষ্টদের কাতিব বলা হতো। হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা) মূল ওহী লেখক ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) এবং হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত হতেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-ও ওহী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. দাওয়া বিভাগ : এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রসূল (সা)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়ী (প্রচারক)-দিগকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নিকট প্রেরণ করতেন। আল্লাহ্র যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো ছিলো দায়ীদের মূল কাজ। এ ছাড়া যাঁরা ইসলামের সুশীতল নীড়ে আশ্রয় নিতেন তাঁদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া ও তাঁদের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলাও দায়ীদের অন্যতম দায়িত্ব ছিলো।

৪. পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ : রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রসূল (সা)-এর বিভিন্ন ফরমান, বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের কাছে প্রেরিত চিঠি লিখন, প্রাপ্ত তথ্যাবলী এবং চিঠিপত্রাদি অনুবাদ করা ছিল এই বিভাগের দায়িত্ব। যায়দ ইবনে সাবিত (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম (রা) এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

৫. বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিভাগ : বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে সমঝোতামূলক যোগসূত্র স্থাপন ও তাদের সাথে সৌহার্দমূলক আচরণ সম্পর্কীয় কার্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ও হাসান ইবনে নুমাইর (রা)।

৬. অভ্যর্থনা বিভাগ : রসূল করীম (সা)-এর দরবারে সর্বদা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভীড় লেগে থাকতো। এঁদের অভ্যর্থনা ও সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) এবং হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)।

www.pathagar.com

৭. নিরাপত্তা (পুলিশ) বিভাগ ঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য কোন পুলিশবাহিনী ছিলো না। তবে একদল নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবী সাহাবা নিরাপত্তা ও প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিভাগকে 'আশ্-ওরতা' বলা হতো। হযরত কাইস ইবনে সা'দ (রা) এ বিভাগের প্রধান ছিলেন।

৮. প্রতিরক্ষা বিভাগ ঃ রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে ইসলামী রাষ্ট্রের সংঘাতময় পর্ব উত্তরণের জন্য রসূল (সা) প্রতিটি মুসলমানকে সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রে কোন বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিলো না। প্রয়োজনে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে রণাঙ্গণে উপস্থিত হতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মহানবী (সা) স্বয়ং ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। সৈন্যগণ ছিলেন পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও বর্মধারী।

৯. সমরাস্ত্র নির্মাণ বিভাগ ঃ আল্লাহ্‌দ্রোহীদের সাথে মুকাবিলার জন্য যুগোপযোগী সমরাস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনা ছিলো মহানবীর সামরিক কলাকৌশলের একটি অনন্য দিক। তরবারি, তীর, ধনুক, ঢাল, বল্লম, মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) ইত্যাদি জরুরী যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও সংরক্ষণ কার্যাদি এ বিভাগের দায়িত্বের আওতাধীন ছিল। হযরত সালমান আল-ফারসী (রা) ছিলেন রসূলে করীম (সা)-এর সামরিক উপদেষ্টা।

১০. বিচার বিভাগ ঃ রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ের প্রধান হিসাবে রসূল (সা) বিচার বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। হযরত আলী (রা) এবং মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) রসূল (সা) কর্তৃক বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি লাভের গৌরব অর্জন করেছিলেন। প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ বিচার কার্যও তিনি সম্পাদন করতেন।

১১. হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ ঃ জাতীয় আয় ও ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুযাইকীব ইবনে আবি ফাতিমা (রা)। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।

১২. যাকাত ও সাদকাহ্ তহবিল বিভাগ ঃ যাকাত ও সাদকাহ্ হিসাবে যেসব সম্পদ ও অর্থকড়ি সংগৃহীত হতো সেগুলোর হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব

www.pathagar.com

অর্পণ করা হয়েছিল হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) ও যুহাইর ইবনে আস-সাল্ত (রা)-এর উপর। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেছিলেন।

১৩. খেজুর বৃক্ষের কর আদায় বিভাগ ঃ মদীনা রাষ্ট্রে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল খুরমা-খেজুর। মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ খেজুর কর হিসেবে রাজকোষে আসতো। হযরত হুযায়ফা ইবনে আল ইয়ামান (রা) ছিলেন এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত।

১৪. আদমশুমারি বিভাগ ঃ বিভিন্ন গোত্র, তাদের জলাশয়, আনসার, মুহাজির পুরুষ ও মহিলাদের হিসাব সংরক্ষণ করতেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম (রা) এবং হযরত আলা ইবনে উকবা (রা)।

১৫. নগর প্রশাসন বিভাগ ঃ হযরত উমর ফারূক (রা) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৬. নগর উন্নয়ন ও প্রকৌশল বিভাগ ঃ গণপূর্ত ও নগর উন্নয়নের ভিত্তি এ সময়ে রচিত হয়। ঘরবাড়ি তৈরির নকশা ও প্লান তৈরির কাজ শুরু হয়। মদীনার মসজিদে নববীর স্থাপত্য কৌশলের পূর্বাভাস রসূল (সা)-এর যমানাতেই হয়েছিল। ইবনে সা'দ তাবাকাতে লিখেছেন-সে সময় রসূল (সা) জমির উপর বাড়ির যে চিহ্ন নির্ধারণ করেছিলেন অদ্যাবধি হযরত উসমান (রা)-এর বাড়ি সে স্থানেই বিদ্যমান রয়েছে।

১৭. স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ মদীনায় রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতেন । হারিস ইবনে সালাহ্ তৎকালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসকগণ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা পেতেন।

এভাবে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত নবীন ইসলামী রাষ্ট্রে একটি বহুমুখী কার্যাবলী আন্জাম দেওয়ার সুষ্ঠু পরিকল্পনাভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক সচিবালয় গড়ে উঠেছিল।

পররাষ্ট্র নীতি

পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সমঝোতা, মৈত্রীবন্ধনে উদারতা এবং শত্রুর প্রতি ক্ষমা সুন্দর মনোভাব পোষণ ছিলো রসূলে করীম (সা)-এর পররাষ্ট্র নীতির

www.pathagar.com

মূল লক্ষ্য। চরম শত্রুর প্রতিও ক্ষমাসুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ ঔদার্য প্রদর্শন করা ছিলো তাঁর নীতি। মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদেরকে তিনি নিঃশর্তে ক্ষমা করেন এবং তায়েফের অত্যাচারী সম্প্রদায়কে ক্ষমা ও তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে রহমত কামনার মাধ্যমে তিনি অনুপম কূটনৈতিক মহানুভবতার পরিচয় দেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কাবাসীদের বহু শর্তকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে এই চুক্তির প্রতি অবিচল থেকে কূটনৈতিক দ্ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু মাত্র হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক কিংবা ত্রিপাক্ষিক চুক্তিসমূহের শর্ত প্রতিপালনে তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। উম্মী নবী (সা)-র পক্ষে লিখিত এসব চুক্তি ও দলীলের আক্ষরিক বিধানের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা প্রদর্শন এক বিস্ময়কর ব্যাপার বৈ কি!

অর্থ ব্যবস্থা

রাষ্ট্রনায়ক নবী করীম (সা) রাষ্ট্রজীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত অসাম্য দূরীকরণ, রাষ্ট্রের প্রশাসনে ও সামরিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রের গরীব নাগরিকদের ভরণ-পোষণ ও পুনর্বাসনের জন্য এক সুসংহত অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল মূলত পাঁচটি-গনীমত, ফাঈ, যাকাত, জিযিয়া ও খারাজ। প্রথম ও দ্বিতীয়টি ছাড়া অবশিষ্ট উৎসগুলো ছিলো বার্ষিক। গনীমতের মাল বন্টনে পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে বর্ণিত পদ্ধতিতে কল্যাণের ভিত্তিতে অনুসরণ করার নির্দেশ ছিলো। $\frac{১}{৫}$ অংশ উদ্বৃত্ত সৈনিকদের মধ্যে পাই পাই করে খরচ করা হতো। নগদ টাকা, ফল-মূল, উৎপন্ন ফসল, জীবজন্তু এবং পণ্য সামগ্রীর উপর আরোপিত আবশ্যকীয় কর, যাকাত-কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ৮টি খাতে ব্যয় করা হতোঃ (১) ফকির (২) মিসকীন (৩) নও মুসলিম (৪) ক্রীতদাস (৫) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৬) মুসাফির (৭) যাকাত আদায়কারীর বেতন এবং (৮০ অন্যান্য জনহিতকর কাজ। যে এলাকা হতে যাকাত আদায় করা হতো সাধারণত সে এলাকায় হকদার লোকের সিকট প্রথম বন্টন করা হতো। অমুসলিম প্রজার নিকট থেকে আদায় করা হতো জিযিয়া। সামর্থ্যবান প্রাপ্ত বয়স্ক অমুসলমানকে মাথাপিছু ১ দীনার হারে জিযিয়া

www.pathagar.com

কর পরিশোধ করতে হতো। বাহরায়ের এলাকা হতে জিযিয়া বেশী আদায় হতো, অমুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে মালিকানা স্বত্বের বিনিময় জমিনের উৎপন্ন ফসলের উপর একটি বিশেষ অংশ পারস্পরিক সম্পতিক্রমে 'খারাজ' কর নামে আদায় করা হতো। এই কর খাইবার অঞ্চলে বেশী আদায় হতো। যাকাত ও জিযিয়া আদায়কারীদের প্রথম আনুষ্ঠানিক নিয়োগ দান করা হয় নবম হিজরীতে। সাধারণত গোত্রের সরদারগণই আপন গোত্রের আদায়কারী সামায়িকভাবে নিয়োজিত হতো। আদায়কারীদের প্রতি নির্দেশ ছিলো (১) ফরমান অনুযায়ী আদায় করা। বাছাই করে বেশী আদায় না করা, (২) উপঢৌকন গ্রহণ না করা, (৩) প্রয়োজন পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। কেউ নির্ধারিত পরিমাণের বেশী পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তা আর্থিক খেয়ানত বলে গণ্য হতো।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার নীতি

ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গ ও নবী করীম (সা)–এর সুস্পষ্ট নীতি ছিলো। যে ব্যক্তি পতিত ভূমিকে আবাদ করবে, সে তার মালিক হবে। যে ব্যক্তি কোন ভূমিকে প্রাচীর দ্বারা ঘিরে নেবে, তা তার মালিকানায় চলে যাবে। জমি বর্গা চাষের বিধান ছিল। চাষাবাদের শর্তে রাষ্ট্রীয় খাস জমি বন্দোবস্ত বা জায়গীর হিসেবে দেওয়া হতো।

যুদ্ধকৌশল ও সামরিক প্রশাসন

সময়ের স্বল্পতা ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্ব স্ব ব্যস্ততার দরুন মহানবী (সা) নিয়মিত সেনা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি। তবে সাহাবায়ে–কিরাম তাঁর নির্দেশের প্রতি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, হাসিমুখে জীবন কুরবান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে তাঁরা গৌরবজনক বিষয় বলে জানতেন। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে বাছাই পর্বে বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাঁরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তেন। বয়সে ছোটরা রসূল (সা)–এর সামনে পরস্পর কুস্তি ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরামর্শ করে হার–জিতের নমুনা প্রদর্শন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি লাভ করতো।

www.pathagar.com

প্রয়োজনের সময় রসূল (সা) জাতিকে তলব করতেন। তাঁরা পংগপালের ন্যায় ছুটে এসে সেই আহ্বানে সাড়া দিতেন।

সাতাশটি যুদ্ধে মহানবী (সা) স্বয়ং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য যুদ্ধে এক-একজন প্রতিনিধিকে সেনাপতিত্ব প্রদান করে প্রেরণ করতেন। অপরিহার্য কারণে রাহমাতুললিল আলামীনকে এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। এর কোনটিতেই তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাব ছিলো না।

সৈন্যবাহিনীর শ্রেণীবিভাগ

সেনাবাহিনী প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সারিবদ্ধভাবে ব্যূহ রচনা করা হতো। প্রথম সারিতে বর্শাধারী সৈনিকেরা হাঁটুতে ভর দিয়ে সম্মুখে ঢাল ধরে শত্রুর নিকটবর্তী হওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকতো। দ্বিতীয় সারিতে তীরন্দাজ শ্রেণী পরিমাণ মতো দূরত্বে ব্যূহ রচনা করতো। তৃতীয় সারিতে অশ্বারোহী বাহিনী সামগ্রিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতো। সর্বশেষে থাকতো পদাতিক বাহিনী। সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যুগের রীতি অনুসারে উভয় পক্ষের বাছাইকৃত সৈনিকের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতো।

শিক্ষানীতি

পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানবতাকে উদ্ধার করে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই রসূল (সা) মেদিনীর বুকে আগমন করেন। একজন নিরক্ষর ও উম্মী নবী হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-পুরুষ-মহিলা যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিশ্বমানব সভ্যতার ইতিহাসে। তাঁর প্রতি যে সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় তাতে বলা হয়েছেঃ 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাদিগকে জমাট রক্তবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন।, যিনি তোমাকে কলম দ্বারা নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ যা জানত না তাই শিক্ষা দিয়েছেন।"-সূরা আলাক

পরম সত্তা মহান আল্লাহ্কে জানা, আত্মোপলব্ধি হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ পর্যায়ে ইরশাদ হচ্ছেঃ যে নিজকে চিনেছে সে তার প্রতিপালককে চিনেছে।"

www.pathagar.com

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই মহানবী (সা) শিক্ষার্জনের উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেনঃ প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয। জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়োজন হ'লে সুদূর চীনে যাও।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র

মহানবী (সা) মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করেন। মদীনায় মসজিদে নববীর এক কোণে ঝুপড়ি তৈরি করে একদল সাহাবী সার্বক্ষণিকভাবে রসূল (সা)-এর নিকট নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানপিপাসু এই দলটিতে 'আহলে সুফ্‌ফা' বলা হতো।

শিক্ষা বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের জুড়ি ছিলো না । বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের অনেককে দশজন করে মুসলিম বালক-বালিকা ও অশিক্ষিত পুরুষকে শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছিলেন । প্রতিনিধিত্ব আগমনের বছর প্রত্যেক প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি একজন করে মুবাল্লিগ (প্রচারক) প্রেরণ করেছিলেন।

তিনি ঘোষণা করেন ঃ শিক্ষিত লোকেরা নবীদের উত্তরাধিকারী। যারা জ্ঞানান্বেষণের জন্য বের হয় তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান করে । জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতে শ্রেয় ।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

রসূল (সা)-এর মহান আদর্শ ছিলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে অবগাহিত। রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন জটিল ও ব্যাপক পরিসরভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সাহাবা-ই-কিরাম (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সকলের সম্মতিক্রমে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ অনুমোদন করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীদের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করে জনগণের মতামতের মূল্যবোধের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা জগৎ ধ্বংস না হওয়া অবধি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক উপস্থত গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

মূলনীতি হলো–ক. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, খ. সকল ধর্ম বর্ণ গোত্র সম্প্রদায়ের প্রতি উদার রীতি ও সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ, গ. নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ঘ. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ।

তাঁর কর্মকাণ্ড নির্দেশের প্রতি সাহাবা-ই-কিরাম ছিলেন সর্বদা আত্মোৎসর্গিত। জীবনের চাইতে তাঁকে বেশি ভালবাসতেন তাঁরা। তিনি যদি তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসাবে কাউকে মনোনীত করে যেতেন, তাঁকে বরণ করে নিতে সাহাবা-ই-কিরাম এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শ সৈনিক জগৎ গুরু হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে কাউকে মনোনীত করে যান নি। হযরত আবূ বকর (রা) সকলের অনুমতিক্রমে মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নমুনা এর চাইতে আর কী-ই বা হতে পারে।

www.pathagar.com

মহানবী (সা)-র যুগে উপমহাদেশ

অধ্যাপক আবদুল গফুর

খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী যে কোন বিচারেই মানব ইতিহাসে ছিল এক মহাক্রান্তিকাল। নবুয়তের ইতিহাসের আলোকে অথবা সভ্যতাসমূহের বিবর্তনের আলোকে–যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই সেদিনের বিশ্ব–পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হোক না কেন, মানবজাতির জন্য সেদিন নেমে এসেছিল এক ঘোর দুর্দিন। তাওহীদবাদের যে সুবিমল আলোকচ্ছটা বিশ্ব মানুষকে যুগে যুগে দেশে দেশে শান্তি ও স্বস্তির পথ দেখিয়েছিল, সেদিন সে আলো যেন নির্বাপিত হতে বসেছিল। অতীতের সকল ধর্মীয় মহাপুরুষের বাণী লোকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও সকল কিতাবকেই মানুষ সেদিন খেয়াল–খুশিমত বিকৃত, পরিবর্তিত করে বসেছিল। এক স্রষ্টায় বিশ্বাসের পরিবর্তে মানুষ নিজেদের খেয়াল–খুশিমত বানিয়ে নিয়েছিল অসংখ্য দেবদেবী। এক স্রষ্টার বদলে সৃষ্টিকে, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে, এমন কি মানুষেরই নিজেদের হাতেগড়া প্রতিমাকে পূজা করা আর তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার হীনমন্যতায় পেয়ে বসেছিল সেদিনের অধিকাংশ মানুষকে। কেউ কেউ আবার নিজেরাই নিজেদেরকে সর্বেসর্বা জ্ঞান করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করবার স্পর্ধা দেখাতে শুরু করেছিল। আবার জড়বাদী ভাবধারায় মোহাচ্ছন্ন এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পেয়ে বসেছিল সংশয়বাদের ধোঁয়াটে চিন্তা। অতীতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উত্তরপুরুষ বিভিন্ন সভ্যতার অহমিকাগ্রস্ত উত্তরসুরি সবার মনেই সেদিন জমাট বেঁধেছিল বিভ্রান্তির অতলান্ত অন্ধকার। আর বিভ্রান্তি ও আদর্শহীনতার এই অতলান্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল দুনিয়ার সকল জাতি ও তাবৎ জনগোষ্ঠী। ফলে মানব সমাজে সর্বত্র হিংসা–বিদ্বেষ, দ্বন্দ–সংঘাত, যুদ্ধ আর হানাহানির আগুন মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও স্বস্তির সম্ভাবনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে উদ্যত হয়েছিল।

www.pathagar.com

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে যেসব দেশ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার গৌরবময় উত্তরাধিকার বহনের দাবিদার ছিল, সে মিসর হোক কিংবা মেসোপটোমিয়া, গ্রীস কিংবা রোম, সিরিয়া কিংবা পারস্য, চীন কিংবা ভারতবর্ষ–কোথাও এই করুণ চিত্রের ব্যতিক্রম ছিল না। প্রথম নবী হযরত আদম (আ)–এর তাওহীদবাদের অনির্বাণ শিখাকে ভিত্তি করে যুগে যুগে যেসব প্রেরিত পুরুষ এ ধরাধামে সভ্যতার আলোকবর্তিকা বহন করেছিলেন, সেই হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ), তাঁদের অনুসারীরা সবাই ভুলে বসেছিল এসব মহাপুরুষের প্রচারিত আদর্শ। এমনকি তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশেষ অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলকেও খেয়াল–খুশিমত বিকৃত পরিবর্তিত করে বসেছিল হযরত ঈসা (আ)–র অনুসরণের দাবিদারগণ। তাওহীদের নিরাপোস প্রচারক হযরত ঈসা (আ)–কে তারা ঘোষণা করে বসেছিল আল্লাহ্র পুত্র, আর তাঁর প্রচারিত তাওহীদবাদকে বিকৃত করে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা। এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত কা'বাঘরের সংরক্ষক হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ)–এর উত্তরসুরি মক্কাবাসীরা পর্যন্ত এক আল্লাহ্কে ভুলে তিনশ'টি দেবদেবীর পূজায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সারা বিশ্বের এই যে সাধারণ অবস্থা তার ব্যতিক্রম ছিল না দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ ভারতবর্ষ এবং এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসূলের মধ্যে কোন্ কোন্ নবী রসূলের আগমন ভারতবর্ষে ঘটেছিল, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও পবিত্র কুরআনের মর্ম অনুসারে এই বিশাল জনপদে নবীর আগমন যে ঘটেছিল এ সম্বন্ধে কোন সংশয়েরই অবকাশ নেই। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে যে তিনটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল তা হলো: বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্ম। এগুলোর মূল প্রবর্তকরা হয়তো নিজ নিজ যুগে আল্লাহ্র সত্য দীনেরই প্রচারক হয়ে থাকবেন, যার ইতিহাস হয়তো তাদের ভ্রান্ত অনুসারীদের কল্যাণে চাপা পড়ে গেছে। এই সেদিনের হযরত ঈসা (আ)–র প্রচারিত আদর্শ এবং ইতিহাসের যেভাবে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, তার

www.pathagar.com

চাইতেও হাজার হাজার বছর পূর্বের প্রচারিত ধর্মাদর্শ যে বিকৃত হয় নাই, এই গ্যারান্টি কে দেবে ? সুতরাং তদানীন্তন ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে যদি বিকৃতি দেখা দিয়ে থাকে এবং তার ফলশ্রুতিতে জনগণের মধ্যে যদি ধর্মের নামে অধর্মের জয়গান এবং সমাজ শাসনের নামে অন্যায়-অনাচারের তান্ডবলীলা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীন দেশসমূহের অন্যতম। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রায় পৃথিবীর ইতিহাসের মতই প্রাচীন। কবে কোথায় কিভাবে এই উপমহাদেশে মনুষ্য বসতি শুরু হয়েছিল,সে ইতিহাস অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ) এই উপমহাদেশের দক্ষিণস্থ সিংহল দ্বীপের একটি স্থানেই বেহেশত থেকে প্রথম মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন বলে কথিত আছে। ঐ স্থানটি অদ্যাবধি আদম শৃংগ বা Adam's Peak নামে অভিহিত। হযরত আদম (আ) সিংহল থেকে এবং মা হাওয়া জেদ্দা থেকে মক্কার অদূরে আরাফাত নামক স্থানে যাওয়ার পর মর্ত্যভূমিতে তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাত হয়। এরপর তাদের থেকেই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির বংশ বিস্তার হতে থাকে।

ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। তবে এ ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি ভ্রান্তি বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে। এর একটি হচ্ছে হিন্দু তথা আর্য জাতিকে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা বিবেচনা করা। এ ধারণা একেবারেই ভুল। ইসলাম ও মুসলমানদের মতো হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুরাও এ উপমহাদেশে বহিরাগত। এই উপমহাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে তিনটি ধর্ম – জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্ম। আজ যা হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত তা এ উপমহাদেশে আনে আর্যরা। আর আর্যরা এ উপমহাদেশে তাদের আদি নিবাস কাস্পিয়ান হ্রদ এলাকা থেকে এসে পাঞ্জাব এলাকায় বসতি স্থাপন করে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ সালের মধ্যে। (দ্রষ্টব্য– Glimpses of World Religions, published by Jaico publishing house, Bombay, October, 1958, pp. 18-19).

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রচারিত ভ্রান্তি হচ্ছে আর্য সভ্যতাকে এ উপমহাদেশের আদি সভ্যতা বিবেচনা করা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই ভ্রান্তি আঁকড়ে ধরে থাকবার আর কোনই অবকাশ নেই। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আর্য সভ্যতার চাইতে অনেক উন্নতমানের ছিল এ সভ্যতা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সময়কাল বিশেষজ্ঞরা খৃষ্টপূর্ব ৩০০০-২৯০০ অব্দ বলে নির্ধারণ করেছেন (দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত)। আর্য অভিযানের পর বহুদিন পর্যন্ত এ উপমহাদেশের তদানীন্তন তামাটে বর্ণের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তর ভারতে আর্যদের যুদ্ধ হয়। আর্যরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাদের দক্ষিণাঞ্চলে তাড়িয়ে দেয় (দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত)। এই আদিম অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতাও দ্রাবিড় সভ্যতায় প্রভাবিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। আর্য অভিযানের যুগে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই জনবসতি ছিল। উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশের বাসিন্দাদের মধ্যেও উন্নত ধরনের সমাজ-সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, যদিও আর্যরা এসব লোকদের খুব তুচ্ছজ্ঞান করত। মানুষে মানুষে এই বৈষম্য-চিন্তা আর্যদের আনীত মূল বৈদিক ধর্মে ছিল না, এটা তাদের পরবর্তীকালের বিচ্যুতির ফসল, সে বিষয়ে মতবিরোধের অবকাশ আছে। তবে এই বৈষম্য-চিন্তা যদি গোড়া থেকেই তাদের মধ্যে থেকে থাকে তবে তা যে স্রষ্টা প্রেরিত প্রকৃত ধর্ম ছিল না তা অবধারিত। স্রষ্টার দেওয়া প্রকৃত ধর্ম আদিকাল থেকেই তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদের ধারণায় সঞ্জীবিত ছিল।

হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের স্থলে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা এবং পৌত্তলিকতার যে প্রচলন পরবর্তীকালে দেখা যায়, তা আদি বৈদিক যুগে ছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ চতুর্বেদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপী উপনিষদসমূহে একেশ্বরবাদের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

> "They (the Upanishads) recognise only one god who is defined as eternal self-existant, incomprehensive and omniscient." (Vide-Glimpses of World Religions. Jaico Publishing House, Bombay, October 1958, P. 28)

www.pathagar.com

অবশ্য হিন্দু ধর্মের বর্তমানের বহু বিশ্বাস ও আচার-আচরণই যে পরবর্তীকালের সংযোজন এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। যেমন অতীতে ব্রাহ্মণ বা সম্মানিত অতিথির আগমনে গোমাংস দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হত, অথচ পরবর্তীকালে গরুকে দেবতা বলে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ-ঘোষিত হয়।

হিন্দু ধর্মের উপনিষদ-কথিত একেশ্বরবাদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল সামাজিক সাম্য কোনদিন বাস্তবে ছিল কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ইতিহাসে এর বিপরীতটাই অধিক মাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়েছে এ এক বাস্তব সত্য। পন্ডিতদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, বেদের একেশ্বরবাদ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিকতায় রূপান্তরিত হয়। (দেখুনঃ-মোস্তফা-চরিত, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ৪র্থ সংস্করণ, ঝিনুক পুস্তিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ২০১-২)। ইউরোপীয় কোন কোন পন্ডিতেরও ধারণা অনুরূপ ঃ

> The old religion of the Vedas which was pragmatic and sacrificial, had lostity appeal with the masses, yet the ideas of the Upanishads, a highly scholastic metaphysical doctrine of the direct realization of God, could not in any way supply the spiritual needs of the people. (Vide-A History of India by Michael Edward, 1967, P. 29)

যেভাবেই হোক না কেন, সত্য ধর্ম থেকে এই বিচ্যুতির ফলশ্রুতিতে সমাজ-জীবনে এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। জনৈক বিশিষ্ট হিন্দু সাহিত্যিকের মতেঃ

> পন্ডিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতার বলে অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গতানুগতিক কৌলিন্য প্রথার দরুন জাতিভেদের নিয়মকানুনগুলো কঠোর হতে কঠোরতর হয়েছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য শিক্ষায়তনের দ্বার রেখেছিল চিররুদ্ধ। শুধু তাই নয়, বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ন্যায় পৌরাণিক ধর্মে ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের একচেটিয়া অধিকার। (দ্রষ্টব্যঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন)

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের একাংশকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করার স্পর্ধা ও দুঃসাহস ব্রাহ্মণদের যুগিয়েছিল হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তিরূপী মনুসংহিতা। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"শাস্ত্রে শূদ্র আর দাস একই অর্থবাচক। মনু বলিতেছেনঃ শূদ্র ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, তাহাকে দাসত্ব করিতেই হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের দাস্যকর্ম নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন মরণ পর্যন্ত শূদ্রের শূদ্রত্ব নষ্ট হয় না। সেইরূপ শূদ্র স্বামী কর্তৃক মুক্ত হইলেও তাহার দাসত্বের মোচন হইতে পারে না।

"ভগবান মনু ইহার পর স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, এই দাস যাহা কিছু উপার্জন করিবে তাহার অধিকারী হইবেন তাহার স্বামী দ্বিজগণ। ব্রাহ্মণ প্রভু শূদ্রের সমস্ত ধনসম্পদ গ্রহণ করিতে এমনকি কাড়িয়া লইতে অধিকারী" (৪১৩-৪১৪)। এই নির্মম অসাম্যের ভিত্তি স্থাপন করাও হইয়াছে শ্রী ভগবানের নাম করিয়া। ঋগ্বেদ বলিয়া দিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন ঈশ্বরের মুখ হইতে আর শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পা হইতে- (১০ ঃ ৯০)। মনুও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন-(১-৩০)। (দ্রষ্টব্যঃ মোস্তফা-চরিত) মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ঝিনুক পুস্তিকা, ৪র্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ২০৩)

"মনু বলিতেছেন--যে অপরাধের গুরুদন্ডের ব্যবস্থা আছে, ইতর লোকদিগের সম্বন্ধে ঐ দন্ডই বলবৎ থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের শুধু মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইবে--ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

"শ্রী ভগবান বলিতেছেন--ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের পাছা কাটিয়া দেওয়া হইবে--(২৮১)। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীর অঙ্গ স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহার প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা (৩৫৯)।...শূদ্র যদি দ্বিজাতির কোন স্ত্রীগমন করে তবে অবস্থাভেদে তাহার লিঙ্গছেদ ও প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় ঐরূপ করিলে তাহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারার হুকুম। কিন্তু ব্রাহ্মণের জন্য মাকড়-মাকড় ব্যবস্থা" (৩৭.৪-৭৭)। (দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬)।

www.pathagar.com

ইতিহাসে দেখা যায়, বাড়াবাড়ির ফল কখনও শুভ হয় না। উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী অনাচার-অত্যাচারের পরিণতিও শুভ প্রমাণিত হয়নি। ইহিতাসের অমোঘ পরিণতিতেই একদিন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবেই যেন আবির্ভূত হলো বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্টপূর্ব ৫৬০ সালে। বৌদ্ধ ধর্মের সমাজ দর্শনে জাতিভেদ বা বর্ণভেদের কোন স্থান ছিল না। মানুষের জীবনের শুদ্ধচারিতার উপরে বৌদ্ধ ধর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের বৈষম্যবাদী নিপীড়ন থেকে মুক্তির যে আশ্বাস বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের নিকট পেল, তার ফলে তারা দলে দলে নতুন ধর্ম গ্রহণ শুরু করল। টেকনাফ থেকে খায়বার পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল বিশাল ভারতবর্ষে যেন এক নীরব সমাজ-বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। পূর্বে ব্রাহ্মণের জন্য উচ্চ মর্যাদাই রক্ষিত ছিল না, ব্রাহ্মণকে ভগবানের সঙ্গে একাকার করে ফেলা হয়েছিল। শাস্ত্রের বিধান প্রচারিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করা আর ঈশ্বরকে অবমাননা করা একই কথা। গৌতম বুদ্ধ হয়ত এর প্রতিবাদেই বলে থাকবেন,---মানবদেহী অনাচারী-অত্যাচারী ব্রাহ্মণ আর ঈশ্বর যদি এক হয়ে থাকে তবে সে ঈশ্বরকেই তিনি মানেন না। গৌতম বুদ্ধের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই হয়ত পরবর্তীকালে তাঁকে নাস্তিক বা সংশয়বাদী প্রমাণের চেষ্টা হয়ে থাকবে। যাই হোক, বৌদ্ধ ধর্ম যখন উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্য বিপজ্জনক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুনভাবে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি মুকাবিলার প্রস্তুতি নিল। এই প্রস্তুতির একটি দিক ছিল-- বৌদ্ধ সমাজে অনুপ্রবেশ করে তার চিন্তা-চেতনায় এমন সব বিচ্যুতি সৃষ্টি করা, যাতে তার বিপ্লবী চেতনা ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বিতীয় পন্থা হলো গণহত্যা ও নির্যাতনের সুপ্রাচীন মহাজনী পথ। উপমহাদেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যবাদকে অনেকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং দ্রাবিড় ও অন্য অনার্যদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনার জন্য দায়ী করে থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে তারা দীর্ঘদিন যে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছে তার সত্যি তুলনা নেই। একদিকে বৌদ্ধ ও জৈন জনগোষ্ঠীকে ছলেবলে-কৌশলে খতম করার ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী এইসব ধর্মাবলম্বী জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ ধর্মীয় মহাপুরুষদের ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের অবকাঠামোর মধ্যে 'অবতার' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার সুনিপুণ ব্যবস্থা। এই দ্বিমুখী ক্রূর কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির চিত্র কেমন ছিল ? জনৈক আধুনিক পন্ডিতের মতে ঃ

> সুনীতি ও সদাচারের দিক দিয়া এই সময় ভারতবর্ষের যে ঘোরতর অধঃপতন ঘটিয়াছিল, নিষ্ঠুরতায় ও জঘন্যতায় বস্তুতই তাহা অনুপম। মানবতার চরম অবমাননা করিয়া একদিকে তাহারা একের পর এক অবতারের আমদানী করিয়া যখন সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার সামনে বসাইয়া দিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অন্যদিক দিয়া মানুষকে তাহারা নামাইয়া দিতেছিল শৃগাল, কুকুর অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর স্তরে।

(মুহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ৪র্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ২০২)

ধর্মাচার্য বলে খ্যাত শ্রী শঙ্করাচার্যের মতো ব্যক্তি বৌদ্ধদেরকে যেখানে পাওয়া যায় হত্যা করাকে পুণ্য কর্ম বলে ফতোয়া দিয়ে এই গণহত্যার ইন্ধন যুগিয়েছিলেন, আর গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ফরমান জারী করেছিলেন ঃ

> সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বৃদ্ধ ও বালকদের পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে সে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হইবে- রাজভৃত্যদিগের প্রতি রাজার এই আদেশ।

(দ্রষ্টব্য ঃ শ্রী চারু বংোপাধ্যায়, রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরান, পৃ. ১২৪)

বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈন ধর্মের আবির্ভাবও সমসাময়িক কালে এবং উভয় ধর্মই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে শ্রী শঙ্করাচার্যের সময়ই জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালিত হয়। সহস্র সহস্র জৈনকে হত্যা করা হয় এবং অসংখ্য জৈন মন্দির ধ্বংস করা হয়। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের মতো জৈনদের বেলায়ও ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করকে অবতার ঘোষণা করা হয়। একইরূপে শঙ্করাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ তাঁকেও শিবের অবতার ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

(মোস্তফা চরিত, মুহাম্মদ আকরম খাঁ, ঝিনুক পুস্তিকা, ৪র্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ২০১-২০২)

গৌতম বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন আরেক ধর্মীয় মহাপুরুষ চীনের কনফুসিয়াস। কিন্তু এদের প্রচারিত আদর্শ বাইরের আঘাত এবং আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির কবলে পড়ে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেনি। এর কিছু পরবর্তীকালেই আবির্ভূত হন শেষ নবীর পূর্বের নবী হযরত ঈসা (আ)। তিনিও তদানীন্তন বিশ্বে এক বিরাট সমাজ-বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিলেন; কিন্তু সে বিপ্লবের ঢেউ প্রধানত আঘাত করেছিল পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের জনপদসমূহে। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য হযরত ঈসা (আ)-র প্রচারিত সত্যধর্ম তাঁর শিষ্যনামধারী এক শ্রেণীর লোকের কল্যাণে অত্যল্পকালের মধ্যেই চরম বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে এবং তাওহীদের স্থলে জন্ম নেয় এক কিম্ভূতকিমাকার ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম।

এমনি পটভূমিতে সারা বিশ্ব যখন সত্য ধর্মের অনুপস্থিতিতে বিভ্রান্তির অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল, সারা দুনিয়ার মানুষ যখন অনাচার-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নে অধীর-অধৈর্য হয়ে মানব জীবনের যা কিছু মহিমা ও গরিমা তার সবকিছু ভুলে যেতে বসেছিল তখনই আরবের বুকে জন্ম নেন বিশ্বমানবতার মুক্তির শ্রেষ্ঠ নিশান বরদার বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল অতীব মর্মান্তিক। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের আসুরিক শক্তির দাপটে জৈন ধর্ম বিলুপ্ত প্রায়, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। যে ভারতবর্ষ একদা বৌদ্ধ বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল, টেকনাফ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যে উপমহাদেশের যত্রতত্র মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায় বৌদ্ধ মূর্তি, এই ভূখন্ডে জন্মগ্রহণকারী সেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরাই তখন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, শ্রীলংকা ও মধ্য এশিয়ায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী গণহত্যা অভিযান থেকে বাঁচার জন্য অবশিষ্টরা আগ্রাসী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে শূদ্রের দাস

www.pathagar.com

জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাদের রেহাই নেই, কথায় কথায় তাদের উপর সন্দেহ, কথায় কথায় চলত তাদের উপর নির্যাতন। এত করেও তাদের অন্তরের ছাইচাপা আগুন কিন্তু নিভে যায়নি, বরং তা অন্তরের মধ্যে অহর্নিশি ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনেও সেদিন ছিল না কোন শান্তি বা স্বস্তি। গোটা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় অসংখ্য রাষ্ট্র ছিল। এই সব রাজ্যের শাসকরা প্রায় প্রতিনিয়তই একে অপরের বিরুদ্ধে নানা বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকতেন। সারা ভারতে তখন থানেশ্বরের শাসকবর্গ অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে ৬০৬ খৃষ্টাব্দেরও আগে শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। শশাঙ্ক ভয়ঙ্কর বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। শশাঙ্ক মালব রাজ দেবগুপ্তের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তার সাহায্যে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এবং তাঁর স্ত্রী ও থানেশ্বর রাজের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। এর ফলে মৌখরিরাজ বংশের মিত্র থানেশ্বর রাজের সাথে তাঁর সংঘর্ষ ও বিরোধ বাঁধে। থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধনকে তিনি কৌশলে নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শশাঙ্কের রাজত্বের পূর্বেই বাংলার বর্ণভেদ-প্রথা প্রচলিত হয়। শশাঙ্কের রাজত্বে তাকে পরিকল্পিতভাবে আরও শক্তিশালী করা হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরও হর্ষবর্ধন বেশ কিছুকাল রাজত্ব করেন। হর্ষবর্ধন মোটামুটিভাবে একজন কল্যাণব্রতী শাসক ছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের ৪ বছর পূর্বে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতেরও ১৫ বছর অর্থাৎ ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর বিদ্বেষ ও দমননীতির ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে চরম অরাজকতা বিরাজ করে। তবে শুধু পূর্বাঞ্চল নয়, বলতে গেলে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত সারা ভারতবর্ষেই তখন চলছিল চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতা এবং তার ফলশ্রুতিতে জনজীবনে নেমে

www.pathagar.com

আসে চরম দুর্দশা। কারণ অন্যান্য অঞ্চলেও হিন্দু পুনর্জাগরণের বিদ্বেষ হলাহল ও বৌদ্ধ-নিধন অভিযানের পরিণতিতে সমগ্র জনজীবনে নেমে এসেছিল চরম অভিশাপ। নিম্নবর্ণের (শূদ্র) হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর সংঘবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই বর্বর নিপীড়নের পটভূমিতেই ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় শুরু হয় সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ইনসাফের মহান আদর্শ ইসলামের।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই আরবদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে একদিকে ইউরোপ, অপরদিকে ভারতবর্ষ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, এমনকি চীনের সঙ্গে বহু পূর্ব হতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন। সমুদ্র পথে এসব দেশে জাহাজ নিয়ে এসে এক দেশের পণ্য তারা অন্য দেশে বিক্রয় করতেন। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সারা আরব যখন ইসলামের বিপ্লবী জোয়ারে আন্দোলিত হচ্ছিল, তখন সে জোয়ারের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এই উপমহাদেশের সমুদ্র-বিধৌত উপকূলভাগেও। গোটা আরব জাতি তখন মানবমুক্তির মহাসনদ ইসলামের জীবনাদর্শে উদ্ভাসিত। তাওহীদের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের জোয়ারে নিজেরা অবগাহন করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি, এ জোয়ারে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে গোটা আরব জাতিই নিয়েছিল ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা। তাদের প্রতি হুকুম ছিল--আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও প্রচার কর। বিদায় হজ্জে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লক্ষাধিক সমবেত সাহাবী (রা)-র প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দেবে। এই আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরে। অনেকে তো ইসলামের প্রচারকেই তাদের আজীবনের একমাত্র কাজে পরিণত করে ফেলেছিল। যারা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতো তারাও পণ্যের ফেরীর সাথে সাথে প্রচার করতে লেগে গেল তাদের নবলব্ধ মহান জীবনাদর্শ।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুধু তাঁর সাহাবীদের প্রতি ধর্ম প্রচারের আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, সে যুগের বিভিন্ন শাসকের প্রতিও

www.pathagar.com

তিনি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। এ ধরনের দাওয়াত শুধু যে পারস্য ও রোমের সম্রাটদের নিকট পাঠানো হয়, তাই নয়, সূদূর চীনেও তিনি প্রেরণ করেন এই দাওয়াত পত্র। চীনের তদানীন্তন সম্রাট তাই সুঙয়ের নিকট প্রেরিত এ ধরনের পত্রের উল্লেখ করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েলস ঃ

To the monarch (Tai-tsung) also (in 628 A.D) came messenger from Muhammad. They came to Canton on a trading ship. They had sailed the whole way from Arabia along the Indian coasts. Unlike Heracleus and Kavadh, Tai-tsung gave these envoys a courteous hearing. He expressed his interest in their theological, and assisted them to build a mosque in Canton,---------(Vide-A Short History of the World, by H.G. Wells, Penguin Books, London, 1958, P. 175).

ভারতবর্ষেও ইসলামের বাণী এসে পৌছে রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনকালেই।

মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমাল, পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন। শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর 'তুহফাতুল মুজাহেদীন ফি বায়ে আহওয়ালিল বারতাকালীন' গ্রন্থে এ রাজার শেষ নবী (সা)-র সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সময় মালাবারের বহুসংখ্যক হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করে। (দ্রষ্টব্যঃ বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৮০, পৃ. ২০)

www.pathagar.com

বাংলার সাথেও আরবদের সমুদ্র পথে যোগাযোগ ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে।

আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীন দেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। কাজেই বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো। এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) ও শৎসঙ্গ (বর্তমান চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর। (দ্রষ্টব্যঃ তারীখে হিন্দে কদীম, কে. এম. পানিক্কর, ৬৭ পৃষ্ঠা)

এ সময়েই ইসলামের সত্য বাণী বাংলায় প্রবেশ করে। রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট উপমহাদেশের জনৈক শাসক উপহার প্রেরণ করেন বলে একটি হাদীস সূত্রে জানা যায়ঃ

Sarbatak, king of Kanauj (India) sent an earthenware full of ginger to Haz. Prophet (sm) as presents according to a narration by Abu Said Khudri (R). It is also reported that the Haz. Prophet (sm) sent Hudhyfa, Usama and Suhyb to the king inviting him to accept Islam. He embraced Islam, Sarbatak also said, 'I saw the Prophet force, first in Mecca, then Medina. He was very handsomefaced and middle sized man.

[Vide-Arab Relationship with Bangladesh: Md. Nurul Hoque, November, 1980, Mss, P. 54]

এ হাদীস কতখানি নির্ভরযোগ্য তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও রসূলুল্লাহ (সা)-র যুগেই সমুদ্রপথে আগত আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী যে বাংলায় প্রবেশ করে এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই।

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর আমলে বাংলায় ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটে, সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা বিশিষ্ট গবেষক ডঃ হাসান জামানের বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সমাজ-সংস্কৃতি-

www.pathagar.com

সাহিত্য' নামক গ্রন্থ থেকে নিঃসংশয়ে নামসহ জানতে পারি। আদি যুগের এসব ইসলাম প্রচারকগণ সহজ-সরল উৎসর্গিত জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একনিষ্ঠ প্রচার-কার্যের ফলেই বাংলা তথা উপমহাদেশের বর্ণভেদ-কন্টকিত সমাজের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের মনে মুক্তির এক নয়া দানা বেঁধে ওঠে। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে উপমহাদেশ তথা বাংলার ইতিহাসে ইসলামের আলোকে এক নীরব সমাজ-বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

অমুসলিমের দৃষ্টিতে হযরত মুহম্মদ (সা)

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

শেষনবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর আগে সব নবী রসূল ও ধর্মপ্রবর্তক এসেছেন তাদের স্বজাতির জন্য--সকল মানবের হিতার্থে নয়। একলক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার পয়গম্বর এসেছেন যুগে যুগে তাদের নিজ নিজ কওমের মুক্তির জন্য, তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য।

নূহ, ইবরাহীম, লূত, মূসা, দাউদ, সোলায়মান, ঈসা এঁদের সবাই যাঁর যাঁর কওমের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, মূসা (আ)-কে আমি ইসরাঈল কওমের জন্য রসূলরূপে পাঠিয়েছি। বাইবেলে ঈসা (আ) নিজেই বলেন, আমি তো ইসরাঈল বংশের হারানো মেষদের জন্য প্রেরিত হয়েছি। আর ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম। আল-কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম-আল্লাহ্র কাছে ইসলামই একমাত্র দীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি। হযরত মুহম্মদ (সা) আল্লাহ্র আদেশে ঘোষণা করেনঃ কুল, ইয়া আইউহান্নাস্ ইন্নি রাসূলুল্লাহি ইলায়কুম জামীয়ান-হে রাসূল ! আপনি বলুনঃ হে মানব জাতি, আমি তো আল্লাহ্র রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ তোমাদের সকলের জন্য।

এই রাসূল, হযরত মুহম্মদ (সা)-এর জীবনই একমাত্র আদর্শ জীবন। আল্লাহ্ নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা-নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দর আদর্শ। তিনি সর্বগুণের আধার।

হযরত মুহম্মদ (স)-এর ব্যক্তিগত, পার্থিব, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বহু আলোচনা হয়েছে। তাঁর গুণাবলী যাচাই করা হয়েছে বিধর্মী ও বিরোধীদের সমালোচনার কষ্টিপাথরে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে তাঁর জীবনী। ইসলাম-বিদ্বেষী অন্য ধর্মাবলম্বী কঠোর সমালোচকরাও হযরত

www.pathagar.com

মুহম্মদ (সা)–এর মহত্ত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা)–র সম্বন্ধে তাঁদের লেখার সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা এখানে হযরত মুহম্মদ (সা)–র সম্বন্ধে আধুনিক বিশ্বের কয়েকজন অমুসলিম প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করলাম।

০ দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, সেনানায়ক, আইন প্রণেতা, ভাবের বিজয় কর্তা, যুক্তিসঙ্গত ধর্মমতের প্রবর্তক ও প্রতিমাবিহীন ধর্মপদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ (সা)–এর দিকে তাকিয়ে দেখ। মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে, সে সবগুলো দিয়ে তৌলিয়ে তাঁর চাইতে মহত্তর কোন লোক ইতিহাসে পাবে কি ?

–আলফ্রেড ডি লা মারটিন

০ ইতিহাসে তাঁর মতো আর কোন নবী, রসূল বা সংস্কারক দেখা যায় না, যিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের জীবনে এত বড় অলৌকিক ও বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছেন। –এ.জি. লিওনার্ড

০ পৃথিবীতে বাস করে যদি কোন মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখে থাকেন, বুঝে থাকেন, যদি কোন মানুষ ভাল ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ্‌র সেবায় জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, তাহলে একথা নিশ্চিত সত্য যে, আরবের নবী মুহম্মদ (সা)–ই সেই ব্যক্তি। মুহম্মদ (সা) যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন তা নয় বরং এ যাবত মানবেতিহাসে যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব একমাত্র তিনিই।––এ.জি. লিওনার্ড

০ মুহম্মদ (সা) এমন একজন মানুষ, যিনি কেবল মহৎই নন, বরং সত্যের শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতমও। তিনি কেবল নবী বা ধর্মপ্রবর্তক হিসাবেই মহৎ নন, দেশপ্রেমিক হিসাবেও তিনি মহান। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের পথ নির্দেশক–পার্থিব ও অধ্যাত্ম সরণি–নির্মাতা। তিনি গড়ে তুলেছেন একটি মহান জাতি এবং একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য। তিনি সত্যের উৎস। তিনি নিজে সত্য, তাঁর নিজের কাছে, তাঁর অনুসারীদের কাছে, তাঁর পরিচিত–অপরিচিতদের কাছে এবং সর্বোপরি তাঁর রবের কাছে। –এ.জি. লিওনার্ড

www.pathagar.com

০ খৃস্টানদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মুহম্মদ (সা)–এর বাণী ও তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, যা যীশুর প্রথম দিককার অনুসারীদের মাঝে খোঁজ করা অর্থহীন। যীশুকে যখন শূলে চড়ানো হয়, তখন তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায়। তাদের ধর্মের নেশা ছুটে যায়। নিজেদের পথ প্রদর্শক গুরুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায়। অপরদিকে মুহম্মদ (সা)–এর অনুসারী শিষ্যরা তাদের উৎপীড়িত রসূলের চারদিকে সমবেত হয়ে তাঁকে রক্ষার জন্য জান–মাল যথাসর্বস্ব বিপদের মুখে বিসর্জন করে তাঁর বিজয় নিশ্চিত করেছিল।

–ক্যাডফ্রে হেগেন্স্

০ মুহম্মদ (সা)–এর জীবনী লেখকদের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব ; কিন্তু তাঁদের নামের পাশে নিজের নাম সংযোজিত করা একটি অতি সম্মানজনক কাজ। –ডি. এন. মার্সালিউথ

০ মুহম্মদ বিশৃঙ্খল, নগ্ন, ক্ষুধার্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে এক বিরাট একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। ত্রিশ বছর পূর্ণ না হতেই এ জাতি রোম সম্রাটকে পরাভূত, পারস্যের শাহানশাহকে সিংহাসনচ্যুত, সিরিয়া, মিসর ও ইরাক করতলগত এবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত ভূ–ভাগে বিজয়ের উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

–জন ডেভনপোর্ট

০ এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সমস্ত আইন প্রণয়নকারী এবং বিজয়ীদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যার জীবনী মুহাম্মদ (সা)–এর জীবন চরিত থেকে অধিক বিস্তৃত ও সত্য। –জন ডেভনপোর্ট

০ ধর্ম ও সভতার প্রচারক হিসেবে মুহম্মদ (সা) যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও তেমনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। –স্টেনলি লেইনপুল

০ মুহম্মদ (সা)–এর অকৃত্রিম সৌজন্য, অতুলনীয় বদান্যতা, নির্ভীক সাহসিকতা এসব গুণের কথা আলোচনা করলে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার উদ্রেক হয়। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন। যে ধর্ম প্রেরণা বিশ্বের কল্যাণ সাধন করে, যে ধর্মচেতনা জীবন্ত মানুষকে বিকার থেকে রক্ষা করে, তাঁর ধর্মপ্রাণতা

www.pathagar.com

ছিল সেরূপ মানবতামুখী মহৎ ভাবাপন্ন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য যে চেতনাবোধের প্রয়োজন তাঁর ধর্মচেতনা ছিল তা-ই। তাঁর মহৎ চেতনা ও মহৎ প্রেরণা মহৎ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ছিল। তিনি এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার বার্তাবহ রসূল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপন জীবনব্রত ক্ষণিকের জন্যও ভুলেননি। –স্টেনলি লেইনপুল

০ মুহম্মদ (সা) একাধারে সিজারের মতো শাসনতন্ত্রের শীর্ষভাগে এবং পোপের ন্যায় ধর্মরাজ্যের উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য এই যে, তিনি একাধারে একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য ও একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। মানবেতিহাসে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই।

–বসওয়ার্থ স্মিথ

০ এখানে সবকিছুই দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট। এ আলোক প্রতিটি বস্তুর উপর পড়েছে। বস্তুত মুহম্মদ (সা)-এর অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিকতার গভীরতম প্রদেশ চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরে থাকলেও আমরা তাঁর ব্যক্তি জীবনের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে প্রতিটি খুঁটিনাটি জানতে পারি। তাঁর যৌবন, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রথমদিককার চিন্তাধারা ও তার ক্রমপরিণতি; আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ওহীর পর্যায়ক্রমে অবতরণ–এ সবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাঁর আভ্যন্তরীণ ভাব ও অন্তর্জীবনের ব্যাপার জানার জন্য তাঁর রিসালাত সম্পর্কীয় ঘোষণার পরবর্তীকালের গ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের সামনেই রয়েছে। এ কুরআনের পাঠের মৌলিকতা এবং প্রক্ষেপের কলুষমুক্ততা সুবিদিত ও সুরক্ষিত। এ দিক থেকে ও বিষয়ের বিন্যাসে এ গ্রন্থ অদ্বিতীয়। এ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়বস্তুর ও ভাবের আভ্যন্তরীণ সত্যতা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। যদি এমন কোন গ্রন্থ আমাদের কাছে থাকে, যার মধ্যে যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের সত্তা রূপলাভ করেছে, তাহলে তাই হলো আল-কুরআন। সাধারণ বাহ্যদৃষ্টিতে অগোছাল বৈপরীত্বসম্পন্ন ও ক্লান্তিকর অথচ কৃত্রিমতাহীন ও মহত্তরভাবে পরিপূর্ণ বিশাল এ গ্রন্থ এক অলৌকিক জ্ঞানভান্ডার। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একটি সুচিন্তিত মস্তিষ্ক; আল্লাহ্‌র প্রেমের নেশায় অভিভূত জীবন। অথচ এরই সাথে মিলিত হয়েছে মানবীয় সব রকমের

www.pathagar.com

দুর্বলতা। মুহম্মদ (সা) এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত বলে কখনো দাবী করেন নি। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত।–বসওয়ার্থ স্মিথ

০ আমরা ধর্মপ্রবর্তকগণের সম্বন্ধে তাঁদের অনুসারীদের চাইতে অল্পই জ্ঞান রাখি। জরথুস্ত্র ও কনফুসিয়াস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, সিভিলিয়ান ও সক্রেটিস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তার চাইতে বেশি। মূসা (আ) ও বুদ্ধের জীবন–চরিত অপেক্ষা জুলিয়াস সিজার ও এম্রাস সম্বন্ধে আমরা অধিক জানি।

একটি আদর্শ জীবন যা আমাদের অত্যন্ত কাছের হয়েও দূরের, যা সম্ভব ও অসম্ভব দুইই, আমরা তার বিস্তারিত বিবরণ কতটুকু জানি ? যীশুর মা, তাঁর পারিবারিক জীবন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, তাঁর ধর্ম মিশনের ক্রমোন্নতি ও আকস্মিক পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতটুকু ? এসব সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নের অন্ত নেই। কিন্তু এগুলির সদুত্তর পাওয়া কোন কালেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় অন্য ধরনের। এখানে সবই সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্ট। কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই, নেই কোন কুয়াশাচ্ছন্নতা। আমাদের ইতিহাস জানা আছে। আমরা হযরত মুহম্মদ (সা) সম্বন্ধে এত বিস্তারিত জানি, যেমন জানি মিলটন বা লুথার সম্বন্ধে । প্রাচীন আরবীয়দের লেখায় মনগড়া ও কাল্পনিক কথা নেই। আর যদি কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তা সহজেই প্রলেপমুক্ত করা যায়। এখানে কেউ নিজেকে ও অপরকে প্রতারিত করে না। এখানকার সবকিছু স্বচ্ছ উজ্জ্বল এবং অপরকে আলোকিত করে।–বসওয়ার্থ স্মিথ

০ সমগ্র মানব জাতির উপর তিনি (মুহম্মদ) সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। –ড্রেপার

০ ইসলাম সমগ্র বিশ্বের এমন একটি পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে, যা অন্য কোন ধর্মই এত দ্রুত এবং সক্রিয়ভাবে করতে পারেনি।–জোসেফ হেল

০ ইসলামের যুগে আরববাসী যেমন দ্রুত সভ্যতায় পৌছেছিল, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমনটি পারেনি। –হার্শফেল

www.pathagar.com

০ মুহম্মদ, এ যাবত যাঁকে ঘৃণা ও অগ্রাহ্য করা হয়েছে, তিনি লোকদের সঙ্গে যেমন উদার ব্যবহার করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য।–মুইর

০ হযরত মুহম্মদ (সা) ঐহিক ক্ষমতার উচ্চতর আসন লাভ করেও তাঁর চরম দুশমনকেও ক্ষমা করেছেন। যে স্ত্রীলোক তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তাকেও তিনি ক্ষমা করেছেন। যে স্ত্রীলোক তার চাচার কলজে বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল, তাকেও তিনি ক্ষমা করেছেন। তাঁর জন্মভূমির যেসব অধিবাসী তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের অকথ্য উৎপীড়ন করেছিল, তিনি তাদের সকলকেই ক্ষমা করেছেন। পদানত শত্রুকে ক্ষমা করে তিনি ক্ষমা ও উদারতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বের দীর্ঘদিনের সভ্যতার ইতিহাসে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। –গীবন

০ প্রথম যুগের কোন নবীই সত্যের এমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, যেমন মুহম্মদ (সা) হয়েছিলেন। প্রথমত তিনি এমন লোকদের নিকট নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করেছেন, যাঁরা তাঁর সকল মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। যাঁরা তাঁকে সবচাইতে বেশি জানতেন–তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর ভৃত্য, তাঁর চাচাতো ভাই, তাঁর সবচাইতে পুরনো বন্ধু যাঁর সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, 'একমাত্র সেই বন্ধু কখনও পরিত্যাগ করেন নি এবং কখনও ভীত হননি, সে সকল লোকই তাঁকে প্রথম অনুসরণ করেছিলেন। সাধারণ নবীদের ভাগ্যে যা ঘটে, মুহম্মদ (সা)–এর ব্যাপারে ঘটেছে তার বিপরীত। যাঁরা তাঁকে জানতো না, তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত, ঘনিষ্ঠ। –গীবন

মুহম্মদ (সা) এক অতি উজ্জ্বল আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র ও সরল। অসাধারণ আড়ম্বরহীন ছিল তাঁর পোশাক–পরিচ্ছদ ও আহার–বিহার। তিনি নিজ হাতে যা করতে পারতেন, ভৃত্যকে তা করতে দিতেন না।

–ডঃ গসফার ওয়েল

০ দুনিয়ার সকল ধর্মবেত্তাদের মধ্যে হযরত মুহম্মদ (সা) সবচাইতে বেশী সফলকাম। –এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা

www.pathagar.com

০ মহাপুরুষ মুহম্মদ (সা) আরব জাতির মধ্যে এরূপে আবির্ভূত হলেন, যেন আরবের তমসাচ্ছন্ন বালুকারাশির মধ্যে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হলো। এ বালুকারাশি বিস্ফোরক বারুদে পরিণত হয়ে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশ মন্ডল প্রদীপ্ত করে তুলল। –স্যার টমাস কার্লাইল

০ আমি বলি ঃ মহাপুরুষ সকল সময় যেন আকাশের বিদ্যুৎ। অন্য সবাই জ্বালানী কাঠের ন্যায় তাঁর অপেক্ষায় ছিল। [তাঁর হযরত মুহম্মদ (সা)–এর] আগমন মাত্র তারাও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। –স্যার টমাস কার্লাইল

০ আমি মুহম্মদ (সা)–এর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর আবির্ভাবের আগে পৃথিবী ছিল ভ্রান্তির অন্ধকারে আচ্ছাদিত। তিনি সেই আঁধারে উজ্জ্বল আলোরূপে জ্বলে উঠলেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, মুহম্মদ (সা)–এর ধর্মপ্রচার ও প্রদর্শন ছিল যথার্থ। –কাউন্ট লিও টলস্টয়

০ আমি মুহম্মদ (সা)–এর ধর্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করছি যে, এ ধর্মমত সমগ্র ইউরোপে শীঘ্রই গৃহীত হবে, যেমন এখন গ্রহণ করা শুরু হয়ে গেছে। আশ্চর্য এই মানুষ মুহম্মদকে আমি অনুশীলন করেছি। আমার মতে তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলা যেতে পারে। –জর্জ বার্নার্ড'শ

০ যদি মুহম্মদ (সা)–এর মতো কোন লোক বর্তমান বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এর সমস্যার এমনভাবে সমাধান করতেন যাতে জগতে বহুল আকাঙ্ক্ষিত চিরস্থায়ী শান্তি ও সুখ আনতে সমর্থ হতেন। আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি, আর আমার মতো একজন বিজ্ঞ লোকের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হবে না যে, সমগ্র ইউরোপে আগামী একশ' বছরের মধ্যে সংস্কারকৃত ইসলাম অথবা তার নিয়মাবলী গ্রহণ করবে। –জর্জ বার্নার্ড'শ

০ বিশ্ববাসী, যদি তোমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চাও এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থার আশা কর, তবে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণভার মুহম্মদ (সা)–এর হাতে ছেড়ে দাও। –জর্জ বার্নার্ড'শ

০ মধ্য–যুগের খৃস্টীয় ধর্মযাজকগণ তাঁদের অজ্ঞতা কিংবা গোঁড়ামির কারণে ইসলাম ধর্মকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেছেন। আসলে তাঁদের, মানুষ মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর ধর্ম ইসলামকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের

www.pathagar.com

কাছে মুহম্মদ (সা) ছিলেন খৃষ্ট বিরোধী। মূলত একথা আদৌ সত্য নয়।

—জর্জ বার্নার্ড'শ

০ মুহম্মদ (সা) ছিলেন একরূপ রাজা। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের তাঁর চারপাশে সমবেত করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অনুসারী মুসলিমরা পৃথিবীর অর্ধেক জয় করে। তারা মাত্র পনের বছরে এত অধিক মানুষকে মিথ্যা দেবদেবী থেকে ফিরিয়ে আনে, এত অধিক দেবমূর্তি ধ্বংস করে, এত অধিক পৌত্তলিক মন্দির ধ্বংস করে, যা পনের শ' বছরেও মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা করতে পারেনি। মুহম্মদ (সা) ছিলেন একজন মহাপুরুষ। বস্তুত তাঁকে ঈশ্বরই বলা যেতে পারত, যদি না তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন, তার প্রস্তুতি ঘটনা না ঘটতো। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময়ে আরবরা বহু বছর ধরে ঘরোয়া যুদ্ধে জর্জড়িত হয়েছিল। এ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে অন্যান্য জাতিরা যা কিছু বড় দেখিয়েছে, আরবরা মুহম্মদ (সা)-এর একনায়কত্বে সে সমস্ত সংকট দেখে মুক্ত হয়ে তা-ই দেখিয়েছিল, যাতে তাঁদের দেহ ও আত্মা সমভাবে পুনরায় নবীনত্ব লাভ করেছিল।

—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

০ তারপর আসেন সাম্যের দূত মুহম্মদ (সা), তুমি প্রশ্ন কর। তাঁর ধর্মে কী ভাল আছে ? যদি তাতে কিছু ভাল না থাকে, তবে কিভাবে তা বেঁচে থাকে ? কেবল ভালই বাঁচে, ভালই টিকে থাকে। একটি অপবিত্র লোকের জীবন, এমনকি এ মর্ত্যলোকেও কতকালের ? পবিত্র লোকের জীবন কি দীর্ঘতর নয়। সংসন্দেহে। কেননা পবিত্রতা শক্তি, সংস্বভাব শক্তি। ইসলাম ধর্ম কিভাবে বেঁচে রইল ? যদি তার শিক্ষায় কিছুই ভাল না থাকে ? বস্তুত তাতে অনেক ভাল আছে। মুহম্মদ (সা) ছিলেন মানুষের সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলিমের ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর। —স্বামী বিবেকানন্দ

০ আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সে যুগের জীবনধারায় ইসলাম যে স্থান লাভ করেছিল, তা তরবারির বলে নয়। তা ছিল নবী (সা)-র কঠোর সরলতা, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, ওয়াদা পালনে একান্ত যত্নশীলতা, তাঁর বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, তাঁর সাহসিকতা, তাঁর নির্ভীকতা, আল্লাহ্‌র প্রতি ঐকান্তিক

www.pathagar.com

বিশ্বাস এবং তাঁর নিয়োজিত প্রচার কার্যের প্রতি অশেষ আত্মপ্রত্যয়। তরবারির সাহায্যে নয়, এ সকল গুণেই সব দিক থেকে তাঁদের সাফল্য দান করেছিলেন, সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

–মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী

—

ইফাবা--৯১-৯২--প্র/৬৬১২ (উ)--৫২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ISBN--984-06-0080-0